Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির বৈবাহিক জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা রহমান মুক্তা

রোলঃ 228022047

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির বৈবাহিক জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা রহমান মুক্তা

রোলঃ 228022047

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নবীজির বৈবাহিক জীবন ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহমুদা রহমান মুক্তা, আইডিঃ 228022047 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজির বৈবাহিক জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mukta

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মাহমুদা রহমান মুক্তা

আইডিঃ 228022047

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 8

অধ্যায়-১: প্রিয় নবীজির জীবনী 11

অধ্যায়-২: কুরআন এর আলোকে নবীজির বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলি 14

অধ্যায়-৩: পবিত্রা স্ত্রীদের সংখ্যা ও নবিজির সাথে বিবাহের ধারাক্রম 19

অধ্যায়-৪: স্ত্রীদের সাথে নবীজীর আচরণবিধি 20

অধ্যায়-৫: নবীজির বৈবাহিক জীবন 21

অধ্যায়-৬: বৈবাহিক জীবনে নবী - পরিবারের সমস্যা ও সমাধান 62

অধ্যায়-৭: সন্তানদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে নবীজির শিক্ষা 79

অধ্যায়-৮: নাতিদের সাথে নবীজির আচরন 96

অধ্যায়-৯: নবীজির জীবন সঙ্গীনি - উম্মুল মুমিনিনদের পরিচয় ও বৈবাহিক জীবনের গল্প 108

- উম্মাতুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ রাঃ 109
- উম্মাতুল মু'মিনিন সাওদা বিনতে জামআ রাঃ 138
- উম্মাতুল মুমিনিন আয়েশা বিনতে আবু বকর রাঃ 149
- উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাঃ আনহা 164
- জাইনাব বিনতে খুজাইমা হিলালিয়্যা রাঃ 179
- জাইনাব বিনতে জাহাশ আসাদিয়্যা রাঃ 188
- উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া মাখজুমিয়্যা রাঃ 214
- জুয়াইরিয়্যা বিনতে হারিস মুসতালাকিয়্যা রাঃ 232
- উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফইয়ান উমাবিয়্যা রাঃ 244
- সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই নাজিরিয়্যা রাঃ 254
- মাইমুনা বিনতে হারিস হিলালিয়্যা রাঃ 274

পরিশেষ 293

তথ্যসূত্র 297

নবীজির বৈবাহিক জীবন

রাসূল ﷺ বলেছেন

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

"বিয়ে আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহ অনুসরণ করে না, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। বিয়ে করো, কারণ আমি কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্যে গর্ব করব। যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম রাখে, কারণ তা তার জন্য ঢালস্বরূপ।"

— সুনানে ইবনু মাজাহ: ১৮৪৬

عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلٰى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّه" أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه" لَه" وِجَاءٌ.

"হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা, তা দৃষ্টি সংযত রাখার ও লজ্জাস্থান হেফাজতের উত্তম উপায়। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম রাখে। কেননা, সওম তার যৌনতাকে দমন করবে"

— সহীহ বুখারী: ৫০৬৬, সহীহ মুসলিম: ১৪০০

ভুমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

والصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান”

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা', الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও অসীম দয়ালু। যার হাতে রিজিকের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নেয়ামত মহান আল্লাহর দান। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে এক বিশেষ নিয়ামত হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

আল্লাহ বলেন -

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন"

[সূরা নিসা- ৪:১]

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত –

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّه" سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا
فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَه" مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه,, وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ÷ وَأَتْقَاكُمْ لَه" لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“তিন জনের একটি দল নবী ﷺ এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী ﷺ এর স্ত্রীদের বাড়িতে - আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা 'ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল,

নবী এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ - ﷺ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা ক'রে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে –

একজন বলল- "আমি সারা জীবন রাতভর সলাত আদায় করতে থাকব।"

অপর একজন বলল- "আমি সবসময় সওম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না।"

অপরজন বলল- "আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না।"

এরপর রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট এলেন এবং বললেন- "তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং সবচেয়ে বেশি তাকওয়া রাখি। কিন্তু আমি রোযা রাখি এবং ভাঙি, নামায পড়ি এবং ঘুমাই, আর আমি বিবাহ করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার উম্মত নয়।"

[সহি বুখারী: ৫০৬৩, মুসলিম; ১৬/১]

আল্লাহ রব্বুল আলামিন, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন পুরো জগৎবাসীর জন্য রহমত ও হিদায়াতরূপে। যিনি হলেন অন্ধকারে আলো ও পথহারা মানুষদের জন্য পথপ্রদর্শক। প্রিয় নবীজি ﷺ এর প্রতিটি নির্দেশনা, প্রতিটি শিক্ষা আমাদের জীবনে চলার পথে এক আলোর দিশারী। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং পৃথিবীতে অশান্তি চায় না, তাদের জন্য তিনি অনুপম জীবনাদর্শ।

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ – "হে আল্লাহর রসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক"

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد - "হে আল্লাহ! আপনি, নবী মুহাম্মাদ ﷺ উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।"

অশেষ দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বজগতের রহমত আল্লাহর হাবিবি,আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি ও পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবীদের উপর। যাঁর আগমনে পৃথিবী পেয়েছিলো এক উজ্জ্বল আলোর দিশা, সত্যে ও ন্যায়ের পথ এবং রহমতের পূর্ণতা।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই হজরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রসূল"

প্রিয় নবীজি রসূল সাঃ এর পবিত্র জীবনী মানবজীবনের সর্বৎকৃষ্ট নমুনা, অনুকরণীয় জীবনাদর্শ। তার জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। আল্লাহ তা'আলা তাকে অধিষ্ঠিত করেছেন সুমহান চরিত্রে। অনুপম শিষ্টাচার দিয়ে সাজিয়েছেন তার পবিত্র জীবনকে। পুত-পবিত্র স্ত্রীদেরকে দিয়ে তার বৈবাহিক জীবনকে করেছেন মনোমুগ্ধকর।

স্ত্রীদের সাথে নবীজি সাঃ এর সম্পর্ক ছিল মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। তাদের সাথে তাঁর আচরণ সর্বকালের সবার জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। নবীজির জীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, মুমিনদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তারাই, যারা চরিত্রে উত্তম এবং যারা তাদের পরিবারের প্রতি করুণাময়। নবীজির জীবনাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে একইসাথে আল্লাহর পুরস্কার ও স্ত্রীদের প্রেম ও ভালোবাসা লাভ করতে পারি।

অধ্যায়-১: প্রিয় নবীজির জীবনী

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য তো রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ যিনি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যার চরিত্রে আলো ছড়ায় চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বলভাবে এবং যার শিক্ষা অন্তরকে আলোকিত করে দীপ্তময় সূর্যের ন্যায়।

আল্লাহ তাআলা আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে তাঁকে নির্বাচন করেছেন এবং আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন মানবজাতির সামনে। আল্লাহ তাআলার নিখুঁত তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে তাঁর পূত-পবিত্র জীবন। তাই তাঁর মুবারক সিরাত সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অতীব জরুরি। কেননা, তাঁর দেখানো পথেই রয়েছে জীবনের পরম সফলতা ও মুক্তির একমাত্র উপায়।

নবীজির জন্ম

নবী মুহাম্মদ সাঃ মক্কার বিখ্যাত বনু হাসিম বংশে **১২**ই রবিউল আওয়াল মাসে, সোমবার দিবসে সুবহে সাদিকের সময় জন্ম গ্রহণ করেন।

রসূল সাঃ এর জন্মের সময় তার মা আমিনা একটি আলো দেখতে পেলেন। তার শরীর থেকে এই আলো বেরিয়ে আসছিলো এ বং সেই আলো আশ-শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এই আলোর দ্বা রাই প্রকাশ পাচ্ছিলো যে মুহাম্মদ সাঃ এর বার্তা জগৎ বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে।

মুসনাদ ইমাম আহমদ - ৫/২৬২

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর রাসূল সাঃ এর মা আমিনা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তারপুত্র জন্ম হওয়ার শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এমন শুভ সংবাদ শোনার পর আব্দুল মুত্তালিব আনন্দ চিত্তে ঘরে প্রবেশ করেন এবং নবীজিকে কোলে তুলে নিয়ে কাবা ঘরেউপস্থিত হন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণ এর জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন।আনন্দঘন মুহূর্তে তিনি নামও স্থির করে ফেলেন এবং বলেন এই নবজাতকের নাম রাখা হবে **মুহাম্মদ**। আরববাসীগণেরনামের তালিকায় এটা ছিলো অভিনব একটি নাম।

লালন-পালন

জন্মের পর শিশু মুহাম্মাদ কিছুদিন চাচা আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবার দুধ পান করেন। তাঁর পূর্বে চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং তাঁর পরে আবু সালামাহ তার দুধ পান করেন। ফলে তাঁরা সকলে পরস্পরে দুধভাই ছিলেন। এ সময় পিতা আব্দুল্লাহর রেখে যাওয়া একমাত্র মুক্তদাসী উম্মে আয়মন রাসূল -কে শৈশবে লালন-(ছাঃ) পালন করেন। এরপর ধাত্রী হালীমা সা'দিয়াহ তাঁকে প্রতিপালন করেন।

অতঃপর হালীমার গৃহ থেকে আসার পর মা আমেনা তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় স্বামীর কবর যিয়ারত করতে যান এবং ফেরার পথে মৃত্যুবরণ করলে কিশোরী উম্মে আয়মন শিশু মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে মক্কায় ফেরেন। পরে খাদীজা এর মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহর সাথে তার বিয়ে হয়। অতঃপর তার গর্ভে উসামা-(রাঃ)বিন যায়েদের জন্ম হয়। রাসূল সাঃ উম্মে আয়মানকে 'মা' يَا أُمَّ বলে সম্বোধন করতেন এবং নিজ পরিবারভুক্ত بَقِيَّةُ أَهْل بيني বলতেন।

সে সময়ে শহরবাসী আরবদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শহরের জনাকীর্ণ পংকিল পরিবেশ থেকে দূরে গ্রামের নিরিবিলি উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের লালনব্যাধি হ-পালন করলে তারা বিভিন্ন রোগ-'তে মুক্ত থাকে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুঠাম ও সবল হয়। সর্বোপরি তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। সে হিসাবে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ধাত্রী হিসাবে পরিচিত বনু সা'দ গোত্রের হালীমা সা'দিয়াহকে নির্বাচন করেন এবং তার হাতেই প্রাণাধিক পৌত্রকে সমর্পণ করেন।

হালীমার গৃহে দু'বছর দুগ্ধপানকালীন সময়ে তাদের পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। তাদের ছাগপালে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে বরকত নেমে আসে। নিয়মানুযায়ী দু'বছর পরে বাচ্চাকে ফেরত দেওয়ার জন্য তাঁকে মা আমেনার কাছে আনা হয়। কিন্তু হালীমা তাকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। তিনি আমেনাকে বারবার অনুরোধ করেন আরও কিছুদিন বাচ্চাকে তার কাছে রাখার জন্য। ঐ সময় মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। ফলে মা রাযী হয়ে যান এবং বাচ্চাকে পুনরায় হালীমার কাছে অর্পণ করেন।

[আরপৃঃ ৫৬ রাহীকুল মাখতুম-]

শৈশব থেকে নবুওত

নবী জীবনকে প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করে নেয়া হয়েছে - মাক্কী জীবন ও মাদানী জীবন। মক্কায় তাঁর জন্ম, বৃদ্ধি ও নবুঅত লাভ এবং মদীনায় তাঁর হিজরত, ইসলামের বাস্তবায়ন ও ওফাত লাভ।

আরবের মরুদুলাল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হেজাযের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানে জীবনের ৫৩টি বছর কাটান। যার মধ্যে ১৩ বছর ছিল নবুঅতী জীবন। অতঃপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন ও সেখানে জীবনের বাকী ১০ বছর কাটান। অতঃপর সেখানেই ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

[সহি বুখারী: ৩৯০২; সহি মুসলিম: ২৩৫১
মিশকাত: ৫৮৩৭ 'অহীর সূচনা' অনুচ্ছেদ]

অধ্যায়-২: কুরআন এর আলোকে নবীজির বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলি

মানবজীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা ছড়িয়ে আছে সিরাতুন্নবির পরতে পরতে। ইমান ও তাওহিদ, সততা ও সচ্চরিত্র, আদব ও শিষ্টাচার, সবর ও শোকর, দাওয়াত ও জিহাদ-এককথায় দ্বীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ে পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় নবীজির জীবনে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সব ধরনের পাপ ও পদস্খলন থেকে হিফাজত করেছেন। সামান্য অসংগতির ওপরও তিনি কখনো স্থির থাকেননি। এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সত্তাই অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্য।

প্রিয় নবীজির বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলির সংক্ষিপ্তরূপ:

সচ্চরিত্রের আদর্শ

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ এর জীবন ছিলো যাবতীয় গুন এবং শিষ্ঠাচারের আঁধারে পরিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন –

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত"

[সূরা: আল-কালাম, আয়াত-৪]

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন,

‘কুরআনই ছিলো নবীজির চরিত্র’

[সহি মুসলিম- ৭৪৬]

নবীজির চরিত্র এমন ছিলো যে, তিনি স্বাভাবিভাবেই অশালীন ছিলেন না। তার কথা, কাজে কর্মে কোনো প্রকার অশালীনতা দেখা যেত না।

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত –

‘তিনি কখনোই অনিষ্ট দিয়ে অনিষ্টের বদলা নিতেন না, বরং তাদের সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণ করতেন এবং অন্তর থেকে মাফ করে দিতেন’।

[সুনানে তিরমিজি- ২০১৬]

আনাস রা: থেকে বর্ণিত-

রাসূল সাঃ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন; "আল্লাহর কসম, আমি নয় বছর নবীজির খেদমতে ছিলাম। কোনোদিন এমন হয় নি, নবীজি আমাকে বলেছেন, "তুমি এই কাজটি কেন করেছো?" অথবা, কোনো কাজ করিনি নবীজি বলেছেন, "এই কাজ কেন করোনি?"

[সহি বুখারী- ২৭৬৮, সহি মুসলিম- ২৩১০]

উম্মল মুমিনিন সাফিয়া বিনতে হুয়াই বলেন-

"আমি রাসূল সাঃ থেকে উত্তম চরিত্রের কাউকে দেখিনি"

[আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি- ২৫৭৮]

দয়া ও স্নেহে আদর্শ

আবু জার বলেন, 'একবার নবীজি সাঃ রাতে সালাত আদায় করেন এবং একটি আয়াত পড়ে পড়ে দীর্ঘ রুকু ও সিজদা করেন,' আর এভাবে সকাল পেরিয়ে আসে।

আয়াতটি হলো -

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ"।

[সূরা আল-মায়িদা: ১১৮]

“যখন সকাল হয় তখন আবু জার নবীজি সাঃ কে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল আপনি তো এই আয়াত পড়তে পড়তে সকাল করে ফেললেন”

তখন নবীজি বলেন-

'আমার উম্মতের জন্য রবের কাছে আমি শাফআত প্রার্থনা করেছি। যে ব্যাক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যবরণ করবে সেই ব্যাক্তি এই শাফআতের অধিকারী হবে'।

[মুসনাদু আহমমাদ- ২০৮২১]

কুরআনে কারিমে, আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি"

[সূরা আল-আমবিয়া: ১০৭]

বন্দধুত্ব, ভালবাসা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আদর্শ

আয়েশা রা: বলেন -

আমি খাদিজা রা: কে দেখিনি। আর আমি রাসূল সাঃ এর কোনো স্ত্রীর প্রতি তেমন ঈর্ষা বোধ করিনি যেমনটি করেছি খাদিজা রা: এর প্রতি। অথচ রাসূল সাঃ তার কথা প্রায়ই বলতেন। কখনো কখনো বকরি জবাই করে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এরপর খাদিজার বান্ধবীর বাড়ি পাঠাতেন। আর আমি বলতাম, খাফিজা ছাড়া আর কোনো মেয়ে নেই বুঝি!

রাসূল সাঃ তখন গর্ব করে বলতেন -

"ও এমন ছিলো... এমন ছিলো... ওর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে"

সহি বুখারী: ৩৮১৮,সহি মুসলিম: ২৪৩

কথায়, মৌনতায়, হাসি-কান্নায় আদর্শ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين

"আর যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি বিনয়ী হও।"

[সূরা আশ-শো'আরা: ২১৫]

অর্থাৎ তাদের প্রতি অমায়িক আচরণ করুন এবং নম্রতা প্রদর্শন করুন। আল্লাহ তাআলা রাসুল সাঃ-কে গরিব মুমিন ও অন্যদের সঙ্গে বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দিতেন। তিনি নিজ হাতে জুতো সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন। ফকির-মিসকিনদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন। গরিব ও এতিমদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তাদের সাহায্য করতেন।কেউ তাঁকে ডাকলে নির্দ্বিধায় সাড়া দিতেন, সেটা যতই সামান্য কাজে হোক না কেন। তিনি অসুস্থদের খোঁজখবর নিতে ন। জানাজায় হাজির হতেন। গাধায় সওয়ার হতেন। গোলামের ডাকেও সাড়া দিতেন।

[মাদারিজুস সালিকিন: ২/৩২৮]

সবর ও ক্ষমতায় আদর্শ

নবীজি (সা.) নিজের ব্যক্তি-সত্তার উপর যেসব বিপদ-আপদ এসেছে তাতে তিনি চূড়ান্ত ধৈর্য ধারণ করেছেন। চাই তা শারীরিক অসুস্থতা হোক, ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়া শারীরিক নির্যাতন হোক, অপমানজনক কোনো কথা হোক, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের আঘাত হোক। এক্ষেত্রে তিনি কখনো এমন কোনো কথা ও কাজ করেননি, যা ধৈর্যের পরিপন্থি। তায়েফের ঘটনা এর জ্বলন্ত সাক্ষী। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে অথচ তিনি তায়েফবাসীর জন্য দোয়া করছেন। পাহাড়ের দায়িত্বরত ফেরেশতাকে আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন নবীজির পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। বরং উল্টো বলে দিলেন, এদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ হবে, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে।

[সহি বুখারি: ৩২৩১]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন –

«ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادمًا ولا امرأة»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দান ব্যতীত তাঁর হাত দিয়ে কাউকে মারেননি এমনকি তার স্ত্রী ও খাদেমকেও না।“

[মুসলিম, হাদিস: ২৩২৮]

তিনি একাই কুরাইশ ও তাদের নেতাদের দাওয়াত দেয়া ও তাদের সাথে সত্যের আন্দোলনে মুখোমুখি হয়ে এ দ্বীন ইসলাম বিজয় লাভ করা অবধি টিকে থাকার পরও তিনি কখনো বলেননি যে, আমার সাহায্যে কেউ আসেনি

অথবা সকল জাতির লোক আমার বিরোধী আমি একা। বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে মহা বীরত্বের সাথে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে গেছেন এবং লোকদেরকে উৎসাহ দান করেছেন এবং তাদেরকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা থাকার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও লোকেরা দূরে সরে যাওয়ার পরও তিনি স্থির থেকেছেন এসকল আদর্শই প্রমাণ করে তাঁর সাহসীকতা ও ধৈর্য।

অধ্যায়-৩: পবিত্রা স্ত্রীদের সংখ্যা ও নবিজির সাথে বিবাহের ধারাক্রম

নবিজি ﷺ এর মোট এগারো জন স্ত্রী ছিলেন-

১. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাঃ

২. সাওদা বিনতে জামআ আমিরিয়্যা রাঃ:

৩. আয়িশা বিনতে আবু বকর রাঃ

৪. হাফসা বিনতে উমর খাত্তাব রাঃ

৫. জাইনাব বিনতে খুজাইমা হিলালিয়্যা রাঃ

৬. জাইনাব বিনতে জাহাশ আসাদিয়্যা রাঃ

৭. উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া মাখজুমিয়্যা রাঃ

৮. উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফইয়ান উমাবিয়্যা রাঃ

৯. মাইমুনা বিনতে হারিস হিলালিয়্যা রাঃ

১০. জুয়াইরিয়্যা বিনতে হারিস মুসতালাকিয়্যা রাঃ

১১. সাফিয়া বিনতে হুয়াই নাজিরিয়্যা রাঃ

মৃত্যুর সময় রাসুল সাঃ নয় জন স্ত্রী জীবিত রেখে যান। আর খাদিজা ও জাইনাব বিনতে খুজাইমা রা: রাসুল সাঃ এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

পূত-পবিত্র স্ত্রীদের নিয়ে এক অনুপম শান্তিময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন রাসুল সাঃ। নবীজি সাঃ এর দাম্পত্য জীবনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে হলে কুরআনের এ আয়াতটিই যথার্থ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ -

'স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।

[সুরা আন-নিসা: ৪ : ১৯]

অধ্যায়-৪: স্ত্রীদের সাথে নবীজীর আচরণবিধি

স্ত্রীদের সাথে রাসুল সাঃ কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন -.

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِي ا

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"

[সূরা আহযাব - ৩৩:২১]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানব জীবনে আমাদের সবার নিজ নিজ অবস্থান থেকে রাসূল সাঃ কে জানা অত্যন্ত জরুরি যাতে তাকে অনুসরণ করা সম্ভব হয়। স্ত্রীদের সাথে আচার আচরণের বিষয়ে নবীজি উম্মতের জন্য এক উজ্জ্বল নমুনা। দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে একজন স্বামীকে কেমন হওয়া উচিত তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় নবীজির জীবনে। নবীজির মোট **১১** জন স্ত্রী ছিলেন। ইন্তেকালের সময় নবীজি নয় জন স্ত্রী রেখে যান। খাদিজা রা: ও যাইনাব বিনতে খুজাইমা রা: নবীজির পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। নবীজি তার পবিত্র স্ত্রীদের নিয়ে এক শান্তিময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন।

নবীজির দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরতে কুরআন করিমে আল্লাহ বলেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর"

[সূরা-আন-নিসা, ৪:১৯]

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর স্ত্রীর কাছে উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম"

[সুনানে তিরমিজি: ৩৮৯৫]

অধ্যায়-৫: নবীজির বৈবাহিক জীবন

নবীজির বৈবাহিক জীবন যেমনি ছিলো পুত-পবিত্র স্ত্রীদের ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ, তেমনি স্ত্রীদের প্রতিও তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল, ন্যায়-পরায়ক, সুশীল আচরণের একজন। স্ত্রীদের তিনি মিষ্টি আচরণে আগলে রাখতেন। সুন্দর ব্যবহার ছিল তাঁর সংসার-জীবনের ভূষণ।

নবীজি স্ত্রীগনের সাথে প্রাপ্য জৈবিক চাহিদা পূরণের

হক আদায় করতেন

স্ত্রীদের সাথে নবীজির সম্পর্ক ছিলো মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ।

আনাস রা: থেকে বর্ণিত-

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَابِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"নবীজি একই রাতে সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন এবং সবার সাথে পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করতেন। নবীজির তখন ৯ জন স্ত্রী ছিলো। কাতাদা রা:, আনাস রা: কে নবীজির একই রাতে নয় স্ত্রীর সাথে মিলনের কথা জিজ্ঞেস করায় ; আনাস রা: উত্তরে জবাব দিলেন, 'রাসূল সাঃ এর শরীরে ত্রিশ জন যুবকের শক্তি ছিলো'

[সহি বুখারী: ২৬৮, সহি মুসলিম: ৩০৯]

স্ত্রীদের সাথে মধুর অন্তরঙ্গপূর্ণ আচরণে কখনো ফাটল পড়েনি - এমনকি যেদিন রাসূল সাঃ নতুন কোনো স্ত্রীকে ঘরে তুলে আনতেন সেদিনও নয়।

এ বিষয়ে আনাস রা: বলেন-

'নবীজি এর সাথে যখন যাইনাব বিনতে জাহাশের বিয়ে হয় তখন নবীজি নতুন স্ত্রীর ঘর থেকে বের হয়ে আয়েশা রা: এর ঘরে এলেন এবং তার উদ্দেশ্য সালাম জানালেন

اسسلام عليكم اهل البيت ورحمة الله

"ঘরের অধিবাসীর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক" এরপর আয়েশা রা: জবাব দিলন- وعليك اسسلام ورحمة الله "আপনার প্রতিও আল্লাহ-প্রদত্ত শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক "আপনার নতুন স্ত্রীকে কেমন পেলেন? আল্লাহ আপনার জন্য বরকত দান করুন " এভাবে রাসূল সাঃ একে একে তার সকল স্ত্রীর ঘরে যান এবং সবাইকে সালাম জানান আর তারাও নবীজী কে জিজ্ঞেস করেন, নতুনস্ত্রীকে কেমন পেলেন?

[সহি বুখারী: ৪৭৯২, সহি মুসলিম: ১৪২৮]

ইমাম নববি রা: বলেন- এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, যখন কেউ বাড়িতে ফিরে আসে তখন স্ত্রী ও পরিবারের সদ্যদের সালাম দেওয়া মুস্তাহাব।

[ইমাম নববি রা: কৃত শারহু সহি মুসলিম: ৯/২২৫]

নবীজি স্ত্রীদের সাথে বিশ্বস্ত, অধিকার সচেতন এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন

রাসূল সাঃ খাদিজা রা: এর জীবদ্দশায় তার প্রশংসা করতেন। এমনকি তার মৃত্যুর পরও তিনি বরাবরই তাকে স্মরণ করতেন এবং তার গুনের কথা বলতেন, তার মর্যাদার কথা তুলে ধরতেন। তার জন্য ইস্তফার করতেন। আয়েশা রা: বলেন- "খাদিজা রা: এর আলোচনা আসলেই রাসূল তার প্রশংসা করতে থাকতেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তার প্রশংসা করতে করতে কখনো তিনি বিতৃষ্ণ হতেন না

[তাবারানি রা: কৃত আল-মুজামুল কাবির: ১৬/৩১৯]

মৃত্যুর পর দাম্পত্য বন্ধন শেষ হওয়ার পরেও নবীজি তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা: কে স্মরণ করতে ভুলে যেতেন না। তিনি সব সময় বলতেন - আমার খাদিজা এমন গুণবতী ছিলেন, এমন জ্ঞানী ছিলেন। তার গর্ভই আমার সন্তান হয়েছে। এভাবে প্রশংসা করতেই থাকতেন।
রাসূল সাঃ এর সকল সন্তান এর জন্ম খাদিজা রা: এর গর্ভেই। কেবল পুত্র ইব্রাহিম এর জন্ম হয়েছিল রাসূল সাঃ এর দাসী মারিয়ার গর্ভে।

আয়েশা রা: বলেন-

একবার খাদিজা রা: এর বোন হালাহ নবীজির ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, তখন নবীজি মনে করলেন এ যেন খাদিজা রা: অনুমতি চাইছেন। কারণ তাদের দুই বোনের কণ্ঠের ধ্বনি একই রকম হওয়াতে নবীজির মনে খাদিজা রা: এর কথা উদিত হলো।

নবীজি সাঃ তখন বলে উঠলেন-

"ইয়া আল্লাহ, এ যেন হালাহ হয়!" আয়েশা রা: বললেন - তখন আমার ঈর্ষা হলো, আর আমি বলে ফেললাম" কুড়াইশ এর দাঁত পড়া এক বৃদ্ধা মহিলা যিনি সময়ের আবর্তে হারিয়ে গিয়েছেন তার স্মরণেই আপনি এখনো পড়ে আছেন! আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দিয়েছেন।"এমন বাক্য শুনে নবীজর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো যা কেবল আমি দেখেছি। তখন নবীজি বললেন, আল্লাহ তা'আলা খাদিজার চেয়ে উত্তম কাউকে দেননি আমায়। যখন গোটা কুড়াইশ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন খাদিজাই আমাকে সত্য মনে করেছে। যখন মানুষ কুফরিতে লিপ্ত ছিলো তখন খাদিজাই আমার প্রতি প্রথম ঈমান এনেছিল। মহান আল্লাহ, খাদিজার মাধ্যমেই আমাকে সন্তান দান করেছেন। এরপর আয়েশা রা: বললেন- "সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আর কখনো তার সম্পর্কে কিছু বলবো না, শুধু তার প্রশংসই করবো।

[মুসনাদ আমাদ: ২৪/৩৪৩]

নবীজির অন্তরে খাদিজা রা: ছিলেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। রাসূল সাঃ এর হৃদয়ের একচ্ছত্র জায়গা জুড়ে ছিলো প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা:। নবীজির দাম্পত্য জীবনের মোট ৩৮ বছরের ২৫ বছরই কাটিয়ে দিয়েছেন খাদিজা রা: এর সাথে। খাদিজা রা: এর জীবদ্দশায় নবীজি কাউকে বিয়ে করেননি।

আয়েশা রা: বলেন –

"খাদিজার মৃত্যু পর্যন্ত নবীজি সাঃ অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করেন নি"

[সহি মুসলিম: ২৪৩]

স্ত্রীদের সাথে প্রতিদিন অন্তরঙ্গ সময় কাটাতেন

স্ত্রীদের সাথে নবীজির সময় কাটানো ছিলো তাদের অন্তর প্রশান্তকারী। নবীজি সাঃ এর স্ত্রীগণ কখনো স্বামী থেকে দূরে থাকতেন না বরং প্রতিদিই নবীজির দেখা পেতেন। নবীজি প্রতিদিন সকালে এমনটি করতেন এবং সকালে এটিই তার প্রথম কাজ থাকতো।

আয়েশা রা: বলেন–

“এমন দিন খুব কমই যেত, যেদিন রাসূল সাঃ আমাদের সবার কাছে আসতেন না তাছাড়া তিনি সকল স্ত্রীর সাথেই অন্তরঙ্গ হতেন। এ সময়টাতে সবার মন আদর -সোহাগে ভরিয়ে দিতেন। পরিশেষে সেই স্ত্রীর কাছে গিয়ে রাত্রি যাপন করতেন যার সাথে সেই দিনটি কাটানোর পালা থাকতো।"

[সুনানে আবু দাউদ : ২১৩৫]

বনে আব্বাস রা: বলেন - " ফজরের সালাত আদায়ের পর নবীজি সাঃ নামাজের স্থানেই বসে থাকতেন। তাকে ঘিরে বসতো সাহাবীদের জটলা। সূর্য উঠা পর্যন্ত নবীজি সেখানেই বসে থাকতেন। এরপর একে একে সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন এবং তাদের সালাম জানাতেন, তাদের জন্য দোআ করতেন। এরপর সেদিন যে স্ত্রীর কাছে গিয়ে থাকার পালা থাকতো তার ঘরে গিয়ে থাকতেন।"

[তাবারানি আল-মুজামুল আওসাত: ৮৭৬৪]

প্রতিদিন দিবসের প্রথম প্রহরে স্ত্রীদের একজনের সাথে সময় কাটাতেন তিনি। তাকে সালাম জানাতেন এবং তার জন্য দোআ করতেন। আয়েশা রা: বলেন- 'আসরের পর রাসুল সাঃ স্ত্রীদের কাছে আসতেন এবং সবার সাথে দেখা করে একজনের সাথে একান্তে কাটাতেন।'

[সহি বুখারী: ৫২১৬ সহি মুসলিম: ১৪৭৪]

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের চুমু খেতেন

উরওয়া রা: থেকে বর্ণিত- আয়েশা রা: বলেন- "নবীজি সাঃ তার স্ত্রীকে চুমু খেয়ে ওযু না করেই বের হলেন নামাজের উদ্দেশ্য। " উরওয়া বলেন, "সে স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে!"
আয়েশা রা: আমার কথা শুনে হেসে দিলেন।"

[সুনানে তিরমীজী:৭৯ সুনানে আবু দাউদ: ১৭৮]

সওম পালন অবস্থাতেও নবীজি স্ত্রীদের চুমু দিতেন।

আয়েশা রা: বলেন-

"নবীজি রোজা রেখেও স্ত্রীদের চুমু দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। প্রবৃত্তির উপর তিনি তোমাদের চেয়ে বেশি সংযমী ছিলেন।"

[**সহি বুখারী: ১৯২৭ সহি মুসলিম: ১১০৬]**

স্ত্রীর উরুর উপর ঘুমাতেন

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত-

"এক সফরে আমি নবীজির সাথে ছিলাম, ঘটনাক্রমে সেবার আমার গলার হার হারিয়ে যায়। সাহাবীরা সবাই হার খুঁজায় ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। হারের জন্য কাফেলাকে এমন জায়গায় দাঁড়াতে হলো যেখানে কোনো জলাশয়

ছিলোনা আবার লোকদের নিকট কোনো পানিও ছিলো না। এমন সময় আবু বকর রাযি এসে আমাকে বকতে শুরু করলেন। তিনি আঙ্গুল দিয়ে আমার কোমরে ধাক্কা দিলেন।
নবীজি তখন আমার উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন আর নবীজির ঘুমিয়ে থাকার কারণে আমি এতটুকুও নড়িনি।"

[সহি বুখারি: ৪৬০৭, সহি মুসলিম: ৫৫০]

পানপাত্রের যে স্থানে মুখ লাগিয়ে স্ত্রী পান করেছে সেখানে মুখ দিয়ে নবীজি পান করতেন

আয়েশা রা: বলেন - "ঋতুবতী অবস্থাতেও আমি পান করে নবীজিকে দিতাম আর তিনি ঠিক সে জায়গায় মুখ লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে পান করেছি। আবার গোশতযুক্ত হাড় খেয়ে নবীজিকে দিতাম, তিনি সে জায়গায় মুখ লাগাতেন যেখানে আমিও মুখ লাগিয়ে খেয়েছি।"

[সহি মুসলিম: ৩০০]

স্ত্রীর সাথে গোসল করতেন

আয়েশা রা: বলেন,

আমি ও রাসূল সাঃ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমার ও নবীজির মাঝে থাকতো। কখনো রাসূল সাঃ আমার আগে পানি নিতেন আবার কখনো আমি তার আগে পানি নিয়ে নিতাম, এমনকি তিনি বলতেন, "আমার জন্য রাখো।" আমিও তাকে বলতাম আমাকেও নিতে দিন।"

[সহি বুখারি: ২৫০, সহি মুসলিম: ৩২১]

উম্মে সালামা রা: থেকে বর্ণিত –

"আমি ও নবীজি সাঃ একই বালতি থেকে পানি নিয়ে একসাথে ফরজ গোসল করতাম।“

ইবনে আব্বাস রা: বলেন - নবীজি সাঃ ও তার স্ত্রী মাইমুনা রা: একই বালতি থেকে পানি নিয়ে একসাথে গোসল করতেন। "

[সহি বুখারি : ২৫৩, সহি মুসলিম: ৩২২]

স্ত্রীর মাজা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন

আয়েশা রা: বলেন-

"আমার উপর আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানি হচ্ছে, রাসূল সাঃ আমার ঘরেই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিটি আমার পালায় ছিলো। মৃত্যুর সময় তার ও আমার মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। সেদিন আব্দুর রহমান আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার হাতে একটি মিসওয়াক ছিলো, নবীজি সেটি দেখে তাকিয়ে ছিলেন। আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক করতে পছন্দ করতেন। এরপর আমি তার মিসওয়াকটা নেই এবং তাকে জিজ্ঞেস করি নরম করে দেই? তিনি মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন। আমি দাঁত দিয়ে মিসওয়াকের আগা কেটে নরম করে চিবিয়ে নবীজি সাঃ কে দিলাম। তিনি আমার বুঁকের উপর মাথা রেখে মিসওয়াক করলেন।"

[সহি বুখারি: ৪৪৩৮]

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই চাদরের নিচে শুতেন

আয়েশা রা: বলেন –

"আমি ঋতুবতী অবস্থায় থাকলেও নবীজি সাঃ আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলোয়াত করতেন।"

[সহি বুখারি: ৩৬৭২, সহি মুসলিম : ২৬৭]

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত –

"আমি একবার রাসুল সাঃ এর সাথে একই চাদরের নিচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়েজ শুরু হলে আমি চাদর থেকে সরে আসি। তখন তিনি বললেন তোমার কি হায়েজ হচ্ছে? আমি বললাম হ্যা। তখন তিনি বললেন কাপড় পড়ে এসো, এরপর তিনি আমায় ডাকলেন তার সাথে একই চাদরের নিচে। "

[সহি বুখারি: ২৯৮, সহি মুসলিম : ২৯৬]

আদর করে স্ত্রীকে ছোট নামে ডাকতেন

কাজী ইয়াজ বলেন –

'আদর সোহাগ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে নবীজি আয়েশা রা: কে হুমাইরা নামে ডাকতেন।'

[মাশারিকুল আনওয়ার: ১/৭০২]

আয়েশা রা: বলেন –

"কিছু হবশি বালক মসজিদে খেলাধুলা করছিলো, নবীজি সাঃ তখন আমাকে ডেকে বললেন, 'হুমাইরা তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও?' আমি উত্তর দিয়ে বললাম হ্যা।'

[ফাতাহুল বারি: ২/৪৪৪]

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- একদিন নবীজি সাঃ আমাকে বললেন, "হে আয়িশ, জিব্রাইল আঃ তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।" তখন আমি বললাম, "তার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"

[সহি বুখারি: ৩২১৭ সহি মুসলিম: ২৪৪৭]

রাসূল সাঃ আয়েশা রা: কে আব্দুল্লাহ উপনামেও ডেকেছেন। আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- "আব্দুল্লাহ বিন জুবাইয়ের এর জন্মের পর আমি তাকে নিয়ে নবীজি সাঃ এর নিকট নিয়ে যাই। আব্দুল্লাহর মুখের ভিতর তিনি নিজের লালা দিলেন এবং বললেন "এ হলো আব্দুল্লাহ আর তুমি উম্মে আব্দুল্লাহ" এরপর থেকে আমাকে এ উপনামেই ডাকা হতো।

[সহি ইবনে হিব্বান: ৭১১৭]

কোনো স্ত্রী দেখা করতে আসলে ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন

সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাঃ বলেন-

একবার রাসূল সাঃ ইতেকাফে ছিলেন আর আমি তার সাথে দেখা করতে আসলাম। দুজনের কথাবার্তাও হলো। এরপর যখন যাওয়ার উদ্দেশ্য উঠে দাঁড়ালাম তখন নবীজিও উঠে দাঁড়ালেন আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য।

পথে দুজন আনসারীর সাথে দেখা হলে তারা দ্রুত পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো। তখন রাসূল সাঃ তাদেরকে ডেকে বললেন, দাড়াও - জলদি করো না। " ও হলো সাফিয়া বিনতে হুয়াই।" (আমার স্ত্রী) তারা বললো, "সুবহান আল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমরা আপনার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করিনা)।

তখন নবীজি সাঃ বললেন –

"শয়তান মানুষের রক্তে রক্তে চলে। আমার ভয় হলো, শয়তান তোমাদের অন্তরে খারাপ কোনো চিন্তা ঢুকিয়ে দেবে।"

[সহি বুখারি : ২০৩৮ সহি মুসলিম : ২১৭৫]

রাসূল সাঃ ইতেকাফের ইবদতে বিঘ্ন ঘটিয়ে স্ত্রীকে পথে রক্ষার জন্য বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ কতটা গুরুত্বহ তা এ হাদিস থেকেই প্রমান পাওয়া যায়। যদিও ইতেকাফের সময় কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নিয়ত করার পর উঠতে পারে না। মুমিন স্বামী ও স্ত্রীর সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য রাসূল সাঃ এর সুন্নই যথেষ্ট। তিনি সর্বদাই স্ত্রীদের প্রতি হৃদয়ে লালিত ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতেন। প্রিয় নবীজি সাঃ তার পুত পবিত্র স্ত্রীদের সাথে কল্যাণময় এবং সুখময় এক দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। কেননা, তার সুখময় এই জীবন ছিলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ।
কুরআন কারিমে আল্লাহ বলেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
"নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।"

[সূরা নিসা: ৪:১৯]

“আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সাঃ নিজেই বলেন- "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর স্ত্রীর কাছে উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম।"

[সুনানে তিরমীজী: ৩৮৯৫]

স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন- " ঈমানের বিচারে সেই পরিপূর্ণ মুমিন, যার চরিত্র সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাক্তি হলো সেই যে চরিত্রের বিচারে স্ত্রীর কাছে উত্তম। "

[সুনানে তিরমীজী: ১০৮২]

রাসূল সাঃ স্ত্রীদের প্রতি কোমল আচরণের আদেশ করেছেন। তিনি বলেন 'তোমরা স্ত্রীদের কল্যাণ কামনা করো আর তাদের সদুপদেশ দেও, কেননা তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি যদি তাদেরকে

সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে যাবে আর যদি সোজা না করে ফেলেই রাখো তবে তা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাকবে।'

[সহি বুখারি: ৩৩৩১ সহি মুসলিম: ১৪৬৮]

স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতেন

আনাস বিন মালিক বলেন-

"রাসূল সাঃ এর এক ফরাসি প্রতিবেশি ছিলো। তিনি স্যুপ তৈরিতে দক্ষ ছিলেন। একদিন স্যুপ রান্না করে রাসূল সাঃ কে দাওয়াত দিতে আসলেন। নবীজি সাঃ তখন বললেন আয়েশাও ? লোকটি বললেন, না। তখন নবীজিও বললেন তাহলে আমিও না। লোকটি আবার দাওয়াত দিলেন, নবীজি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশও? লোকটি বললেন, না। রাসূল সাঃ আবারও মানা করে দিলেন। ৩য় বার দাওয়াত দেয়ার পর নবীজি আবারও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। এরপর লোকটি বললেন, হ্যা। এরপর নবীজি সাঃ লোকটির দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং আয়েশা রা: কে নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন।"

[সহি মুসলিম: ২০৩৭]

স্ত্রীদের অনুভূতির প্রতি সচেতন ছিলেন

প্রিয় নবীজি সাঃ তার স্ত্রীদের মনের অনুভূতির দিকেও খেয়াল রাখতেন। একবার তিনি আয়েশা রা: কে বলেন –

"আয়েশা তুমি কখন আমার উপর সন্তুষ্টি থাকো এবং কখন অসুন্তষ্টি থাকো, আমি কিন্তু তা বুঝতে পারি।" তখন আয়েশা রা: জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে বুঝতে পারেন?

রাসূল সাঃ বলেন –

"যখন তুমি আমার উপর খুশি থাকো তখন বলো - মুহাম্মাদের রবের কসম। আর যখন মন খারাপ করে থাকো তখন বলো - ইব্রাহিমের রবের কসম।" এ কথা শুনে আয়েশা রা: বললেন- হ্যা, আল্লাহর রাসূল, আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি কেবল আপনার নামটই উচ্চারণ করি না, 'তবে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসার কমতি হবে না।'

[সহি বুখারি: ৫২২৮ সহি মুসলিম: ২৪৩৯]

স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি সচেতন থাকার আরেকটি অন্যতম উদহারণ হলো সাফিয়া রা: এর ঘটনা। নবীজি সাঃ স্ত্রী হাফসা এবং সাফিয়া রাঃ এর মধ্যে মনোমালিন্য হলো। একবার হাফসা রাঃ, সাফিয়া রাঃ- কে ইয়াহুদীর মেয়ে বলে নিন্দা করলেন। তখন সাফিয়া রাঃ, রাসূল সাঃ এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি সুন্দর কথা দিয়ে সাফিয়া রাঃ এর মনে প্রশান্তি এনে দেন।

নবীজি তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন-

"তুমি একজন নবীর মেয়ে"। একজন নবী তোমার চাচা। "তাছাড়া, তুমি একজন নবীর স্ত্রী, সে কিভাবে তোমার উপর গৌরব বোধ করে।"

[তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/২৬৮, সুনানে তিরমীজী: ৩৮২৯]

স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকাইয়া করতেন

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত –

"স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে নবীজি সাঃ তাকে দেখতে যেতেন এবং তার উপর ডান হাত রেখে রুকাইয়া করে দিতেন, অর্থাৎ সূরা ফালাক ও নাস পড়ে অসুস্থ স্ত্রীর গায়ে হাত বুলিয়ে দোআ করতেন - "হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু, কষ্ট দূর করে দিন, সুস্থ করে দিন। আপনিই শেফাদানকারী। আপনি ছাড়া কেউ রোগমুক্ত করতে পারে না। এমনভাবে শেফা দান করুন যার পরে কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না।"

[সহি বুখারি : ৫৭৪৩ সহি মুসলিম : ২১৯১]

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত –

"উম্মে জার এর হাদিস যেখানে, এগারো জন নারীর মধ্যে একজন তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ বর্ণনা করেন - তিনি বলেন, "সে কখনোই আমার কষ্টে হাত বাড়ায়নি।"

[সহি বুখারি: ৫১৮৯ সহি মুসলিম: ২৪৪৮]

স্ত্রী অসুস্থ ও বিষণ্ণ হলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন

"হজের সময় আয়েশা রা: এর হায়েজ শুরু হয়ে যায় যার দরুন তিনি কান্না করছিলেন। নবীজি সাঃ যখন দেখলেন আয়েশা রা: কেঁদেই যাচ্ছে। তখন জিজ্ঞেস করলেন- "কি হয়েছে তোমার ? তোমার কি হায়িজ হচ্ছে ?

উত্তরে আয়েশা রা: বললেন - জ্বী হ্যা।" তাহলে কাঁদছো কেনো? এতে কাঁদার কিছু নেই। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক আদম কন্যার জন্য নির্ধারিত। তুমি বায়তুল্লার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জ্ব এর বাকি সব আমলগুলো করতে পারবে।

"আয়েশা রাঃবলেন-

নবীজি সাঃ "হজ্জ্ব আদায়ের পর আব্দুর রহমানকে আদেশ দিলেন যেন আমাকে তানয়িম থেকে উমরা করিয়ে আনেন, যেখান থেকে আমি উমরার জন্য এহরাম বাঁধি।"

[সহি বুখারি: ৩১৬ সহি মুসলিম: ১২১]

স্ত্রীর প্রতি নবীজির সহমর্মিতা

নবীজি সাঃ এর স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতার আরেকটি নিদর্শন হলো, সাফিয়া রা: এর উটের ঘটনা।

সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা: থেকে বর্ণিত –

"নবীজি সাঃ একবার স্ত্রীদের নিয়ে হজ্জ্ব যাত্রায় বের হলেন। পথে এক ব্যাক্তি উটের গতি বাড়িয়ে চললো। উটগুলো দ্রুত চলার কারণে রাসূল সাঃ সেই ব্যাক্তিকে বললেন, "সাবধানে চলো নারীরা আছে।" এরিমধ্যে হঠাৎ করে সাফিয়া রা: এর উটটি বসে পড়লো। উটটিকে হাটু গেড়ে বসতে দেখে তিনি কান্না করতে লাগলেন। নবীজি সাঃ জানতে পেরে এগিয়ে এলেন এবং সাফিয়া রা: এর চোখের পানি নিজ হাতে মুছে দিলেন।

"এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, সাফিয়া রা: এর কান্না করার কারণ যদিও তেমন গুরুতর ছিলো না, তবুও নবীজি সাঃ নিজ হাতে স্ত্রীর অশ্রু মুছে দিয়ে স্ত্রীর প্রতি সমবেদনা এবং তার অন্তরে স্ত্রীর প্রতি অঘাত আদর ও ভালোবাসার প্রকাশ দেখিয়েছেন।

[মুসনাদু আহমাদ: ২৬৩২৫]

বাড়ির কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন

আসওয়াদ রা: থেকে বর্ণিত - তিনি বলেন,

"আমি আয়েশা রা: কে জিজ্ঞেস করলাম, রাদুল সাঃ ঘরে এসে কি করতেন? তিনি উত্তরে বললেন - ঘরে এসে তিনি ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। স্বলাতের সময় হলে স্বলাতের জন্য বের হয়ে যেতেন। তিনি নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন। নিজের কাপড় নিজে সেলাই, নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন, দুধ দোয়াতেন, নিজের জামা নিজে পরিষ্কার করতেন।

[সহি বুখারি: ৬৭৬]

স্ত্রীদের দেওয়া কষ্টে সবর করতেন

নুমান বিন বশির রা: থেকে বর্ণিত-

স্ত্রীরা রাগান্বিত হলে নবীজি সাঃ সবরের সাথে সব কিছু মেনে নিতেন। একবার আবু বকর রা: নবীজির ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। আবু বকর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন আয়েশা রা: নবীজির সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলছে। আবু বকর রা: তখন রেগে উঠলেন এবং বললেন 'হে উম্মে রুমানের মেয়ে ' তোমার সাহস কত! তুমি নবীজির সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলছো। রাসূল সাঃ তখন নিজ স্ত্রীকে রক্ষার জন্য বাবা এবং মেয়ের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর আবু বকর রা: চলে গেলে নবীজি আয়েশা রা: কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললেন, "দেখলে, কিভাবে তোমাকে তোমাদের মাঝে এসে রক্ষা করলাম"।

কিছুক্ষনপর আবু বকর রা: আবার ফিরে এসে দেখলেন আয়েশা রা: এবং নবীজি সাঃ হাসতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন "হে আল্লাহর রাসূল, আপনাদের যুদ্ধে যেমন শরিক ছিলাম তেমনি আপনাদের খুশিতেও আমাকেশরিক করে নিন"।

[মুসনাদে আহমাদ: ১৭৯২৭]

উমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত-

"আমরা যখন মক্কায় ছিলাম তখন আমরা কুড়াইশরা নারীদের উপর রাজত্ব করতাম, কিন্তু মদিনায় এসে দেখি আনসারী নারীরা পুরুষদের উপর কর্তৃত্ব চালায়।" 'একবার আমি কোনো এক কারণে আমার স্ত্রীর উপর জোড় গলায় কথা বলি তখন আমার স্ত্রীও আমার সাথে জোড় গলায় কথা বলে তর্ক করেন, যা আমার পছন্দ হয় নি। তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলেন, আপনি আমার আচরণে হতবাক! কিন্তু নবীজি সাঃ এর স্ত্রীরও তাঁর সাথে উঁচু

স্বরে কথা বলেন। এমনকি অনেকে রাগ করে নবীজি সাঃ এর সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কথাও বলেন না।' অথচ নবীজি সাঃ তাদের সাথে সবরের মোকাবিলা করে থাকেন।'

[সহি বুখারী: ৮৯ সহি মুসলিম: ১৪৭৯]

নবীজি স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও সুরভীত রাখতেন

সুরাই রা: থেকে বর্ণিত –

"আমি আয়েশা রা: থেকে জানতে চাইলাম নবীজি সাঃ ঘরে এসে প্রথমে কোন কাজটি করেন? তিনি বললেন - নবীজি সাঃ ঘরে প্রবেশ করে প্রথমেই মিসওয়াক করেন।"যখনি ঘুম থেকে উঠতেন, মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করে নিতেন।

আয়েশা রাঃ বলেন- " দিনের বেলা বা রাতে যখনি নবীজি সাঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখনি অজুর আগে মিসওয়াক করে নিতেন। "

[সুনানে আবু দাউদ: ৫৭]

ইবনুল কাইয়িম রা: থেকে বর্ণিত-

"নবীজি সাঃ মিসওয়াক পছন্দ করতেন। মিসওয়াক করতেন অজুর আগে, নামাজের সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, রোজা অবস্থায়, ঘুম থেকে জাগ্রত হলে।"

[জাআল-মুজামুল আওসাত: ৮৭৬৪, সুনানুন নাসায়ি: ৩৯৩৯]

স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত –

"আমি একবার নবীজির সাথে সফরে বের হলাম। তিনি সাহাবীদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা এগিয়ে চললো। এরপর নবীজি সাঃ আমাকে বলেন, 'চলো দৌড় প্রতিযোগিতা করি।' আমি তখন অনেক হালকা ছিলাম তাই সহজেই দৌড় প্রতিযোগিতায় তাকে হারিয়ে দিলাম। নবীজি সাঃ চুপ করে থাকলেন, কিছু বললেন না। এরপর অনেক সময় কেটে যায়। আমি প্রায় ভুলেও যাই প্রতিযোগিতার কথা। হঠাৎ কোনো

এক সফরে নবীজি সাঃ আবার বললেন সাহাবীদের, 'তোমরা সামনে এগিয়ে চলো, সাহাবীরা এগিয়ে যাওয়ার পর, নবীজি সাঃ বললেন, "চলো দৌড় প্রতিযোগিতা করি।" তখন আমার শরীর আগের থেকে বেড়ে যায়। আমি দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গেলাম। নবীজি সাঃ তখন হেসে বললেন "এটা সেইদিনের প্রতিশোধ"

[সুনানে আবু দাউদ: ২৫৭৮ মুসনাদে আহমাদ: ২৫৭৪৫

সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯৭৯]

শত ব্যাস্ততা, অধিক কাজের দায়িত্ব থাকার পরেও নবীজি সাঃ তাঁর স্ত্রীদের মনোরঞ্জনের দিকে খেয়াল রেখেছেন

স্ত্রীদের বৈধ খেলাধুলা দেখতে দিতেন

আয়েশা রা: বলেন –

"একবার রাসূল সাঃ ঘরে বসে ছিলেন। এমন সময় বাহির থেকে কিছু ছোট বাচ্চাদের কণ্ঠ এবং হই-হুল্লোড় শব্দ শুনতে পাই। নবীজি সাঃ উঠে গিয়ে দেখেন, কিছু হাবশি তাদের বল্লম নিয়ে খেলা করছে।

তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন – "হে আয়েশা এদিকে এসো, দেখো।" আমি এগিয়ে আসলাম, তিনি বললেন তুমি কি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যা। এরপর আমি তাঁর কাঁধের উপর মুখ দিয়ে বালকদের খেলা দেখতে লাগলাম। একটু পর তিনি বললেন - "খেলা দেখেছো? মন ভরেছে? নবীজি সাঃ এর কাছে আমার মর্যাদা কতখানি তা জানার জন্য আমি বললাম, না।"

এরপর তিনি আমার জন্য সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমিই পরে সেখান থেকে চলে আসি।'

[সুনানে তিরমীজী : ৩৬৯১ সহি মুসলিম: ৮৯২]

এই হাদিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতীয়মান হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করা এবং তাঁর বৈধ ইচ্ছার প্রতিপালন করা। স্ত্রী হালাল বিনোদনে আগ্রহী হলে সেটার ব্যবস্থা করে দেয়া।

ঈদের সময় বৈধ কবিতা-গান শুনতে ও আনন্দ-মনোরঞ্জনে স্ত্রীদের নিষেধ করতেন না

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত –

"একবার রাসূল সাঃ আমার ঘরে এসে দেখলেন, দুজন বালিকা আমার পাশে বসে বুয়াসের যুদ্ধের আনসারদের দুই গোত্র (আওস ও খাজরাজ) এর কবিতা আবৃত্তি করছে। আওস ও খাজরাজ এর মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল আর সেদিনটি হচ্ছে বুয়াসের দিন। নবীজি সাঃ ঘরে এসে মুখ ঘুরিয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন। আবু বকর রা: ঘরে ঢুকে এসব দেখে আমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'রাসূল সাঃ এর ঘরে শয়তানের যন্ত্র।'

নবীজি সাঃ তখন বলেন, "ওদের কিছু বলোনা।"

এরপর আবু বকর রাঃ অন্যদিকে মনোযোগ ফিরিয়ে নিলে, আমি তখন ইশারায় বালিকা দুজনকে চলে যেতে বলি, তারা তখন বেরিয়ে যায়। আর 'সেদিনটি ছিলো ঈদের দিন।"

ইবনে হাজার থেকে বর্ণিত –

এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দীর্ঘ সময় ইবাদতে সময় কাটানোর পর, ঈদের দিন পরিবার, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মনোরঞ্জন ও বিনোদনের বৈধতা করা জায়েজ। তবে সেটা হালাল হতে হবে। এই হাদিসে নারীদের প্রতি কোমল আচরণ করা ও তাদেরকে আদর সোহাগ দিয়ে আগলিয়ে রাখার বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছে।"

[ফাতহুল বারি: ২/৪৪৩

নবীজি সাঃ, স্ত্রীর বিনোদন এর ব্যাপারে এতেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং তিনি আয়েশা রাঃ এর কাছে তার খেলার সাথীদের আসাও অনুমতি দেন। আয়েশা রা: বলেন- "আমি পুতুল খেলতাম, আমার কয়েকজন খেলার সাথী ছিলো। যখন নবীজি সাঃ ঘরে আসতেন তখন তারা আড়ালে চলে যেত। রাসূল সাঃ তখন তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসতেন এরপর আমরা আবার আগের মতো করে খেলা শুরু করতাম।"

[সহি বুখারি: ৬১৩০ সহি মুসলিম: ২৪৪০]

ইমাম নববি রা: বলেন- 'এটি রাসূল সাঃ এর প্রগাঢ় ভালোবাসা, স্নেহ-মায়া ও উৎকৃষ্ট আচরণের পরিচয়।'

[সহি মুসলিম: ১০/২০৫]

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত –

"রাসূল সাঃ তাবুক বা খাইবার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর যখন ঘরে ঢুকলেন, আমার কিছু খেলনা দেখতে পেলেন। আমার খেলনাগুলোর উপরে একটি পর্দা ছিলো, হঠাৎ বাতাসের কারণে পর্দার এক প্রান্ত সড়ে যায়

তখন নবীজি সাঃ কিছু পুতুল দেখতে পান। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'এগুলো কি?' আমি বলি, 'আমার পুতুল?' এরপর রাসূল সাঃ দুই ডানা বিশিষ্ট একটি ঘোড়া দেখতে পায়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কি?' আমি বলি, ঘোড়া। এরপর বলেন, 'ঘোড়ার পিঠে এ দুটো কি?' আমি বলি, 'ডানা, তখন তিনি বলেন, ঘোড়ার পিঠে দুটি ডানা?' তখন আমি বলি, কেনো? আপনি কি শুনেননি সুলাইমান আঃ এর ঘোড়ার পিঠে অনেকগুলো ডানা ছিলো। 'এসব কথা শুনে নবীজি সাঃ এমন হাসলেন যে তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো।'

[সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৩২]

রাসূল সাঃ সাহাবীদের সব সময় তাদের স্ত্রীদের সাথে হাসি - কৌতুক করার, রসিকতা করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে থাকতেন। যাতে করে নারীদের মন, অন্তর পুলকিত হয়, প্রফুল্ল হয়।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা: বিয়ে করলে রাসূল সাঃ বলেন –

"তুমি কিশোরী মেয়ে কেনো বিয়ে করলে না, তাহলে তুমি তার সাথে খেলতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে খেলতো। কিংবা তুমি তাকে হাসাতে এবং সেও তোমাকে হাসাতো।"

[সহি বুখারি: ২০৯৭ সহি মুসলিম: ৭১৫]

স্ত্রীদের পরস্পরের ঠাট্টার সম্মতি দিতেন

প্রিয় নবীজি সাঃ এর ঘর যেন শুধু ঘর ছিলো না, এ যেন এক খুশির মহল ছিলো। আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত –

"একবার সাওদা রা: আমার ঘরে এলেন, তখন রাসূল সাঃ আমার ঘরে। তার এক পা ছিলো আমার কোলে এবং আরেক পা ছিলো সাওদার কোলে। আমি সাওদা রা: এর জন্য 'হারীরা (এক প্রকার আটা, চর্বি ও পানি দিয়ে তৈরী স্যুপ জাতীয় খাবার)। তাকে বললাম, "নেও খাও, তিনি অস্বীকার করলেন।

"আমি বললাম, তোমাকে অবশই খেতে হবে নাহলে আমি তোমার মুখে খাবার লাগিয়ে দিবো। এরপও সাওদা খেলেন না।" এরপর আমি তার মুখে খাবার মেখে দিলাম। এটা দেখে রাসূল সাঃ হেসে উঠলেন। এরপর তিনি সাওদকে বললেন, তুমিও আয়েশার মুখে খাবার মেখে দেও। সাওদও আমার মুখে খাবার লাগিয়ে দেয়। রাসূল সাঃ আবারও হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ, উমর তখন ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ডাক দিলেন, 'হে আব্দুল্লাহ বিন উমর' নবীজি সাঃ তখন মনে করলেন, উমর হয়তো ঘরে প্রবেশ করবেন তাই তিনি তার স্ত্রীদেরকে বললেন "যাও তোমরা মুখ ধুয়ে নেও।"

[সুনানে নাসায়ী: ৮৯১৭]

নবিজি স্ত্রীদের কৌতুক শুনতেন

রাসুল স্ত্রীদের কৌতুক শুনতেন, আয়িশা রা: বলেন, 'আমি একবার রাসুল সাঃ এর উদ্দেশ্যে বললাম-

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا ، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ قَالَ " فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا ". تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

"আল্লাহর রাসুল, মনে করুন, আপনি একটি উপত্যকায় অবতরণ করলেন আপনার উটকে খাবার খাওয়াবেন বলে। উপত্যকায় একটি গাছ আছে, যার পাতা খাওয়া। অন্য আরেকটি গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। আপনি কোনটা থেকে উটকে খাওয়াবেন?"

রাসুল উত্তর দিলেন –

"যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি।" আয়িশা রাঃ এ কথার মাধ্যমে নিজেকেই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসুল কেবল তাকেই কুমারি অবস্থায় বিয়ে করেছেন।"

[সহি বুখারি: ৫০৭৭]

আরেকবারের ঘটনায়- আয়িশা বলেন-

"বাকি কবরস্থানে একটা জানাজা ছিল। জানাজা থেকে ফিরে এসে রাসুল দেখলেন, আমি মাথা ব্যথায় কাতরাচ্ছি। আমি বলছিলাম, ওহ! আমার মাথা!" আমার কথা শুনে তিনি বললেন, "বরং মাথা ব্যথা আমার।

তুমি যদি মাথা ব্যথায় মারা যাও, তবে তোমার তো কোনো কষ্ট নেই। সব কষ্ট তো আমাকেই করতে হবে। তোমাকে গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে, এরপর জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে না!" আমি বললাম, "হাঁ, আপনি তো তা-ই চান। আমি মারা যাই, আর সেদিনই আপনি অন্য স্ত্রী আমার ঘরে এনে তার সাথে সময় কাটান।" রাসুল আমার কথা শুনে মুচকি হাসলেন। এ ঘটনার কিছু দিন পরই রাসুল সাঃ -এর মৃত্যুর অসুস্থতা শুরু হয়।"

[মুসনাদু আহমাদ: ২৪৭২০, সুনানু ইবনি মাজাহ ১৪৬৫,
ঘটনার সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হয়েছে বুখারিতে: ৫৬৬৬]

রাত্রি ভ্রমণে স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন

রাসুল যখন বের হতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারি দিয়ে সফরসঙ্গী নির্বাচন করতেন। একবার এ রকম ভ্রমণের লটারিতে আয়িশা ও হাফসা-এর নাম এল। দুজনই রাসুল-এর সাথে বের হলেন। রাসুল প্রায় রাতের বেলা আয়িশা-কে নিয়ে বের হতেন, তাঁর সাথে কথা বলতেন। এবার হাফসা আয়িশা-কে বললেন, 'তুমি কি রাতের বেলা আমার বাহনে চড়বে আর আমি তোমারটায় ? তারপর আমরা দেখব কী হয়।' আয়িশা বললেন, 'হ্যাঁ।' যেমন বলা তেমন করা।

এরপর রাসুলুল্লাহ আয়িশা-এর বাহনের নিকটে এলেন, কিন্তু তার ওপরে যে হাফসা। রাসুল এসে তাকে সালাম দিলেন, তাকে নিয়ে ভ্রমণে বের হলেন। এভাবে আয়িশা সুযোগ হারালেন। এতে তার ঈর্ষা হতে লাগল। বাহন থেকে নেমে তিনি পদযুগল ইজখির ঘাসে জড়াতে লাগলেন। বলতে থাকলেন,

“হে রব, আমার ওপর বিচ্ছু বা সাপ নিযুক্ত করে দিন, যেন সেগুলো আমাকে দংশন করে। আপনার রাসুলকে আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না”

[সহি বুখারি: ৫২১১, সহি মুসলিম: ২৪৪৫]

স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য করতেন

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত-

"একবার দেখলাম, সাফিয়্যা রাঃ.উটে ওঠার চেষ্টা করছেন। এটা দেখে নবীজি তাকে তাঁর নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন – (যেন ওঠার সময় আওরাহ অসাবধানতাবশত উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে), তারপর উটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, যেন তাঁর হাঁটুর ওপর পা রেখে তিনি উটে উঠতে পারেন।”

[সহি বুখারি: ২৮৯৩, মুসলিম: ১৩৬৫]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রীদের সাথে নবীজজসাঃ এর আচরণ কতটা কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিল।

আনাস বলেন-

'রাসুল তাঁর কোনো এক সফরে ছিলেন। তখন আনজাশা নামক কালো এক কিশোর গান গেয়ে উট চালাচ্ছিল। ফলে উটগুলো জোরে পা ফেলছিল, রাসুল সাঃ তাকে বললেন-"আনজাশা, উট ধীরে চালাও, তুমি কিছু কাচপাত্র (মহিলা) সাথে নিয়ে সফর করছ।"

[সহি বুখারি : ৬১৬১, সহি মুসলিম: ২৩২৩]

রাসুল সাঃ এর কথার উদ্দেশ্য ছিল, উটের চলার গতি কমিয়ে মহিলাদের সফর সহজ করা। কারণ, উট যখন উটচালকের গান শুনত, তখন উট জোর গতিতে চলতে শুরু করত। এতে করে কষ্টে পড়ত আরোহীরা। এছাড়া নারীগণ দুর্বল গড়নের হওয়ার কারণে উটের দ্রুত চলার ধকল সইতে না পারার কিনংবা উট থেকে পড়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকত। রাসুল সাঃ তাই আনজাশাকে গান গাইতে নিষেধ করেছিলেন।'

[ইমাম নববি রা: কৃত সহি মুসলিম: ১৫/৮১]

অধ্যায় – ৫: মুমিন নারীদের জন্য আদর্শ হিসেবে স্ত্রীদেরকে তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া

স্ত্রীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক করা সত্ত্বেও নবীজিসাঃ স্ত্রীদের তালিম-তরবিয়তের প্রতি ছিলেন বেশ আগ্রহী ও সচেতন। উদ্দেশ্যছিলো-তাঁরা যেন অন্য নারীদের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে গড়েওঠেন। স্ত্রীকে তালিম-তরবিয়তের মাধ্যমে গড়ে তোলা স্বামীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

دَّثَنَاإِسْمَاعِيلُ،حَدَّثَنِيمَالِكٌ،عَنْعَبْدِاللَّهِبْنِدِينَارٍ،عَنْعَبْدِاللَّهِبْنِعُمَرَ-رضىاللهعنهما-أَنَّرَسُولَاللَّهِصلىاللهعليهوسلمقَالَ
" أَلاَكُلُّكُمْرَاعٍ،وَكُلُّكُمْمَسْئُولٌعَنْرَعِيَّتِهِ،فَالإِمَامُالَّذِيعَلَىالنَّاسِرَاعٍوَهْوَمَسْئُولٌعَنْرَعِيَّتِهِ،وَالرَّجُلُرَاعٍعَلَىأَهْلِبَيْتِهِوَهْوَمَسْئُولٌعَنْرَعِيَّتِهِ،وَالْمَرْأَةُرَاعِيَةٌعَلَىأَهْلِبَيْتِزَوْجِهَاوَوَلَدِهِوَهِيَمَسْئُولَةٌعَنْهُمْ،وَعَبْدُالرَّجُلِرَاعٍعَلَىمَالِسَيِّدِهِوَهْوَمَسْئُولٌعَنْهُ،أَلاَفَكُلُّكُمْرَاعٍوَكُلُّكُمْمَسْئُولٌعَنْرَعِيَّتِهِ ".

ইসমাঈল (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন –

“জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।“

“পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।“

“নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যাক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে”

অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।“

[সহিহ বুখারি: ৬৬৫৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন –

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন-সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে কি না। এমনকি পুরুষকে তারপরিবারের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

[নাসায়ি: ৯১৭৪]

স্ত্রীদের মুত্তাকি ও চরিত্রবান হতে আদেশ দিতেন

আয়িশা বলেন –

রাসুল সাঃ আমাকে সম্বোধন করে বললেন,

"আয়িশা, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। নম্র হও। কারণ, নম্রতা যেকোনো কিছুকেই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর নম্রতা হারালে যেকোনো কিছুই তার সৌন্দর্য হারায়।

[মুসনাদে আহমাদ: ২৩৭৮৬]

স্ত্রীদের সুন্দর কথা বলার শিক্ষা দিতেন

আয়িশা রাঃ বলেন –

"একদল ইহুদি এল রাসুল সাঃ -এর কাছে। তারা সম্ভাষণ জানিয়ে বলল –

"আসসামু আলাইকুম" অর্থাৎআপনার মৃত্যু হোক"

রাসুল সাঃ জবাব দিলেন – "ওয়া আলাইকুম অর্থাৎ তোমাদেরও।"

তখন আমি বললাম, "আসসামু আলাইকুম, ওয়া লা আনাকুমুল্লাহু, ওয়া গাজাবা আলাইকুম। "তোমাদের মৃত্যু হোক। আল্লাহর অভিশাপ তোমাদের ওপর। আল্লাহর গজব তোমাদের ওপর।"

রাসুল সাঃ এবার আমাকে বললেন –

"ছাড়ো, আয়িশা! তুমি দয়ার্দ্র হও। কদর্য কথা থেকে বিরত থাকো"

আয়িশা রাঃ বললেন – আপনি কি শুনেননি, তারা কী বলল?'

রাসুল এ জবাবে বললেন – 'তুমি কি শুনোনি আমি ?আমি কী বললাম ,তাদের কথার উত্তর দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার এ কথা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের কথা গৃহীত হয়নি।

[সহি বুখারি: ২৯৩৫, সহি মুসলিম: ২১৬৫]

স্ত্রীদের ইবাদত ও নফল আদায়ের শিক্ষা দিতেন

উম্মে সালামা বলেন –

“একরাতে রাসুল ভীত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। বললেন, "পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহ তাআলার। কত পুণ্যভান্ডার তিনি নাজিল করলেন। নাজিল করলেন কত ফিতনা। কে অন্তঃপুরবাসিনীদের জাগিয়ে দেবে নামাজ পড়ার জন্য? দুনিয়ার কত বস্ত্রাবৃতা আখিরাতে হয়ে বিবস্ত্র থাকবে।

"রাসুল যখন জানলেন, একদিনেই অগণিত পুণ্যের ধারা ও ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার কথা, তিনি ভীত ও বিস্মিত হলেন। এই অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আশ্চর্য হলেন এ বিষয়ে মানুষের অমনোযোগিতা দেখে। পুণ্যের আধিক্য দেখে তাদের ইবাদতে মনোযোগী হওয়া উচিত; আর ফিতনার প্রাচুর্য দেখে তাদের ভীত হওয়া উচিত। তাই তিনি নামাজ আদায়ের জন্য স্ত্রীদের জাগানোর আদেশ দিলেন।’’

[সহি বুখারি: ৭০৬৯]

এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, পুরুসষদের উচিত ঘরের নারীদের জাগিয়ে দেয়া নামাজ আদায়ের জন্য।

স্ত্রীদের ইখলাসের শিক্ষা দিতেন

আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত –

'রাসুল যখন ইতিকাফের ইচ্ছে করতেন, ফজরের নামাজ পড়ে সে স্থানে আসতেন, যেখানে তিনি ইতিকাফের জন্য অবস্থান করবেন। একবার রমাজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ইচ্ছে করলেন তিনি। আদেশ করলেন তাঁবু খাটাবার।‘

আয়িশা রা. ও ইতিকাফ করার অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছে। রাসুল- সাঃঅনুমতি দিলে তার জন্যও তাঁবু খাটানো হলো। ইতিকাফের কথা হাফসা (রা) এর কানে এল। তিনিও তৈরি করলেন একটি তাঁবু। জাইনাব- (রা) শুনে তিনিও বসালেন আরেকটি তাঁবু।

সকালবেলা তিনি দেখলেন" ,দুটোর জায়গায় চারটি তাঁবু। জানতে চাইলেন ,এগুলো কী "?

উম্মুল মুমিনদের তাঁবু খাটানোর কথা জানানো হলো তাঁকে। শুনে তিনি বললেন" ,তারা কি সাওয়াবের আশায় এরূপ করেছে"?

অন্য বর্ণনায় এসেছে" ,এমনটা করার কারণ কী "?নেক নিয়ত ?

এরপর রাসুল সাঃ তাঁবুগুলো তুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। বললেন" ,এগুলো তুলে ফেলো। এগুলো আমি দেখতে চাই না।"

রাসূল সাঃ এর আদেশমতো তাঁবুগুলো তুলে ফেলা হলো। রমাজানে আর তিনি ইতিকাফ করেননি। শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করে নেন।

[সহি বুখারি: ২০০৩, সহি মুসলিম: ১১৭৪]

স্ত্রীদের এ প্রতিযোগিতা ইখলাসের ওপর ভিত্তি করে নয় বলে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তাঁর আশপাশে থাকা বা তাঁকে নিয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্ত্রীরা তাঁবু খাটিয়েছে। তাই তাঁবু উঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি।

স্ত্রীদের উপকারী যিকির শিখাতেন

জুয়াইরিয়া রাঃ বলেন –

"ফজরের সময় রাসুল তার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর চাশতের সময় ফিরে এসে দেখলেন, তিনি বসে আছেন নামাজের জায়গায়।

রাসুল বললেন –

"তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তুমি এভাবেই বসে আছ?"

জুয়াইরিয়া বললেন, "হ্যাঁ।" এরপর রাসুল বললেন, "তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার করে বলেছি। যদি আমার সে জিকির আজকের দিনে তোমার পঠিত জিকিরের সাথে ওজন দেওয়া হয়, তবে এ কালিমা চারটির জিকিরের সমান হবে।

জিকির টি হচ্ছে-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

"আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি-তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ অগণিত অসংখ্য"

[সহি মুসলিম: ২৭২৬]

রমাদ্বনের শেষ দশ রাতে কিয়ামুল লাইল ও অন্যান্য

ইবাদতের জন্য স্ত্রীদের জাগিয়ে দিতেন

আয়িশা বলেন –

"রমাদ্বনের শেষ দশক এলে বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন রাসুল। রাত জেগে নিজে ইবাদত করতেন। স্ত্রীদেরও জাগিয়ে দিতেন।"

[সহি বুখারি: ২০২৪, সহি মুসলিম: ১১৭৪]

আলি বলেছেন –

"রমাজান মাসের শেষ দশকে রাসুল তাঁর স্ত্রীদের জাগিয়ে তুলতেন ইবাদত করার জন্য।"

[সুনানে তিরমীজী: ৭২৫]

ইবনে হাজার বলেন,

"রমাজানের শেষ দশকে রাসুল তাঁর স্ত্রীদের জাগিয়ে দিতেন কিয়ামুল লাইল, জিকির ও দোয়া করার জন্য। আর সারা বছর বিশেষ করে বিতরের জন্য জাগিয়ে তুলতেন। কারণ, বিতর ধারাবাহিক ও অবশ্যপালনীয় বিধানগুলোর একটি।"

[ফাতহুল বারি: ৬/২৫১]

সারা বছর স্ত্রীদের বিতরের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার কথা বর্ণনা করে, আয়িশা বলেন –

"রাসুল রাতের একটা সময়ব্যাপী নামাজ পড়তেন। যখন তিনি বিতর আদায় করতেন, তখন বলতেন, "ওঠো। বিতর আদায় করো, আয়িশা।"

[সহি বুখারি: ৫১২, সহি মুসলিম: ৭৪৪]

স্ত্রীদেরকে অনিষ্ট হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিতেন

সহীহ হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন –

“এক রাতে আকাশে চাঁদ ঝলমল করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বললেন –

এই জিনিসের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও: هٰذَاالغَاسِقُإِذَاوَقَبَ

"এটিই অন্ধকার রাতকে সমাগতকারী

[তিরমিযী: ৩২৮৮]

চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেলায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উজ্জ্বল থাকে না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্তির অর্থ হচ্ছে এর অর্থাৎ চাঁদের আগমনের সময় অর্থাৎ, রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।

[ইবন কাসীর]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখে। যতক্ষণ রাতের আধার খতম না হয়ে যায়।”

[সহি বুখারী: ৩২৮০, ৩৩১৬, মুসলিম: ২০১২]

এ হাদিসে স্ত্রীকে শেখানোর ক্ষেত্রে রাসুল কতটা গুরুত্ব দিতেন, তার চিত্র উঠে এসেছে। রাসুল সাঃ প্রথমে আয়িশা রাঃ এর হাত ধরলেন। এরপর উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে করণীয় - কারণ বললেন।

ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে আদেশ দিতেন

আনাস বলেন –

“একদিন, রসূল সাঃমসজিদে এসে দেখলেন, মসজিদে দুটি সারির মাঝে রশি বাঁধা। তিনি বললেন, "এ রশি কেন?" সাহাবিরা বললেন, "এটি জাইনাবের রশি। তিনি নামাজ পড়তে থাকেন। যখন অলসতা আসে বা শরীর অবসন্ন হয়, তখন এর সাহায্য নেন।"

রাসুল বললেন –

"এ রশি খুলে ফেলো। তোমরা যতক্ষণ শরীরে উদ্যম অনুভব করবে, ততক্ষণ নামাজ পড়বে। যখন শরীর ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন বসে পড়বে।“

[সহি বুখারি: ১১৫০]

ইমাম নববি বলেন –

'এ হাদিস থেকে প্রমাণিত, ইবাদতে মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। ইবাদত করতে হবে উদ্যম ও প্রাণবন্ততার সাথে। কিন্তু ইবাদত করতে করতে যখন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন আরাম করতে হবে যতক্ষণ না অবসন্নতা কেটে যায়।‘

[ইমাম নববি, সহি মুসলিম: ৬/৭৩]

আমল কম হলেও নিয়মিত আদায় করার উৎসাহ দিতেন

আয়িশা রাঃ বলেন –

“রাসুল সাঃ বলেছেন- "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে নিয়মিত কৃত আমল; যদিও তা কম হয়।”

কাসিম বিন মুহাম্মাদ বলেন –

“আয়িশা রাঃ কোনো আমল করলে সে আমলটা অবধারিত করে নিতেন নিজের জন্য।“

[সহি বুখারি: ৬৪৬৫, সহি মুসলিম: ৭৮৩]

ইবনুল জাওজি বলেন, 'দুই কারণে নিয়মিত আমল পছন্দনীয় :

এক. কোনো আমল ছেড়ে দেওয়া সে আমল থেকে বিমুখ হওয়ার মতো।

দুই. কোনো আমল নিয়মিত করা মনিবের সেবায় প্রতিটি সময় লেগে থাকার মতো। এক লোক মনিবের সেবার উদ্দেশ্যে দরোজার পাশে দিনের একটি অংশ দাঁড়িয়ে থাকল। দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি মনিবের সেবার উদ্দেশ্যে দরোজার পাশে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকল।

এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিই উত্তম প্রথম ব্যক্তির তুলনায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির সাদৃশ্য নিয়মিত আমলকারীর সাথে।

[ফাতহুল বারি: ১/১০৩]

সহজে আদায়যোগ্য উত্তম ইবাদতের নির্দেশনা দিতেন

আয়িশা রাঃ বলেন –

আমার প্রবল ইচ্ছে ছিল বাইতুল্লাহর ভেতরে গিয়ে নামাজ পড়ব। একদিন রাসুল আমার হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। হিজরে নিয়ে দাঁড় করালেন আমাকে। বললেন –

"যখন বাইতুল্লাহয় নামাজ পড়ার ইচ্ছে জাগবে, তখন হিজরে নামাজ পড়ে নেবে। কারণ, এটি বাইতুল্লাহরই অংশ।“

[তিরমিজি: ৮০২, নাসায়ি: ২৯১২]

ইবাদতে নিজের উপর অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন

আয়িশা হতে বর্ণিত –

“সারা রাত নির্ঘুম ইবাদতের কথা শুনে অপছন্দ করলেন, 'হাওলা বিনতে তুয়াইত নামের এক নারী এলেন আয়িশা-এর কাছে। তখন রাসুল আয়িশার ঘরে। তিনি রাসুল-কে জানালেন, "এ হাওলা। লোকেরা ধারণা করে সে রাতে ঘুমায় না। পুরো রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেয়।"

এ শুনে রাসুল সাঃ বললেন, "সে রাতেও ঘুমায় না?। তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী ইবাদত করো। আল্লাহর কসম, তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত হবে না, ততক্ষণ আল্লাহ সাওয়াব দিতে থাকবেন।"

'সে রাতেও ঘুমায় না?'- এই প্রশ্ন থেকে বোঝা গেল, এ রকম সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেওয়া তাঁর পছন্দ নয়। এটি ইবাদতে বাড়াবাড়ির নামান্তর।

[সহিহুল বুখারি: ৪৩, সহিহু মুসলিম: ৭৮৫]

বেশি বেশি সদাকা ও কল্যাণের পথে ব্যায় করার প্রতি স্ত্রীদের উৎসাহিত করতেন

আয়িশা বলেন, 'রাসুল তাকে বলেছেন –

"আয়িশা, এক ফালি খেজুর সাদাকা করে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা, এক ফালি খেজুরও ক্ষুধার্তের তৃপ্তির কারণ হয়।“

এক ফালি খেজুর বলে এখানে খুব অল্প জিনিস বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ হলেও সাদাকা করো।

রাসুলুল্লাহ আয়িশা -কে সাদাকা ও নেক আমলের মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করতে বলেছেন। যদিও সেই সাদাকা ও নেক

[মুসনাদে আহমাদ: ২৩৯৮০]

আমলের পরিমাণ খুবই অল্প হয়। সামান্য সাদাকাও মানুষকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে ফেলে।

আয়িশা আরও বলেন –

“এক ফকির আমার কাছে এল। তখন আমার ঘরে রাসুল ছিলেন। তাকে কিছু দেওয়ার জন্য (খাদিমাকে) আদেশ দিলাম আমি। এরপর সাদাকার বস্তুটা নিয়ে আসার জন্য বললাম। সেটার প্রতি তাকালাম। তখন রাসুল বললেন, "তুমি কি চাও না যে তোমার অগোচরে ঘরে কোনো কিছু প্রবেশ করুক বা বের হোক?" আমি বললাম, "হাঁ।

‘রাসুল বললেন, "যেতে দাও, আয়িশা, হিসেব কোরো না, তুমি হিসেব করলে আল্লাহও তোমায় হিসেব করে দেবেন’

ইবনে হাজার বলেন, 'হিসেব করে দেওয়ার অর্থ-কোনো কিছুর নির্দিষ্ট ওজন বা সংখ্যা জানা। আর অনেকে সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সাদাকা করে না। সাদাকা না করার এ মনোবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়েছে এ হাদিসে। এমন মনোবৃত্তি সম্পদ থেকে বরকত রহিত হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা, আল্লাহ তাআলা দানের প্রতিদানে অনেক সাওয়াব দিয়ে থাকেন। তাই যে ব্যক্তি অগণিত পুরস্কার পেতে চায়, সে যেন দানের সময় হিসেবি না হয়, কৃপণতা না করে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলা অগণিত রিজিক দিতে পারেন, তার ওপর কর্তব্য হচ্ছে, বিনা হিসেবে দান করা।

[ফাতহুল বারি: ৩/৩০০]

'পরিবারের লোকেরা যখন ছাগল জবাই করতেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন – "সাদাকা দেওয়ার পর কতটুকু আর বাকি আছে?" আয়িশা বললেন, "কাঁধের গোশতটুকু।" রাসুল বললেন, "তবে তো কাঁধের গোশত ছাড়া আর সবটাই অক্ষত আছে (সাদাকা দিয়ে)।"

[সুনানু তিরমিজি: ২৩৯৪]

'অর্থাৎ তোমার কাছে কাঁধের যে গোশতটুকু আছে, সেটা অক্ষত নেই। বরং সাদাকা যা দিয়েছ, তা অক্ষত আছে। রাসুল-এর এ কথা এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করে,

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে; আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা টিকে থাকবে।"

[সুরা আন-নাহল: ১৬: ৯৬]

স্ত্রীদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সাদাকা করবে, সে সবার আগে রাসুল-এর সঙ্গে মিলিত হবে

আয়িশা রাঃ বলেন থেকে বর্ণিত – রাসুল সাঃ একবার বললেন,

"তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা, সে-ই মৃত্যুর পর আমার সাথে সবার আগে মিলিত হবে।" আয়িশা রাঃ বলেন, 'রাসুল-এর কথা শুনে আমরা নিজেদের হাত মাপ দিতে থাকলাম। সবার মাঝে সাওদার হাতই লম্বা ছিল। কিন্তু রাসুল-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে প্রথম জাইনাবই যায়। আসলে আমাদের মাঝে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারী ছিল জাইনাব। জাইনাব হাতে কাজ করত এবং সাদাকা করত।"

[সহিহুল বুখারি: ১৪২০, সহিহ মুসলিম: ২৪৫২]

এই হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে, রাসুল সাঃ -এর কথা শুনে উম্মুল মুমিনিনদের ধারণা হলো বাহ্যিকভাবে হাত লম্বা হওয়ার কথাই তিনি বলেছেন। তাই তারা বাঁশের কাঠি নিয়ে তাদের হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, সবার মাঝে সাওদা -এর হাত বেশি লম্বা। অন্যদিকে জাইনাব কল্যাণের কাজ ও সাদাকার দিক থেকে সবার চেয়ে বেশি অগ্রসর ছিলেন। জাইনাব-ই রাসুল-এর স্ত্রীদের মধ্যে সবার আগে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তারা রাসুল -এর কথার মর্মার্থ বুঝতে পারলেন যে, হাত লম্বার অর্থ সাদাকা ও উদারতায় এগিয়ে থাকা।'

[ইমাম নববি এ কৃত শারহু সহি মুসলিম: ১৬/৮]

ইবনে হাজার বলেন –

এ হাদিসে প্রমাণিত হচ্ছে, সক্ষমতা থাকাকালীন কেউ অধিক পরিমাণে দান করলে সে নবিজি-এর সাথে জান্নাতে মিলিত হবে। আর এ তো সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ চূড়া।

[ফাতহুল বারি। ৩/২৮৬]

স্ত্রীদের উদারতা ও সংযমী হওয়ার শিক্ষা দিতেন

আয়িশা রাঃ বলেন, 'রাসুল তাকে বলেছেন –

"আয়িশা, দয়ার্দ্র হও। আল্লাহ কোনো পরিবারের ভালো চাইলে তাদের দয়ার পথ দেখান।

[মুসনাদে আহমাদ: ২৩৯০৬]

জ্ঞান ছাড়াই কোনো কথা বলতে নিষেধ করতেন

রাসুল তাঁর স্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন-যা জানো না, তা নিয়ে মুখ খুলো না। না, জেনে তড়িঘড়ি করে কোনো ফতোয়া দিতে বা বিধান বর্ণনা করতে তিনি নিষেধ করতেন। তাদের এ আদর্শের ওপর দৃঢ় করেছেন যে, জানার পরই কেবল বিধান বর্ণনা করা যাবে; এর আগে নয়।

আয়িশা বলেন –

“একদিন রাসুল সাঃ -কে এক আনসারি শিশুর জানাজায় ডাকা হলো। আমি রাসুল-এর উদ্দেশে বললাম, "আল্লাহর রাসুল, তার কোনো গুনাহ নাই। পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত সে। তাই জান্নাতের এ চড়ুইয়ের জন্য সুসংবাদ।"

আমার কথা শুনে রাসুল বললেন, "অন্যটাও হতে পারে, আয়িশা, আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের জন্য। তাদের গন্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারা যখন তাদের পিতার ঔরসে। আবার জাহান্নামবাসীদের সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য। তারা যখন তাদের পিতার ঔরসে থাকে, তখনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তাদের গন্তব্য।

[সহি মুসলিম: ২৬৬২]

ইমাম নববি রাঃ বলেন –

'আলিমদের ইজমা হচ্ছে, মুসলিম শিশু মৃত্যুবরণ করলে, সে জান্নাতবাসী। কারণ, শরিয়তের বিধিনিষেধ পালন করা তার জন্য আবশ্যক হয়নি। আলিমগণ আয়িশা বর্ণিত এ হাদিসের ব্যাপারে বলেন, আয়িশা চটজলদি অকাট্য দলিল ছাড়াই কথাটা বলে ফেলেছেন। তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে রাসুল কথাটি বলেছেন।

[ইমাম নববি এ কৃত শারহু সহি মুসলিম: ১৬/২০৭]

স্ত্রীদের নেক কাজ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দিতেন

আয়িশা রাঃ বলেন –

পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পরের ঘটনা। আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি বললাম, "যতক্ষণ আমাকে নবিজি অনুমতি না দেন-আমি অনুমতি দেবো না।" কেননা, আফলাহর ভাই আবুল কুআইস আমাকে দুধ পান করায়নি। আমাকে দুধ পান করিয়েছিল আবুল কুআইসের স্ত্রী।

নবিজি সাঃ আমার কাছে আসলে তাঁকে বললাম –

"আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আপনার কাছ থেকে না জেনে আমি অনুমতি দিইনি।" নবিজি বললেন, "তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে বাধা কোথায়?"

আমি বললাম –

"আবুল কুআইস তো আমাকে দুধ পান করায়নি। আমাকে দুধ পান করিয়েছিল তার স্ত্রী।" রাসুল এবার বললেন, "তোমার হাত ধুলোয় ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দেবে, কারণ সে তোমার চাচা। "

[সহিহুল বুখারি: ৪৭৯৬, সহিহ মুসলিম: ১৪৪৫]

বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে শেখাতেন

আয়িশা বলেন –

“একবার রাসুল সাঃঅসুস্থ হলে জনৈক স্ত্রী হাবশার একটি গির্জার কথা তুলল তাঁর সামনে। এ গির্জাকে মারিয়া বলাহতো। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবিবা দুজনই হাবশায় গিয়েছিল। তারা এ গির্জার সৌন্দর্য ও গির্জায় থাকা ছবিগুলোর ব্যাপারে বলল। রাসুল তখন মাথা তুলে বললেন,"তাদের কোনো নেক লোক মৃত্যুবরণ করলে এসব লোক নেক লোকগুলোর কবরে সিজদা করে। এরপর তাদের ছবি বানিয়ে নেয়। আল্লাহর নিকটএরা সবচেয়ে মন্দ সৃষ্টি।

[সহি বুখারি: ৪২৭, সহি মুসলিম: ৫২৮]

এই হাদিসের লক্ষ্যণীয় বিষয়, রাসুল সাঃ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আলোচনায় উঠে আসা একটি মারাত্মক ভ্রান্তির অপনোদন করা থেকে বিরত থাকেননি।

বড় গুনাহর পাশাপাশি ছোট ছোট গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকার তাগিদ দিতেন

আয়িশা রাঃ বলেন –

“রাসুল আমাকে উপদেশ দেন ,“আয়িশা সেগুলোর জন্যও আল্লাহর ,তুচ্ছ গুনাহ থেকেও বিরত থাকো। কারণ , পক্ষ থেকে একজন নিযুক্ত আছে।“

[সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৪৩]

“তুচ্ছ গুনাহ’-তথা যে গুনাহ মানুষ করতে পরোয়া করে না। একজন নিযুক্তআছেতথা একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত-ফেরেশতা আছে, যে এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রগুনাহ লিখে রাখে। মানুষের কাছে গুনাহগুলো ক্ষুদ্র মনে হলেও আল্লাহর কাছে এ গুনাহগুলো গুরুতর।

[সুনানে ইবনে মাজাহ: ৮/৫৯]

ঘরে কোনো পাপ না ঘটার ব্যাপারে সজাগ থাকতেন

ঘর মন্দ কাজ ও কথা থেকে মুক্ত রাখা একজন পুরুষের ওপর অর্পিত মহা কর্তব্যগুলোর একটি।

আল্লাহ তাআলা বলেন –

يَاأَيُّهَاالَّذِينَاَمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْوَ أَهْلِيكُمْنَارً ।

“হে মুমিনগণ পরিজনকে জাহান্নামের আগুন-তোমরা নিজেদের ও পরিবার ,থেকে রক্ষা করো।“

[সুরা আত৬ : ৬৬ :তাহরিম-]

আয়িশা রাঃ বলেন –

"একদিন রাসুল সাঃ আমার ঘরে এসে দেখলেন আমার ঘরে ছবি আঁকা একটি পর্দা। এ দেখে তাঁর চেহারা , বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি পর্দাটা ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন –

‘"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হবে তাদের, যারা এসব ছবি আঁকে।"

[সহি বুখারি: ৬১০৯]

মানুষকে তুচ্ছ করে কিছু বলার ব্যাপারে সতর্ক করতেন

আয়িশা বলেন –

আয়িশা বলেন, 'রাসুল-এর সামনে এক লোক নিয়ে ব্যঙ্গ করলাম আমি। তিনি তখন বললেন, "যদি দুনিয়ার এত এত সম্পদ আমাকে দেওয়া হতো, তবুও আমি কোনো মানুষের ব্যঙ্গ করা পছন্দ করতাম না।" "অর্থাৎ কাউকে ব্যঙ্গ করে তার কথা বা কাজ নকল করতে কখনোই আমি সন্তুষ্ট হতাম না; যদিও আমাকে দুনিয়ার অঢেল সম্পদ দেওয়ার প্রস্তাব আসত।"

[আওনুল মাওদুদ: ১৩/১৫১]

ইমাম নববি বলেন –

“ল্যাংড়িয়ে চলা বা মাথা কাত করে অথবা অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গি করে ব্যঙ্গ করা হারাম গিবতের অন্তর্ভুক্ত।“

[তুফাতুল আহওয়াজি: ৭/১৭৬]

রাসুল সাঃ কথা ও কাজ উভয় মাধ্যম ব্যবহার করে তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন।

কোনো বিষয়ের মাসআলা বুঝার জন্য স্ত্রীগণ বারবার জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট হয়ে নিতেন

ইবনে আবি মুলাইকা বলেন,

'আয়িশা রাসুল সাঃ -এর কোনো কথা না বুঝলে বারবার জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতেন। একবার নবিজি বললেন, "যে হিসাবের সম্মুখীন হলো, তাকে শাস্তি পেতে হবেই হবে।"

আয়িশা বলেন,

"তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি বলেননি ?

" - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

"হিসাব সহজভাবেই নেওয়া হবে।"

[সুরা আল-ইনশিকাক, ৮৭ : ৮]

উত্তরে রাসুল বললেন, "এটা তো কেবল প্রকাশ করা। কিন্তু পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে যার হিসেব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হবে।"

[সহি বুখারি: ১০৩, সহি মুসলিম:

স্ত্রীদের ব্যাপারে নবীজি গায়রতের অধিকারী ছিলেন

আয়িশা রাঃ বলেন –

"রাসুল এ-র স্ত্রীদের কাছে একজন মুখান্নাস -মেয়েলি পুরুষ আসত। সবাই তাকে পুরুষত্বহীন মনে করত। একদিন নবিজি ঘরেই ছিলেন । মুখান্নাসটি তখন রাসুল এর কোনো স্ত্রীর ঘরে-- উম্মে সালামা এর ভাই- আব্দুল্লাহ ইবনে আবিউমাইয়া –কে, এক মহিলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলল –

''কেননা, সেএতই কমনীয় যে, যদি সে সম্মুখপানে আসে, তবে তার পেটেরসামনের দিকে চার ভাঁজ পড়ে। আর পেছন ফিরে গেলে আট ভাঁজ পড়ে।"

এমন কথা শুনে নবিজি বললেন –

"এ তো বেশ বর্ণনা দিতে পারে। তোমরা একে তোমাদের কাছে আর আসতে দেবে না।"

এরপর থেকে তার সাথে পর্দা করা হতো।

[সুনানে ইবনি মাজাহ: ৪২৪৩]

নবিজি ছিলেন গায়রতের অধিকারী। ছিলেন নিজ স্ত্রী-কন্যাদের ব্যাপারে প্রবল আত্মসম্মানের অধিকারী।

নবীজি স্ত্রীদের ব্যাপারে সুধারণা রাখতেন

আনাস বলেন –

“রাসুল সফর থেকে ফিরে রাতের বেলা কখনো তাঁর স্ত্রীর কাছে আসতেন না। তিনি সকাল বা গোধূলি বেলায় ঘরে আসতেন।

[সহি বুখারি: ১৮০০ মুসলিম: ১৯২৮]

রাসুল সাঃ সাহাবিদেরও নিষেধ করতেন যেন তারা রাতের বেলা ঘরে না আসে। ,

জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন –

রাসুল নিষেধ করেছেন, কেউ যেন স্ত্রীরবিশ্বাসঘাতকতা যাচাই বা তার পদস্খলন যাচাইয়ের জন্য সফর থেকে ফিরে রাতের বেলা নিজ পরিবারের কাছে না আসে।“

[সহি বুখারি: ১৮০১, মুসলিম: ৭১৫]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন –

রাসুল বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন রাতের বেলা সফর থেকে ফিরে আসে, তখন যেন সে স্ত্রীর নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত না আসে, যতক্ষণ স্ত্রী তার প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকর্ম করতে পারে এবংএলোকেশী নারী তার চুল চিরুনি করে নিতে পারে।

[সহি বুখারি : ৫২৪৬]

অন্যদিকে, স্ত্রীকে যে স্বামী আগমনের সময়ের ব্যাপারে জানিয়ে দেবে, সে স্বামীর ক্ষেত্রে রাতের আগমনের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

[ফাতহুল বারি: ৯/৩৪০]

‘এ হুকুম তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা দীর্ঘদিন ঘর থেকে দূরে সফরে ছিল। কারণ, অন্যবর্ণনায় এসেছে, রাসুল বলেছেন, ‘যখন তোমরা দীর্ঘ দিন সফরে থেকে বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকো, রাতের বেলা সফর থেকে ফিরে আসলে রাতেই ঘরে প্রবেশ করবেনা। দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ধারণা থাকবে না স্বামী কখন আসে। তাই এ সময়টাতে হয়তো স্ত্রী অপরিষ্কারঅপরিচ্ছন্ন থাক-বে, স্বামীকে স্বাগত জানানোরমতোপ্রস্তুতিতার থাকবে না। অথচ স্ত্রীর কাছে স্বামীর চাওয়া থাকে, স্বামীর জন্য স্ত্রী সেজেগুজে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের সফর শেষে স্বামী হঠাৎ এসে যদি স্ত্রীকে এলোমেলো অগোচালোদেখে তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের মাঝে ঘৃণার উন্মেষ ঘটার আশঙ্কা-থাকে।

স্ত্রীদের ঈর্ষার বিষয়গুলো বিচক্ষণতার সাথে সামাল দিতেন

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসার টান থাকে। এর উপর নির্ভরশীল হয় স্ত্রীদের ঈর্ষাপরায়ণতা। স্ত্রী জাতির মধ্যে এ স্বভাবটি বিদ্যমান। এ স্বভাব দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। ঈর্ষাপরায়ণতা নারীদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। রাসুল-এর স্ত্রীগণও এর চেয়ে ভিন্ন ছিলেন না।

আয়িশা বলেন –

“এক রাতের কথা। সে রাত আমার পালা ছিল। রাসুল আমার কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি বের হয়ে কোথাও গেলেন। আমার তখন ঈর্ষা এসে গেল।

এরপর রাসুল এসে আমার অবস্থা দেখে বললেন –

“আয়িশা, তোমার কী হয়েছে? তুমি কী ঈর্ষা করছ?” আমি তখন বললাম, “আমার মতো এক নারী কেন আপনার মতো এক পুরুষকে নিয়ে ঈর্ষাপরায়ণ হবে না?”রাসুল বললেন, “তোমার কাছে কি তোমার শয়তান এসেছে?”

আমি বললাম, “আল্লাহররাসুল, আমার সাথে কি শয়তান আছে?”রাসুল জবাব দিলেন, “হাঁ।“ আমি আবার জানতে চাইলাম, “সকল মানুষের সাথেই কি শয়তান থাকে?”রাসুল জবাব দিলেন, “হাঁ।“ এবার আমি বললাম, “আপনার সাথেও, হে আল্লাহররাসুল?”

তিনি জবাব দিলেন, “হাঁ। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাই সে মুসলিম হয়ে গেছে।

[সহিহ মুসলিম: ২৮১৫]

আয়িশা রাঃ বলেন –

"যখন আমার পালা আসত, রাসুল যে রাত আমার কাছে থাকতেন, সে রাতে তিনি ঘরে এসে চাদর খুলে রাখতেন। জুতো খুলে পায়ের কাছে রাখতেন। লুঙ্গির এক প্রান্ত বিছিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না আমি ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর চুপিচুপি চাদর নিতেন, জুতো পরে ধীরে ধীরেদরোজা খুলে বেরিয়ে যেতেন, এরপর চুপ চাপ দরোজা লাগিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। কিছু সময় বাইরে থাকতেন।"

এমন এক রাতে আমি আমার জামায় মাথা ঢেকে, উড়না পরে, কোমরবন্ধ পরে বের হয়ে পড়লাম তাঁর পিছুপিছু। দেখলাম, যেতে যেতে তিনি জান্নাতুল বাকিতে পৌছে গেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। এরপর তিনবার হাত তুলে দোয়া করলেন। তারপর তিনি ফিরতি পথ ধরলে আমিও ফিরতি ঈর্ষার বাকি অংশ - পথে চলতে লাগলাম। তিনি দ্রুত হাঁটলে আমিও দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। তিনি আরও দ্রুত হাঁটলে আমিও আরও দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। তিনি দৌড়ে এলে আমি দৌড়ে এলাম। এভাবে আমি তাঁর আগে আগেই ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

তিনি ঘরে এলেন। বললেন, "হে আয়িশ, তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?" আমি বললাম, "না, কিছু না।" তিনি বললেন, "তুমি বলো না হলে আল্লাহ তো আমাকে বলে দেবেনই।" "আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক।" বলে আমি সবকিছু তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, "তাহলে আমার সামনের কালো ছায়াটি তুমিই ছিলে?" আমি বললাম, "হাঁ।" এরপর রাসুল আমার বুকে জোরে আঘাত করলেন। আমি ব্যথা পেলাম।

তিনি বললেন, "তুমি কি ধারণা করেছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমার ওপর অবিচার করবেন?" যখন তুমি দেখলে আমি বের হয়েছি, তখন জিবরিল আমার কাছে এসে ডাক দিলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। বিষয়টা তোমার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে, তাই আমিও তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি যেহেতু কাপড়ে নিজেকে ঢেকে নিয়েছিলে, তাই তিনি তোমার কাছে আসেননি। আমিও ধারণা করেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমাকে জাগানো ঠিক মনে করিনি। আশঙ্কা করেছিলাম, তুমি ভয় পাবে।

জিবরিল আঃ বললেন –

"আপনার প্রভু আপনাকে আদেশ করেছেন বাকি-এর অধিবাসীদের কাছে যাওয়ার জন্য। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য।" আয়িশা জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর রাসুল, আমি তাদের জন্য কী বলে দোয়া করব?"

রাসুল বললেন –

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

"এ জায়গার অধিবাসী মুমিন-মুসলমানের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্যে অগ্রগমনকারী ও পশ্চাদ্গমনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন। আর আমরাও আল্লাহ চাহে তো অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব।"

[সহি মুসলিম: ৯৭৪]

আয়িশা রাঃ যদিও রাসুল-এর সমুন্নত মনের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন না কখনো। তবুও রাসুল সাঃ -এর অন্য স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন তিনি। জীবিত স্ত্রীরা তো বটেই, তাঁর মৃত স্ত্রী খাদিজার প্রতিও তিনি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন।

যেমনটি তিনি বলেছেন- 'খাদিজাকে যতটা আমি ঈর্ষা করেছি, অন্য কারও প্রতি আমার এত ঈর্ষা জাগেনি"।

রাসুল সাঃ স্ত্রীদের এমন ঈর্ষার জবাব দিতেন কখনো মুচকি হেসে, কখনো নরম ভাষায় জবাব দিয়ে, কিন্তু যখন বিষয়টি পরিব্যাপ্তিতে বেশি হতো, তখন কখনো তিরস্কার করতেন।

[সহি বুখারি: ৩৮১৬]

স্ত্রীরা পরস্পরের ব্যাপারে অনুচিত শব্দ ব্যবহার করলে শুধরে দিতেন

আয়িশা রা: বলেন –

“একবার আমি নবিজি সাঃ - কে বললাম, "সাফিয়া এমন এমন (খাটো), সে-ই আপনার জন্য যথেষ্ট।" নবীজি তখন জবাবে বললেন, "তুমি এমন একটি কথা বলছো, যদি এই কথাকে সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার রং পরিবর্তন হয়ে যাবে।"

অর্থাৎ 'যদিও সমুদ্রের পানি অনেক, কিন্তু তোমার এই কথাটা এতটাই সাংঘাতিক যে, সমুদ্রের পানির সাথে মিশানো হলে পানির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সে পানির রং পরিবর্তন হয়ে যাবে। সমুদ্রের পানির তুলনায় একজন মানুষের পুণ্য-আমল অনেক অনেক কম। তাই অনুপযোগী কথাটি যদি একজন মানুষের আমলের সাথে একত্রিত হয়, তবে সে আমলের কী অবস্থা হবে?'

[সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৫, সুনানে তিরমীজী: ২৫০২]

স্ত্রীদের পরস্পরের কাছ থেকে সমান বদলা নেয়ার অনুমতি দিতেন

স্ত্রীদের পরস্পরের কাছ থেকে সমান বদলা নেওয়ার অনুমতি দিতেন আয়িশা রা: বলেন, 'নবিজি-এর স্ত্রীগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন - এক দলে ছিলেন আয়িশা, হাফসা, সাফিয়্যা, সাওদা। অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালামা ও অন্য স্ত্রীগণ। আয়িশা-এর প্রতি রাসুল-এর অধিক ভালোবাসার কথা জানতেন সাহাবিরা। তাই যদি কেউ রাসুল-কে হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছে করতেন, তবে আয়িশার পালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। রাসুল যেদিন আয়িশার ঘরে থাকতেন, সেদিন গিয়ে হাদিয়া দিয়ে আসতেন।

উম্মে সালামা ও তাঁর দলে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠলো। তারা বলল- "তুমি রাসুল সাঃ এর সাথে কথা বলে দেখো, তিনি যেন মানুষদেরকে জানিয়ে দেন, কেউ রাসুল সাঃ-কে হাদিয়া দিতে চাইলে রাসুল সাঃ যে স্ত্রীর ঘরেই থাকুক না কেনো, সে যেন সে ঘরেই হাদিয়া নিয়ে আসে।"

পরামর্শ অনুযায়ী উম্মে সালামা রাসুল-এর সামনে এ বিষয়টি তুললেন, কিন্তু নবীজি সাঃ এই ব্যাপারে কিছুই বলেন না। এদিকে দলের বাকি সদস্যরা এসে জিজ্ঞেস করল উম্মে সালামাকে, তিনি বললেন –

"রাসুল সাঃ তো আমাকে কিছুই উত্তর দেন নি।" তারা আবারও বলল, "তুমি রাসুল-এর সাথে আবার কথা বলে দেখো।"

যেদিন উম্মে সালামার ঘরে নবীজি সাঃ গেলেন, তিনি আবারও বিষয়টা তুললেন। এবারও রাসুল কোনো উত্তর দিলেন না। দলের বাকিরা আবারও জিজ্ঞেস করলে তিনি আগের মতোই বললেন, “না, নবীজি সাঃ এবারও আমাকে কোনো কিছুই জবাব দেননি।”
বাকিরা বললেন, "রাসুল সাঃ কিছু বলা পর্যন্ত তুমি বলতেই থাকো।"

এরপর যেদিন উম্মে সালামার পালা এল, রাসুল তার ঘরে এলে তিনি কথাটা তুললেন আবার। এবার রাসুল সাঃ বললেন –

"আয়িশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা, আয়িশা ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীর চাদরে থাকা অবস্থায় আমার প্রতি ওহি নাজিল হয়নি।"

উম্মে সালামা বললেন –

"আপনাকে কষ্ট দেওয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি।"

আয়েশা রাঃ বলেন- এরপর তারা রাসুল সাঃ এর কন্যা ফাতিমা রা:-কে ডাকল এবং ফাতিমা এসে রাসুল-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি আমার সাথে এক চাদরে শুয়ে ছিলেন।

ফাতিমা রা: বললেন-

"আল্লাহর রাসুল, আপনার স্ত্রীরা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আমি আবু বকরের মেয়ের ব্যাপারে ইনসাফের কথা বলি।"

রাসুল উত্তর দিলেন-

"মেয়ে আমার, তুমি কি তা-ই ভালোবাসো না, যা আমি ভালোবাসি?" ফাতিমা উত্তর দিলেন, "অবশ্যই।" রাসুল বললেন, "তবে তুমিও আয়িশাকে ভালোবাসো।" রাসুল এ-এর কথা শুনে ফাতিমা উঠে গেলেন। ফিরে গেলেন রাসুল সাঃ -এর স্ত্রীদের কাছে এবং তাদেরকে জানালেন তার কথা ও রাসুল সাঃ -এর কথা। তারা বলল, "তুমি আমাদের কোনো উপকার করতে পারলে না। রাসুল-এর কাছে আবার যাও।"

তাদের কথা শুনে ফাতিমা বললেন –

"আল্লাহর কসম, আয়িশার ব্যাপারে রাসুল-এর সাথে কখনো আমি কথা বলতে যাব না।"

এরপর তারা জাইনাব বিনতে জাহাশ রাঃ এর কাছে গেলেন এবং তাকে নবীজি সাঃ এর কাছে পাঠালেন। রাসুল সাঃ -এর স্ত্রীদের মধ্যে জাইনাবই তাঁর কাছে আমার মতোই সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। আমি জাইনাবের মতো উত্তম দ্বীনদার, মুত্তাকি, সত্যভাষী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, অধিক সাদাকাকারী, যে কাজ করে তিনি সাদাকা করতেন সে কাজে আত্মনিবেদনকারী, আল্লাহর নৈকট্য তালাশকারী কোনো নারী দেখিনি। কিন্তু তার মাঝে কেবল একটি দুর্বলতা ছিল, তিনি খুব দ্রুত রেগে যেতেন, তবে দ্রুতই আবার ঠান্ডা হয়ে যেতেন।

এরপর জাইনাব রাঃ এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসুল সাঃ তখন আয়িশার সাথে একই চাদরে শোয়া আগের মতো। জাইনাব রাঃ বললেন –

"আল্লাহর রাসুল, আপনার স্ত্রীরা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। যেন আপনার কাছে আবু বকরের মেয়ের ব্যাপারটিতে ইনসাফের আবেদন করি।"

আয়িশা রা: বলেন –

"এরপর জাইনাব আমাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। আমাকে কয়েক কথা শুনিয়েও দিল। আর আমি রাসুল-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন কি না। জাইনাব তখন বলেই যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি যদি জাইনাবকে কিছু বলি, তবে রাসুল তা অপছন্দ করবেন না।"

এরপর আয়িশা রাঃ জাইনাব-এর কথার উত্তর দেয়া শুরু করলেন এবং জাইনাব রা: এর মোক্ষম জবাব দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে ছাড়লেন।

আয়িশা রাঃ বলেন –

‘‘আমি যখন তাকে নিয়ে বলা শুরু করলাম, তাকে একেবারে লা-জাওয়াব করে ছাড়লাম।'

নবিজি তখন আয়িশার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন – "এই না হলো আবু বকরের মেয়ে"।

[সহিহুল বুখারি: ২৫৮১]

আয়িশা রাঃ বেশ সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এখানে। এতে বোঝা যায় যে, তিনি বেশ বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। অপরপক্ষ যখন বলেই যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ধৈর্য ধরে শুনতে থাকলেন, যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ সীমাতিরিক্ত না করেছে। এরপর তিনি শুরু করলেন পাল্টা জবাব এবং প্রতিপক্ষকে লা-জাওয়াব করে দিলেন।

ইবনে হাজার থেকে বর্ণিত –

'এ হাদিস থেকে বুঝতে পারি যে, স্বামীকে নিয়ে সতিনে সতিনে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা হতেই পারে। স্ত্রীদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনায় স্বামী চুপ থাকতে পারে কিন্ত স্বামী কারও প্রতি অন্যায়কে সমর্থন বা পশ্রয় দিতে পারে না।'

[সহি মুসলিম: ২৪৪২, ফাতহুল বারি: ৫/২০৮]

অধ্যায়-৬: বৈবাহিক জীবনে নবী - পরিবারের সমস্যা ও সমাধান

পূত-পবিত্র স্ত্রীদের নিয়ে রাসুলুল্লাহ এক অনুপম শান্তিময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। এক কথায় তাঁর দাম্পত্য জীবনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে কুরআনের এ আয়াতটিই যথার্থ, আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো"

[সুরা আন-নিসা - ৪: ১৯]

প্রতিটি পরিবারেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকেই। কোনো সংসারই সমস্যা থেকে পূর্ণ মুক্ত থাকে না। এমনকি এমন কিছু পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে নবি পরিবারেও। নবীজি সাঃ ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী। সকলের জন্য তিনি আদর্শ। সংসারে উদ্ভূত সমস্যাকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়, সে ক্ষেত্রেও তো তাঁর নির্দেশনা প্রয়োজন। তাই আল্লাহ তাআলা নবি পরিবারেও কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যাতে মানবজাতি তা শিখতে পারে, জানতে পারে এবং এ ব্যাপারে রাসুল সাঃ এর আমল কেমন ছিল; যেন সবাই জানতে পেরে সে অনুযায়ী উদ্যোগ নিয়ে নিজ পরিবারের ও সংসারের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে।

সংসারে সমস্যা থাকবে এটা কোনো গুরুতর বিষয় নয়। কিন্তু পরিস্থিতি গুরুতর হবে তখন, যখন ন্যায় ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা হবে না। যখন সমস্যার পরিমান বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাবে, তখনই ব্যাপারটা গুরুতর হবে। সংসারে উদ্ভূত সমস্যার সুষ্ঠু

সমাধান করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাঁড়িয়ে যায় একটি জীর্ণ-বিবর্ণ অভিশপ্ত দেয়াল। সম্পর্ক নষ্ট হয়। সমস্যা একসময় তালাকে গিয়ে গড়ায়। নবি-পরিবার কিছু কঠিন সময় অতিবাহিত করেছে। উদাহরণত, ইফকের ঘটনা, ভরণপোষণ চাওয়ার ঘটনা।

ইফকের ঘটনা

ইফকের ঘটনা আয়িশা রাঃ -এর জীবনে ঘটে যাওয়া বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বিশাল মুসিবতে পড়েছিলেন তিনি। পরিশেষে সাত আসমানের ওপর আয়িশা-এর পবিত্রতার ঘোষণা দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

মুমিন-জননী আয়িশা রাঃ যেভাবে আমাদের জন্য এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন –

আয়েশা রাঃ বলেছেন যে –

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নামের ব্যাপারে লটারি করতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা রা. বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরায়সীর যুদ্ধ) তিনি আমাদের মাঝে লটারি করেন। এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে বের হলাম।
তখন আমাকে হাওদাজসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি - বাড়ির দিকে ফিরলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেটে সেনাছাউনী অতিক্রম করে (একটু সামনে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরী করা আমার গলার হারটি ছিড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়'। আয়েশা রা. বলেন, 'যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আরোহণ করতাম।

তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যে আছি, কারণ খাদ্যভাবে মহিলাগণ তখন খুবই হালকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিলনা। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তখন তা হালকা হওয়ার বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাদের (সৈন্যদল) কোন আহবায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

বানু সুলামী গোত্রের থাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. (যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন) সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি প্রত্যুষে আমার অবস্থানস্থলের কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন, রাসূল সাঃ এর স্ত্রী?”- একথা বললে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম, আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি।

এরপর তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সাওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিইয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সাওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন'। আয়েশা রাঃ বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম।

এদিকে অপবাদ রটনাকরীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেরূপ স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না।

আয়েশা রাঃ বলেন –

একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জাড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, "আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন?" তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। আয়েশা রা. বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকরীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন।

আয়েশা রাঃ, বর্ণনা করেন –

এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা রাঃ বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন?

আয়েশা রাঃ বলেন –

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে?

তিনি বললেন –

"আল্লাহর কসম, সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে।“

আয়েশা রাঃ বলেন –

আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে!

আয়েশা রাঃ বর্ণনা করেন –

রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রুও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে ডেকে পাঠালেন।

আয়েশা রাঃ বলেন –

উসামা রাঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবীজীর) ভালবাসার কারণে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল) তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর আলী রা. বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাঃ, আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাকে (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী (বারীরা রা.) কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা রাঃ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা রাঃ-কে ডেকে বললেন –

“হে বারীরা তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি ? বারীরা রাঃ তাকে বললেন, সেই আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা যুবতী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা রা. বলেন, (এ কথা শুনে) সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানিনা। আর তাঁরা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার সম্বন্ধেও আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমর সাথেই আমার ঘরে যায়।

আয়েশা রাঃ বলেন –

এ কথা শুনে বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সাদ ইবনে মুআয রাঃ উঠে বললেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব"।

এ সময় হাসসান ইবনে সাবিত রাঃ -এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনে উবাদা রা. দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়েশা রাঃ বলেন, এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু (এ সময়) গোত্রীয় অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে তিনি সাদ ইবনে মুআয রা.-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যদি সে তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার হত্যা হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সাদ ইবনে

মুআয রা.-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. সাদ ইবনে উবাদা রা.-কে বললেন, বরং তুমি মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করে কথাবার্তা বলছ। আয়েশা রা. বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আয়েশা রা. বলেন –

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা রা. বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুকরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। তিনি বলেন, আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দেই। এর মাঝে আমার কোন ঘুম আসেনি। বরং অবারিত ধারায় আমার চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার ফলে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন।

এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত ছিলাম ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন।

আয়েশা রাঃ বলেন - অপবাদ রটানোর পর আমার কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী আসেনি। আয়েশা রাঃ বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুল করেন।

আয়েশা রাঃ বলেন –

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোটা অশ্রুও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কি জবাব দিব আমি তা জানিনা। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, আপনি তার জবাব দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে নিজেই বললাম,

আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের। মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম, আমি ও আপনারা যে অবস্থায় শিকার হয়েছি এর জন্য (নবী) ইউসুফ আ.-এর পিতার কথা উদাহরণ ব্যতীত আমি কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না।

তিনি বলেছিলেন –

"সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।"

এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহর ওহী নাযিল করবেন যা পঠিত হবে। আমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাফিল হতে শুরু হল। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত ঐ বাণীর গুরুভাবের কারণে, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

আয়েশা রাঃ বলেন –

রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। আয়েশা রাঃ বলেন, এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি এখন তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত আমি কারো প্রশংসা করব না।

আয়েশা রা বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হল এই –

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ .لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ .لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ

عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ .وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ . يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ .وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

"যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল, এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছ কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এটা তো সুষ্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার

কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলনা এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপনাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মুনিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।"

[সূরা নূর, ২৪: ১১-২০]

আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবু বকর সিদ্দীক রাঃ, মিসতাহ ইবনে উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা রা. সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবু বকর সিদ্দীক রাঃ কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন

আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন –

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোনা তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।

[সূরা নূর, ২৪: ২২]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক রা. বলে উঠলেন হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ রা.-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনরায় দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তাকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

আয়েশা রা. বললেন –

আমার এ বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.-কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি যায়নাব রা.-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা রা. সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার চোখ ও কানকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়েশ রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাকে আল্লাহ-ভীতির ফলে রক্ষা

করেছেন। আয়েশা রা. বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা রা. তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে অপবাদ রটনাকারীদের মত অপবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন।

বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব রহ. বলেন – ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা সম্পর্কে আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হল এই –

উরওয়ার রাঃ বলেন, আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে –

আল্লাহ কসম, যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন স্ত্রীলোকের কাপড় খুলেও কোনদিন দেখিনি। আয়েশা রাঃ বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

[সহীহ বুখারী: ৩৮৪৬]

সূরা নূর এর আলোকে ইফকের ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শার'ঈ নির্দেশনাঃ

১। মুমিনদের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও পরস্পরের প্রতি উত্তম ধারণা করার নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ। **[আয়াত নং: ৪]**

২। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আয়েশা রাঃ এর চারিত্রিক পবিত্রতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

[আয়াত নং: ১১]

৩। সংবাদ প্রচার এর পূর্বেই যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

[আয়াত নং: ১২-১৩]

৪। ভিত্তিহীন অপপ্রচার থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

[আয়াত নং: ১৭]

৫। মমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি জানিয়ে দেওয়া হয়।

[আয়াত নং: ১৯]

৬। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

[আয়াত নং: ২১]

৭। নিকট আত্মীয় স্বজনদের মন্দ আচরণ সত্বেও তাদের জন্য সাদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়।

[আয়াত নং: ২২]

৮। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকা মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাদের মর্যাদা রক্ষায় এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারীদের দুনিয়া ও পরকালে লাঞ্চনার হুমকি দেওয়া হয়।

[আয়াত নং: ২৩-২৫]

[Iom মাদ্রাসা]

স্ত্রীদের ভরনপোষণ বাড়ানোর দাবি চাওয়ার ঘটনা

ভরণপোষণ চাওয়ার ঘটনা এ ঘটনা থেকে বোঝা যাবে, আর্থিক দুরবস্থার সময় রাসুল-এর কর্মপন্থা কেমন ছিল। কেমন ছিল তাঁর আচরণ পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যখন তাঁরা অতিরিক্ত ভরণপোষণ চেয়েছিলেন।

ঘটনাটি জাবির-এর থেকে বর্ণিত –

তিনি বলেন: “আবু বকর এলেন রাসুল-এর কাছে। দেখলেন, অনেক মানুষ তাঁর দরোজায় বসে আছে। কিন্তু কাউকেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আবু বকর এগিয়ে গিয়ে অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন ভেতরে। এরপর এলেন উমর। অনুমতি চাইলেন প্রবেশের। তাকেও অনুমতি দেওয়া হলো। উমর দেখলেন, রাসুল-এর পাশে তাঁর স্ত্রীরা। রাসুল নীরব। তাঁর চেহারায় চিন্তার ছাপ।

আবু বকর বললেন –

"আমি এমন কিছু বলব, যাতে রাসুল হেসে দেন।" আবু বকর বললেন, "আল্লাহর রাসুল, আমার কাছে খোরপোশ চাইলে বিনতে খারিজার তার স্ত্রী সাথে কেমন আচরণ করি, আপনি যদি দেখতেন! এ অবস্থায় আমি তার কাছে যাই এবং তার ঘাড়ে আঘাত করি।" রাসুল সাঃ হেসে দিলেন। বললেন, "আমার পাশে যারা বসে আছে, তারাও আমার কাছে খোরপোশ চাচ্ছে।"

[ইমাম নববি এ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম: ১৭/১১৭]

রাসুল-এর কথা শুনে আবু বকর উঠে গেলেন আয়িশার দিকে। আঘাত করলেন তার ঘাড়ে। ওদিকে উমর-ও এগিয়ে গেলেন হাফসার দিকে। আঘাত করলেন তার ঘাড়ে। উভয়ে বলে উঠলেন, "তোমরা এমন কিছু রাসুল এ-এর কাছে চাইছ, যা তাঁর কাছে নেই।" রাসুল তাঁদের দুজনকে নিবৃত্ত করলেন। তখন রাসুল-এর স্ত্রী দুজন বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমরা এমন কিছু রাসুল-এর কাছে চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই।"

এরপর ত্রিশ কি উনত্রিশ দিন কেটে গেল। রাসুল স্ত্রীদের থেকে পৃথক রইলেন।

এরপর আল্লাহ নাজিল করলেন –

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবি, আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং আখিরাত কামনা করো, তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।"

[সুরা আল-আহজাব: ৩৩: ২৮]

আয়াত নাজিলের পর রাসুল প্রথমে আয়িশার নিকট আসলেন। বললেন –

"আমি তোমাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলি। তুমি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না। তোমার বিষয়ে তোমার বাবা-মার সাথে পরামর্শ করো।" আয়িশা বললেন –

“কোন বিষয়ে হে আল্লাহর রাসুল।"

রাসুল সাঃ সুরা আহজাব এর আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আয়িশা বললেন, 'আমি আপনার ব্যাপারে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করব? তার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও আখিরাতকে বেছে নেব। আমি আপনার কাছে আরেকটি আবদার রাখছি। আপনি আমার বলা কথা আপনার অন্য স্ত্রীর কাউকে বলবেন না।"

উত্তরে রাসুল সাঃ বললেন –

"তাদের যে-ই আমার কাছে জানতে চাইবে, আমি তাকে জানিয়ে দেবো তোমার কথা। কারণ আমাকে জেদি ও কঠোরতাকারীরূপে পাঠানো হয়নি। বরং আমাকে পাঠানো হয়েছে সহজপন্থায় শিক্ষাদানকারী হিসেবে।"

রাসুল-এর প্রত্যেক স্ত্রী তাঁকেই বেছে নিলেন। আয়িশা রাঃ এর যে জবাব ছিল, তাদেরও একই জবাব ছিল।

[সহি মুসলিম : ১৪৭৮]

ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

প্রথমেই রাসুল চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করলেন।তাঁর স্ত্রীগণ অতিরিক্ত ভরণপোষণ চাইলেন, কিন্তু তিনি দেবেন কি দেবেন না, তা বললেন না। অন্য কোনো কিছুও বললেন না। বরং নীরব হয়ে থাকলেন।

প্রথমে তিনি বিষয়টি উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করলেন। কারণ দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যা ঝগড়া বা তর্ক-বিতর্কে সমাধান হয় না। বরং এমন কিছু বিষয় আছে, যে বিষয়ে তর্ক করলে ঝগড়া আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় যে কর্মপন্থাটি রাসুল গ্রহণ করেছিলেন সেটি হচ্ছে, তিনি স্ত্রীদের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। তিনি স্ত্রীদের বেছে নিতে বললেন এ অবস্থায় তাঁর সাথে তারা থাকবেন, না তারা অতিরিক্ত খোরপোশ ও তাঁর থেকে পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন।

এ পার্থিব সমস্যাটি সমাধানে রাসুল সাঃ বাছাই করে নেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে দুটি অপশনের একটি বাছাই করার স্বাধীনতা দিলেন। দাম্পত্য জীবনের বিবিধ বিষয়ে পরামর্শ করার মূলনীতি দেখিয়ে দিচ্ছে এ পদ্ধতিটি।

রাসুল স্ত্রীদের ধীরতা অবলম্বন করতে বললেন, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করলেন। যেমন তিনি আয়িশা -কে বললেন, 'আমি তোমাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলি। তুমি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না।'

এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি, রাসুল স্ত্রীদের ওপর কঠোরতা করেননি। তাদের গায়ে এতটুকু আঘাতও করেননি। তাদের এতটুকু অপমানও করেননি। বরং তিনি তাদের সাথে এক মহৎ পদ্ধতিতে আচরণ করেছেন। অন্যদিকে, যখন আবু বকর ও উমর আয়িশা ও হাফসাএ-এর দিকে এগিয়ে গেলেন তাদের প্রহার করতে। রাসুল নিবৃত্ত করলেন তাদের। কারণ, মারধর করে সব সমস্যার সমাধান হয় না। বরং অনেক সময় আলাপ-আলোচনা করা, স্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাস্তবতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমেই হয় সমাধান।

নবীজির কয়েকজন স্ত্রীর কৌশলপূর্ণ ঘটনা

আয়িশা বলেন –

রাসুল মধু - মিষ্টান্ন পছন্দ করতেন। আসরের পর পর প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট আসতেন। নিকটবর্তী হতেন সবার। রাসুল সাঃ মধু পান করতেন জাইনাব বিনতে জাহাশের কাছে। আমি তখন মনে মনে বললাম- 'আমি কি একটা কৌশলের আশ্রয় নেব না।' এরপর যা চিন্তা করলাম তা হাফসার সাথে আলোচনা করলাম।

বললাম –

এরপর রাসুল সাঃ আমাদের যার কাছেই আসবে, রাসুল সাঃ-কে সে বলবে- "আপনি মাগাফির খেয়েছেন? আমি আপনার শরীর থেকে মাগাফিরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি।" রাসুল-এর শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হবে-এটা খুব অপছন্দনীয় ছিল তাঁর কাছে। রাসুল তাদের দুজনের একজনের কাছে আসলেন। সলা-পরামর্শে ঠিক করা কথাটাই রাসুল-কে বলা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, "আমি তো জাইনাবের কাছে মধু পান করেছিলাম। শপথ করছি, আর কখনো আমি তার কাছে মধু পান করব না। এ কথাটি কাউকে বলবে না তুমি।"

এরপর নাজিল হলো –

يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবি, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশির জন্য তা নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

যখন নবি তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবিকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবি এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল। যখন নবি তা তাঁর সেই স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলল, কে আপনাকে এটা অবহিত করল? নবি বলল, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ
ظَهِيرٌ

যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে, যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করো (তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নবির বিরুদ্ধে একে অপরের সহযোগিতা করো, তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তাঁর বন্ধু এবং জিবরাইল ও সৎ আমলকারী মুমিনগণও। উপরন্তু ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী।

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَا

যদি নবি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তাহলে তাঁর রব সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্যকারিণী, তাওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী।“

সুরা আত-তাহরিম, ৬৬: ১-৫

নবীজির গৃহীত পদক্ষেপ এবং তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

অতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি করার ঘটনা এবং মধুর ঘটনার পর নবীজি * স্ত্রীদের থেকে এক মাস দূরে ছিলেন।

ইবনে হাজর রাহ. বলেন –

“এর কারণ হতে পারে, নবীজি এ-সব ঘটনার কারণে বাধ্য হয়ে এক মাস দূরে ছিলেন। বিনয়, ধৈর্য, সহনশীলতা ছিল তাঁর স্বভাবের অংশ; কিন্তু স্ত্রীদের থেকে বারবার এমন আচরণের কারণে দূরে থাকাই তাঁর জন্য উত্তম করণীয় ছিল।“

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত –
তিনি উমার ইবনে খাত্তাব রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমীরুল মুমিনীন, যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। কারণ, তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে”-এই আয়াতে বর্ণিত নবীজির দুই স্ত্রী কারা? তিনি বললেন, "তোমার প্রশ্নে অবাক হলাম, ইবনে আব্বাস! এ-আয়াতে বর্ণিত দুই মহিলা হলো আয়িশা এবং হাফসা।"

এরপর উমার রাযি. পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন-

"আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনূ উমাইয়া ইবনু যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবীজির কাছে যেতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম; আমি যে-দিন যেতাম, সে-দিনের খবর (ওহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যে-দিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন। আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম।

কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনসারদের কাছে এলাম, তখন তাদেরকে এমন পেলাম যে, নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল। আর এই প্রতিউত্তর আমার পছন্দ হল না। তখন সে আমাকে বলল, 'আমার প্রতিউত্তরে আপনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম, নবীজির স্ত্রীরাও তো তাঁর

কথার প্রতিউত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ হতে আলাদা থাকেন।'

এ-কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম –

যিনি এ-রূপ করেছেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।'

তারপর আমি জামা-কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফসার রাঃ এর কাছে গিয়ে বললাম, 'হাফসা, তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহকে অসন্তুষ্ট রাখে?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'তবে তো সে বরবাদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন! এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহর সঙ্গে বাড়াবাড়ি কোরো না এবং তাঁর কোনো কথার প্রতিউত্তর দিয়ো না এবং তাঁর হতে আলাদা থেকো না। তোমার কোনো কিছুর দরকার হয়ে থাকলে, আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশী তোমার চেয়ে অধিক সন্দরী এবং রাসুলুল্লাহর অধিক প্রিয়-এ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।' তিনি উদ্দেশ্য করেছেন আয়িশাকে রাযি.। সে-সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাস্সানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথি তার পালার দিন নবীজির কাছে গেলেন এবং ইশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করে বললেন, 'তিনি (উমার রাযি.) কি ঘুমিয়েছেন?' তখন আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর কাছে এলাম।

তিনি বললেন, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।' আমি বললাম, 'কী ঘটেছে? গাস্সানের লোকেরা কি এসে গেছে?' তিনি বললেন, 'না, বরং তার চেয়েও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার! রাসূলুল্লাহ তাঁর সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন।'

উমার রাযি. বললেন –

“তা হলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।“

আমার ধারণা হচ্ছিল, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। আমি জামা পরে বেরিয়ে এসে নবীজির সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে নবীজি * তাঁর কোঠায় প্রবেশ করে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসা রাঃ কাছে গিয়ে দেখি, সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করিনি? রাসূলুল্লাহ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন?' সে বলল, 'আমি জানি না। তিনি তাঁর ঘরে আছেন।' আমি বের হয়ে মিম্বরের কাছে এলাম; দেখি যে, লোকজন মিম্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছেন এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। আমার আশঙ্কা বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ যে-ঘরে ছিলেন, আমি সে-ঘরে গেলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, 'উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর।' সে প্রবেশ করে নবীজির সাথে আলাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন।' আমি ফিরে এলাম এবং মিম্বরের পাশে-বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর আমার আবার আশঙ্কা প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম (উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর), এবারও সে আগের মতোই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন গোলাম আমাকে ডেকে বলল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।'

তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি খেজুরের পাতায় তৈরি ছোবড়া-ভর্তি একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন বিছানা ছিলো না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন?' তখন তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, 'না।'
তারপর আমি (থমথমে ভাব কাটিয়ে) অনুকূল ভাব সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম –

আল্লাহর রাসূল, দেখুন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ে এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে।' তিনি এ-ব্যাপারে আলোচনায় মুচকি হাসলেন। তারপর আমি বললাম, 'আপনি হয়তো লক্ষ করছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে এ-কথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় এবং নবীজির অধিক প্রিয়' (এ-কথা দ্বারা তিনি আয়িশাকে রাযি. বুঝিয়েছেন।)। নবীজি আবার মুচকি হাসলেন। তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ঘরের ভিতর এদিক-সেদিক দেখলাম।

কিন্তু তাঁর ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ছাড়া দেখার মতো আর কিছুই পেলাম না; তখন আমি আরয করলাম, 'আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মাতকে পার্থিব সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে
এবং তাদেরকে পার্থিব অনেক প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না।' তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'ইবনে খাত্তাব, তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়ার
জীবনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে!'

আমি আরয করলাম, 'আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য ক্ষমার দুআ করুন।' হাফসা রাযি. আয়িশার রাযি.-এর কাছে এ-কথা প্রকাশ করার কারণেই নবীজি সহধর্মিণীদের হতে আলাদা হয়েছিলেন। রাসূল এক মাস তাদের কাছে না যাওয়ার শপথ
করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এ থেকে বিরত হতে বলার পর তিনি শেষে এ-শপথ থেকে ফিরে এলেন।”

[সহি বুখারি: ২৪৬৮, সহি মুসলিম: ১৪৭৯]

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন –

"রাসূলুল্লাহ তাঁর ৪ স্ত্রীদের ব্যাপারে শপথ (ইলা) নিলেন এবং উনত্রিশ দিন তাদের থেকে দূরে এক ঘরে থাকলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীদের কাছে ফিরে গেলেন।

কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল আপনি এক মাসের শপথ নিয়েছিলেন। *' তিনি ৬ জবাব দিলেন, "এক মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।"

[সহিবুখারি: ১৯১স১

স্ত্রীকে ছেড়ে পৃথক থাকা স্ত্রীর জন্য বেশ বড় মানসিক শাস্তি। তবে এ-পৃথক থাকার বিভিন্ন পর্যায় থাকে। এটি হতে পারে, একই বিছানায় দুজনেই ঘুমাচ্ছে, কিন্তু স্বামী শারীরিক মিলন থেকে দূরে থাকছে, যা স্ত্রীর জন্য কষ্টকর; আবার হতে পারে, স্বামী বাড়ি ছেড়েই আলাদা থাকছে।

উপরোক্ত হাদীসের কিছু শিক্ষণীয় দিক-

স্ত্রীর সাথে প্রত্যেকের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত কোনো বিষয় না হলে সে-ক্ষেত্রে তাদের কথার রূঢ়তা বা আচরণের ভুল ক্ষমা করা উচিত।

নারীদের অত্যধিক চাপে রাখা নিন্দনীয় বিষয়। নবীজি * স্ত্রীদের জন্য নিজের গোত্রের আচরণ ত্যাগ করে আনসারদের আচরণকে মেনে নিয়েছিলেন।

কোনো ব্যক্তি তার বন্ধুকে মানসিক অশান্তিতে পেলে তার মন ভালো করতে চেষ্টা করা উচিত। যেমন উমার রাযি. রাসূলের ক্ষেত্রে বলেছিলেন, "আমি এমন কিছু বলব, যা শুনে নবীজি হাসবেন।"

একজন পিতা মেয়ের কাছে মেয়ের স্বামীর অনুমতি ব্যতীতও আসছে পারে। তাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বিশেষ করে তাদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে মেয়ের কাছে জানতেও চাইতে পারে।

একজন পিতা কথার মাধ্যমে তার মেয়েকে আদব শেখাতে পারে, যাতে মেয়ে তার স্বামীর প্রতি যথার্থ আচরণ করতে পারে

ফাতহুল বারি: ৯/২৯১

এ সমস্যাটিতে আমরা দেখলাম, রাসুল স্ত্রীদের থেকে পৃথক ছিলেন। এ পৃথক থাকার মাধ্যমে তিনি দাম্পত্য জীবনে আসা কয়েকটি সমস্যার সমাধান করলেন। তাই দাম্পত্য জীবনের সমস্যাদি সমাধানের একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্ত্রী থেকে কিছু সময়ের জন্য পৃথক থাকা। রাসুল সাঃ পৃথক থাকার শাস্তি দিলেন স্ত্রীদের। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এক মাস তাদের কাছে না আসার শপথ করলেন। স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা স্ত্রীর জন্য একটি মানসিক শাস্তি। শাস্তি হিসেবে এটি বেশ কার্যকর ও যথার্থ। তিনি স্ত্রীদের ত্যাগ করলেও মারাত্মক ধরনটি অবলম্বন করেননি।

রাসুল সাঃ স্ত্রীদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন না এক মাসের জন্য। অন্যদিকে একই বিছানায় স্ত্রীর সাথে শুয়ে থেকেও স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা আরও বেশি মারাত্মক শাস্তি। কিন্তু রাসুল-এর দয়ার্দ্রতা লক্ষণীয় এখানে। তিনি মারাত্মক ধরনটি অবলম্বন না করে, হালকা ধরনটি অবলম্বন করেছেন।

নবীজি সাঃ এবং তাঁর স্ত্রীগণ পরিবারে একে অপরের সাথে সর্বোত্তম আচরণ বজায় রাখতেন। নবীজি সাঃ সব সময় চেষ্টা করতেন তাঁর প্রতিটি ভূমিকায় ন্যায়ানুগ আচরণ করার। এমনকি পারিবারিক জটিলতার মহর্তগুলোতেও তিনি যথাযথভাবে একজন আদর্শ স্বামীর ভূমিকা পালন করেছেন। পরিবারে তাদের সবার আচরণ এবং নৈতিকতা উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। স্ত্রীর সাথে কথা বলায় ও আচরণে ধৈর্য, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা ও সহনশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা। এ-ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা বা ব্যর্থতা আমাদের আখলাক ও ঈমানের প্রকৃত অবস্থাকেই তুলে ধরবে।

অধ্যায়-৭: সন্তানদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে নবীজির শিক্ষা

রাসুল সাঃ ছিলেন নিজ পরিবারের প্রতি সর্বোচ্চ সুন্দর আচরণকারী। তিনি তাঁর পরিবারের সাথে ব্যবহারে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বোত্তম। সন্তানদের সাথে ব্যবহারে এটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাদের দেখাশোনা ও লালনপালনে তিনি ছিলেন যত্নবান।

শিশুদের সাথে নবীজি সাঃ -এর সম্পর্ক ছিল মমতাময় ও ভালোবাসাপূর্ণ। নবীজি ইসলামী নীতির আলোকে তাঁর নিজের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের বড় করে তুলেন। তাদের বিয়ের পরও তাদের খেয়াল রাখতেন। তিনি সন্তানদের দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের আত্মিক প্রয়োজন পূরণেও তিনি ছিলেন যত্নবান। ব্যবহারের সময় নিজের সন্তান, সৎসন্তান বা অন্য মুসলিমের সন্তানের সাথে তাঁর ব্যবহারে কোনো ভিন্নতা ছিল না। সবার সাথেই তাঁর আচরণ ছিল ভালোবাসা ও মমতাপূর্ণ এবং তাদের গড়ে তোলায় তিনি ছিলেন সদা-তৎপর। শ্রেষ্ঠ প্রতিপালন, সর্বোত্তম শিক্ষা পদ্ধতি ও অটুট সম্পর্ক ইত্যাদি মহৎ গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য ছিল সন্তানদের প্রতি রাসুল-এর আচরণ।

নবীজির সন্তান-সন্ততী

রাসুল সাঃ -এর কন্যা ছিল চারজন। সন্তানদের মধ্যে কন্যারাই কেবল জীবিত ছিলেন। পুত্র-সন্তানগণ শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসুল তাঁর কন্যাদের ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। তাদের নিয়ে তিনি অনেক বেশি খুশি ছিলেন।

রাসুল সাঃ বলেন, 'কাউকে যদি কন্যা-সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আর সে যদি তাদের সঙ্গে সদাচরণ করে- তবে তারা জাহান্নাম ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। '৩১৫ ৩১৩.

[সহি বুখারি: ৫৯৯৫, সহি মুসলিম: ২৬২৯]

নবীজির পুত্র সন্তান

রাসুল সাঃ-এর পুত্র-সন্তান রাসুল -এর ছেলে-সন্তান ছিল তিনজন — কাসিম, আব্দুল্লাহ ও ইবরাহিম এ ছাড়া তাইয়িব ও তাহির দুটি নামও পাওয়া যায় তাঁর ছেলেদের। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, তাইয়িব ও তাহির দুটি নামই আব্দুল্লাহর উপাধি।

জাদুল মাআদ: ১/১০১

রাসুল সাঃ-এর সকল ছেলেই কম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

কাসিম: মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন দুবছর কয়েক মাস বয়সে। কাসিমের নামানুযায়ী রাসুল-এর কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম। কাসিম ছিলেন খাদিজা -এর গর্ভজাত সন্তান।

আব্দুল্লাহ: রাসুল-এর নবুওয়াত লাভের পর জন্ম হয়েছিল তার। মক্কায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনিও খাজিদা-এর গর্ভের সন্তান।

ইবরাহিম: তার মায়ের নাম মারিয়া কিবতিয়া। মদিনায় ৮ম হিজরির জিলহজ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৭ কি ১৮ মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

নবীজির কন্যা সন্তান

আল্লাহ তাআলা চারজন কন্যা-সন্তান দান করেছেন তাঁকে। তাঁরা ছিলেন – জাইনাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। সবাই একই মায়ের সন্তান সবার জন্ম খাদিজা রাঃ -এর গর্ভে।

জাইনাব: রাসুল-এর প্রথম মেয়ে। তাঁর বিয়ে হয় আবুল আস বিন ববিত সাথে।

রুকাইয়া: রাসুল-এর দ্বিতীয় কন্যা-সন্তান। ইসলাম-পূর্ব যুগে উত্তর বিন আবু লাহাবের সাথে বিয়ে হয় তাঁর। কিন্তু উতবার সাথে বাসর হওয়ার আগেই উতবা তালাক দিয়ে দেয় রুকাইয়া -কে। এরপর তাঁকে দিতে করেন উসমান বিন আফফান এক। উসমান ৩-এর সাথে তিনি হিজরত করেন হাবশায়। পরবর্তীকালে হিজরত করেন মদিনায়। রাসুল যখন বদর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, রুকাইয়া এ অনুর হয়ে পড়েন। তাই রাসুল উসমান বিন আফফান-কে মদিনায় রেখে যান তাঁর দেখাশোনার জন্য। রমাজানেই তিনি ইনতিকাল করেন। তখন রাসুল এ বদর অভিযানে ব্যস্ত।

উম্মে কুলসুম: রাসুল-এর তৃতীয় কন্যা। রুকাইয়া ৯-এর মৃত্যুর পর উসমান উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। তিনিও মৃত্যুবরণ করেন উসমান ৯-এর বিবাহ বন্ধনে থাকাবস্থায়।

ফাতিমা: রাসুল-এর চতুর্থ ও কনিষ্ঠ কন্যা। রাসুল তিনিই ছিলেন রাসুল-এর সর্বাধিক প্রিয়। রাসুল -এর মেয়েদের মধ্যে -এর যখন ৪১ বছর বয়স, তখন জন্মগ্রহণ করেন ফাতিমা। রাসুল-এর মৃত্যুর ৬ মাস পর মৃত্যুবরণ করেন ফাতিমা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল আলি বিন আবু তালিব -এর সাথে।

নবীজি সন্তানদের সুন্দর অর্থবহ নাম রাখতেন

রাসুল সাঃ -এর সন্তানদের নামের প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যায়, সুন্দর এ নামগুলো তিনি বাছাই করেছেন বেশ যত্নের সাথে। সন্তানদের সুন্দর নাম রাখার প্রতি উৎসাহ দিতেন তিনি। যাদের নাম অসুন্দর হতো, তাদের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন। সুফইয়ান সাওরি বলেন, 'বলা হতো, পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হচ্ছে, পিতা সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখবে, সন্তান বালেগ হলে তাকে বিয়ে দেবে, তাকে হজ করাবে এবং সন্তানকে উত্তম আদব শেখাবে।

[ইবনে আবিদ দুনিয়া কৃত কিতাবুল ইয়াল: ১৭১]

যেদিন ইবরাহিমের জন্ম, সেদিনই রাসুল তাঁর নাম রাখেন। আনাস বলেন, 'রাসুল এক সকালে বলেন, "আমার একটি সন্তান জন্ম নেয় রাতে। আমি তার নাম রাখলাম আমার পিতা ইবরাহিমের নামে।

[সহি মুসলিম: ২৩১৫]

কন্যাদের বিয়ে দিয়েছেন সর্বোত্তম পুরুষদের সাথে

জাইনাব রাঃ-এর বিয়ে –

জাইনাব রাঃ-কে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন আবুল আস বিন রাবি কুরাইশি-এর সাথে। আবুল আস ছিলেন জাইনারের খালা হালাহ বিনতে খুয়াইলিদের সন্তান। আবুল আস মক্কার সেরা পুরুষদের একজন ছিলেন। ব্যবসা, সম্পদ ও আমানতদারিতায় অনন্য ছিলেন তিনি।

জাইনাব ও তাঁর স্বামী আবুল আসের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয় ইসলাম। তবে রাসুল তাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হননি একটা সময় পর্যন্ত। জাইনাব মুসলিম হয়েও তাঁর স্বামীর সাথে বসবাস করছিলেন। স্বামী তখনও মুশরিক। রাসুল সাঃ মদিনায় এলেন। রাসুল সাঃ তাকে নিয়ে আসতে সমর্থ ছিলেন না। তাই জাইনাব স্বামীর সাথে মক্কায় রয়ে গেলেন।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সথে আবুল আসও আসেন। বন্দী ৭০ জনের মধ্যে তিনিও ছিলেন। এরপরের ঘটনা বর্ণনায় আয়িশা বলেন, 'বদরের বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ পাঠাল মক্কাবাসী। আবুল আসের মুক্তির জন্য জাইনাবও মুক্তিপণ পাঠালেন। সে মুক্তিপণের একটা অংশ ছিল খাদিজার রাঃ এর হার। আবুল আসের সাথে জাইনাবের যখন বিয়ে হয়, তখন এ হারটি খাদিজা জাইনাবকে উপহার দিয়েছিলেন। এ হারটি দেখে রাসুল আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়েন ভীষণভাবে।

সাহাবিদের উদ্দেশে নবিজি সাঃ বললেন, "যদি তোমরা ভালো মনে করো, তবে জাইনাবের বন্দীকে মুক্ত করে দাও। সাথে তার মুক্তিপণও ফিরিয়ে দাও।" সাহাবিরা সায় দিলেন।

তবে তাঁর জামাতা আবুল আসের প্রশংসায় একবার বলেন –
"সে আমার সাথে সত্য বলেছে। আমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা পুরণ করেছে। ওয়াদা দিয়ে সেটা পূরণ করেছে।"
[সহি বুখারি: ৩১১০, সহি মুসলিম: ২৪৪৯]

রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রাঃ-এর বিয়ে –

রাসুল সাঃ রুকাইয়াকে বিয়ে দিয়েছিলেন উসমান-এর সাথে। উসমান ছিলেন অনন্য চরিত্রের অধিকারী। লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর অনুপম চরিত্রের অন্যতম অংশ। রাসুল তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।

রুকাইয়া রাঃ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন নবিজি রুকাইয়ার বোন উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন উসমান-এর সাথে। উম্মে কুলসুম-ও মৃত্যু পর্যন্ত উসমান এ-এর সাথে দাম্পত্য জীবনযাপন করেছিলেন।

ফাতিমা রাঃ-এর বিয়ে –

ফাতিমা-এর বিয়ে দেন আলি রাঃ -এর সাথে। আলি ছিলেন রাসুল -এর চাচাতো ভাই। শিশুদের মধ্যে আলি রাঃ-ই প্রথম ইমান আনেন রাসুল সাঃ-এর প্রতি। ইসলাম-পূর্ব যুগে আলি রাসুল সাঃ-এর কাছে লালিতপালিত হন। নবুওয়াতের পর পর্যন্ত নবিজি সাঃ-এর সাথেই ছিলেন আলি রাঃ। নবিজি তাকে ভালোবাসতেন, তাকে কাছে টেনে নিতেন। আলি রাঃজান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।

বিয়ের ব্যাপারে কন্যাদের সাথে পরামর্শ এবং তাদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন

বিয়ের ব্যাপারে কন্যাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন আতা বিন রবাহ বলেন, 'আলি যখন ফাতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন, রাসুল ফাতিমার কাছে এলেন। বললেন, "আলি তোমার কথা বলেছে।" ফাতিমা চুপ হয়ে থাকলেন। এরপর রাসুল বেরিয়ে এলেন ফাতিমার কাছ থেকে। তাকে বিয়ে দিলেন আলি রাঃ -এর সাথে।"
[ইবনে সাদ এ কৃত তাবাকাত: ৮/২০]

ফাতিমা রাঃ -এর চুপ থাকাই সম্মতি ছিল। 'রাসুল সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন –

"কুমারী মেয়ের সম্মতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দেবে না।" সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, "তার অনুমতি কেমন, আল্লাহর রাসুল?" রাসুল উত্তর দিলেন, "কুমারী কন্যার চুপ থাকাই সম্মতি।"

[সহি বুখারি: ৫১৩৬, সহিহু মুসলিম: ১৪১৯]

কন্যা পিতার কাছে আমানত। কন্যার অমতে তার বিয়ে দেওয়া বৈধ নয়।

ওলিমা ছিলো সাধারণ

বুরাইদা বলেন, 'আলি ও ফাতিমা রাঃ -এর বিয়ে হলো। তখন রাসুল সাঃ বললেন, "বিয়েতে অবশ্যই অলিমা হওয়া দরকার।" তখন সাদ বললেন, "একটি ভেড়া আনার দায়িত্ব আমার।" আরেকজন বললেন, "আমি এ পরিমাণ আটা আনব।

[মুসনাদু আহমাদ: ২২৫২৬]

"অলিমা হচ্ছে, বিয়ের ভোজ। শব্দটি এসেছে ওয়ালাম শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে একত্র করা। যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হয়, তাই এ ভোজকে অলিমা বলে।

[লিসানুল আরব: ১২/৬৪৩
জুমহুর আলিমের মতে, এটি মুসতাহাব]

কন্যাদের বিয়ের ব্যাপারে অধিক মোহরানা নির্ধারণ করতেন না

কন্যাদের অত্যধিক মোহর নির্ধারণ করতেন না রাসুল কম মোহরে বিয়ে দিয়েছেন তাঁর কন্যাদের।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন –

আলি রাঃ বলেন, "আমি ফাতিমাকে বিয়ে করলাম। রাসুল সাঃ বললেন, "তাকে কিছু দাও।" আমি বললাম, "আমার কাছে তো দেওয়ার মতো কিছু নেই।" রাসুল বললেন, "তোমার হুতামি বর্মটি কোথায়?" আমি বললাম, "সেটি আমার কাছে আছে।" রাসুল বললেন, "সেটিই দিয়ে দাও।"

[সুনানু আবি দাউদ: ২১২৫, সুনানুন নাসায়ি ৩৩৭৫]

তিনিই ছিলেন রাসুল সাঃ-এর ছোট কন্যা, আদরের দুলালি, জান্নাতি নারীদের সর্দার ফাতিমা রাঃ

বিয়ের সময় ফাতিমা ও আলি রাঃ-এর জন্য দোয়া

বিয়ের রাত নবিজি আলি-কে বললেন, 'আমার সাথে দেখা করা ব্যতীত কোনো কিছু কোরো না।' এরপর রাসুল এসে পানি নিয়ে আসতে বললেন। অজু করলেন পানি দিয়ে। অবশিষ্ট পানি আলি-এর ওপর ছিটিয়ে দিলেন।"

اللهم بارك فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَائِهما

"আপনি তাদের মাঝে বরকত দান করুন। তাদের দাম্পত্য জীবনে বরকত দান করুন।"

[তাবারানি কৃত আল-কাবির। ১১৫৩
হাদিসের মান। হাসান]

স্বামী-স্ত্রীর জন্য বরকতের দোয়া করা মুসতাহাব। নবিজি সাঃ আব্দুর রহমান বিন আওফের জন্য দোয়া করে বলেছিলেন

بارك الله لان
'আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।'

[সহি বুখারি: ৫১৫৫, সহি মুসলিম: ১৪২৭]

বিয়ের পর নতুন বাসস্থানের জন্য মেয়েদের উপহার পাঠাতেন

আলি রাঃ থেকে বর্ণিত –

"যখন নবীজি সাঃ ফাতিমাকে তার সাথে বিয়ে দিলেন, তখন তিনি তার সঙ্গে একটি জামা, খেজুর ছোবড়াভরা চামড়ার একটি বালিশ, দুটো যাঁতা এবং দুটো পাত্র দিয়েছিলেন।"

[মুসনাদে আহমাদ: ৮২১]

নবীজি সাঃ তাদেরকে আয়িশা রাঃ=এর ঘরের পেছনে উত্তরদিকে একটি ছোট ঘর উপহার দিয়েছিলেন, তাদের ঘরে একটি ছোট দরজা ছিল, যা দিয়ে রাসূল সাঃ মাঝে মাঝে ঢুকে তাদের সাথে দেখা করতেন।
এ-সব উদাহরণ থেকে বিয়েকে সহজ করার শিক্ষা পাই আমরা। বিয়ের প্রস্তুতি হতে হবে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী। কনে কিংবা বর কারও উপরই এমন বোঝা চাপানো উচিত নয়, যা তার জন্য জুলম হয়ে দাঁড়াবে।

বিয়ের পরও মেয়েদের দেখাশোনা করতেন ও যত্ন নিতেন

বিয়ের পরও নবিজি আগের মতোই কন্যাদের খোঁজখবর অব্যাহত রাখেন। কোনো ব্যস্ততাতেই তিনি কন্যাদের তত্ত্বাবধানে পিছপা হতেন না। এমনকি কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায়ও কন্যাদের ব্যাপারে চিন্তা করতেন। নবিজি সাঃ যখন বদর অভিযানে বের হন। তখন তাঁর কন্যা রুকাইয়া অসুস্থ। একটু পরে তাঁকে কুরাইশ ও কুরাইশের প্রবল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। ভীষণ এক বাস্তবতা তাঁর সামনে। কিন্তু তবুও তিনি কন্যার অসুস্থতার কথা ভুলে যাননি। রুকাইয়া-এর স্বামী উসমান বিন আফফান-কে তিনি মদিনায় থাকার আদেশ করলেন। যাতে রুকাইয়ার দেখাশোনা করতে পারেন। তিনি তাকে গনিমতের অংশ তো দিলেনই এবং বললেন, আল্লাহর কাছে তিনি জিহাদের সাওয়াবও পাবেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে কেউ একজন উসমান সম্পর্কে ইঙ্গিতে অসংলগ্ন মন্তব্য করল। জবাবে ইবনে উমর বলেন, 'বদরের যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কারণ হচ্ছে রাসুল-এর সাহেবজাদি রুকাইয়া ছিলেন উসমানের স্ত্রী। বদরের সময়টাতে রুকাইয়া বেশ অসুস্থ ছিলেন। তাই নবিজি তাঁকে মদিনায় থেকে যাওয়ার আদেশ করলেন এবং বললেন –

"তোমার জন্য বদরে যোগদানকারীর প্রতিদান রয়েছে এবং রয়েছে বদরের গনিমতের অংশ।"

[সহি বুখারি: ৩১৩০]

কন্যা ও স্বামীর ছোটখাটো মান-অভিমানে হস্তক্ষেপ করতেন না, সাহল বিন সাদ বলেন,
একদিন রাসুল সাঃ ফাতিমার বাড়িতে এলেন। আলিকে বাড়িতে না দেখে বললেন, "তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?"

[সহি বুখারি: ৫১৫৫, সহি মুসলিম ১৪২৭]

ফাতিমা বললেন, "আমার ও তাঁর মাঝে ঝগড়া হয়েছে। আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন তিনি। দুপুরের বিশ্রামও করেননি বাড়িতে।" রাসুল তখন এক ব্যক্তিকে বললেন, "দেখো তো কোথায় গেল সে?" লোকটি আলির সন্ধান করে এসে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।"

রাসুল মসজিদে এসে দেখলেন, আলি শুয়ে আছে। তার শরীরের একাংশ থেকে চাদর পড়ে গিয়ে মাটি লেগে গেছে। রাসুল তার শরীরের মাটি মুছতে মুছতে বললেন, "উঠো হে মাটিওয়ালা, উঠো হে মাটিওয়ালা!"

সহি বুখারি: ৪৪১, সহি মুসলিম: ২৪০৯

ইবনে হাজার বলেন, 'এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, মেয়ের জামাইয়ের সাথে খোশামোদ করা যায়। রেগে গেলে শান্তও করা যায়।

ফাতহুল বারি: ১/৫৩৬

এই হাদিসের লক্ষণীয় বিষয় যে, ফাতিমা ও তাঁর স্বামী আলি-এর মাঝে কী নিয়ে ঝগড়া হলো রাসুল তা জানতে চাননি। তাদের ঝগড়ার বর্ণনাও জিজ্ঞেস করেননি তিনি। বরং পুরো ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেলেন এবং আলি-কে শান্ত করতে বেরিয়ে পড়লেন। কন্যা ও তার স্বামীর ঝগড়ার সময় করণীয় কী, তা জানলাম আমরা। কিন্তু আজকাল অনেকেই স্বামী-স্ত্রীর ছোটখাটো ঝগড়ার মাঝে নাক গলিয়ে বসে। ফলে সমস্যা কমার পরিবর্তে উল্টো বেড়ে যায়। কখনো কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে। এ হাদিসে রাসুল-এর উত্তম চরিত্রের আরেকটি চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি। রাসুল কন্যা ও তার স্বামীর ঝগড়ার কথা শুনে স্বামীকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে তাকে শান্ত করতে গেলেন। তার গায়ের মাটি ঝেড়ে দিলেন। মাটিওয়ালা বলে তার সাথে কৌতুক করলেন, যাতে তিনি ইতস্তত বোধ না করে অনায়াসে রাসুল-এর সাথে কথা বলতে পারেন।

রাসুল তাঁর মেয়ের সাথে ঝগড়া করার জন্য মেয়ের স্বামী আলি রাঃ-কে মোটেই তিরস্কার করেননি। যদিও মেয়ে ফাতিমা এ-ই ছিলেন রাসুল এ-এর অধিক প্রিয়। আলি রাঃ-কে এ বিষয়ে কিছুই বলেননি তিনি। এটা ছিল রাসুল সাঃ এর নিদর্শন।

অন্যদিকে, ফাতিমা কিন্তু তাদের ঘর থেকে বের হয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেননি। তিনি এমনটা করলে, সমস্যা আরও বেড়ে যেত। কিন্তু তিনি স্বামীর ঘরে থাকার কারণে সমস্যাটি হতে পারেনি।

[ফাতহুল বারি: ১০/৫৮৮]

পরিবারের লোকদের করণীয় হচ্ছে, দম্পতিকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। তাদের নসিহত করা। স্ত্রীকে সবর করতে বলা। স্বামীর সাথে সদাচরণের নির্দেশনা দেওয়া।

কন্যাদের কেউ বেড়াতে এলে তাদের অভ্যর্থনা জানাতেন

কন্যা পিত্রালয়ে ফিরলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন এবং আগ বেড়ে এগিয়ে নিতেন।
আয়িশা বলেন, 'রাসুল-এর সঙ্গে চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের দিক থেকে ফাতিমার চাইতে এত মিল অন্য কারও মাঝে দেখিনি। ফাতিমা রাঃ যখন নবিজি সাঃ-এর কাছে আসতেন, নবিজি এ বসা থেকে উঠে যেতেন, ফাতিমাকে চুমু খেতেন, নিজের জায়গায় তাকে বসাতেন। আবার নবিজি যখন ফাতিমার কাছে যেতেন, ফাতিমা বসা থেকে উঠে এসে স্বাগত জানাতেন। তাঁকে চুমু খেয়ে নিজের স্থানে বসাতেন।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে –

'রাসুল সাঃ ফাতিমার হাত ধরে তাঁকে চুমু খেলেন।' রাসুল এটি ফাতিমা -এর সম্মানার্থে করতেন। আয়িশা ও বলেন, 'ফাতিমা হেঁটে ঘরে এলেন। মনে হলো তাঁর হাঁটা অবিকল রাসুল এ-এর হাঁটা। রাসুল তাঁকে "এসো আমার প্রিয় কন্যা" বলে নিজের ডান বা বাঁ পাশে বসালেন।

'এ হাদিসে ফাতিমা রাঃ -এর প্রতি রাসুল-এর ভালোবাসা ও সম্মানের একটি অনুপম চিত্র দেখতে পেয়েছি আমরা। রাসুল যখনই তাঁর মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁকে স্বাগত জানাতেন।

[সুনানু আবি দাউদ: ৫২১৭, সুনানুত তিরমিজি: ৩৮৭২
সহি বুখারি: ৩৬২৪, সহি মুসলিম: ২৪৫০]

কন্যাদের হাদীয়া উপহার দিতেন

আলি রাঃ বলেন –

“একবার রাসুল আমাকে রেশমের তৈরি এক সেট পোশাক দিলেন। আমি সেটি পরে বাইরে বের হলাম। তিনি দেখে বললেন, "আলি, তুমি পরার জন্য তো এটি দিইনি। এটি থেকে ফাতিমাদের জন্য ওড়না বানাও।"

[সহি বুখারি: ২৬১৪, সহি মুসলিম: ২০৭১,
মুসনাদু আহমাদ: ৭১২]

ইমাম নববি বলেন –

'ফাতিমাদের জন্য-ফাতিমাদের বলে উদ্দেশ্য তিন ফাতিমা-

এক. রাসুল-কন্যা ফাতিমা। দুই. আলি-এর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিন. ফাতিমা বিনতে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব।

[ইমাম নববিএ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম: ১৪/৫১]

সন্তানদের দায়িত্বশীলতা শেখাতেন

সন্তানদের দায়িত্বশীলতা শেখাতেন, রাসুল বলেন –

'ফাতিমা, নিজেকে তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কারণ, আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি তোমার এতটুক উপকারেও আসব না।

[সহি বুখারি: ২৭৫৩, সহি মুসলিম: ২০৪]

ইমাম বুখারির বর্ণনায় এসেছে –

'হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, আমার সম্পদের যা চাও চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহর সামনে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না।'

'হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে-

"ফাতিমা, তুমি রাসুলের কন্যা, এই আত্মীয়তার ওপর ভরসা কোরো না। কেননা, আল্লাহ যদি তোমার বদ আমলের কারণে তোমাকে কোনো শাস্তি দিতে চান, তবে আমি সে শাস্তি রোধ করতে পারব না।"

[ইমাম নববিকৃত শারহু সহিহি মুসলিম: ৩/৮০]

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাময় কাজের নির্দেশনা দিতেন

দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণময় কাজের নির্দেশনা দিতেন আলি বলেন, 'একবার ফাতিমা রাসুলুল্লাহ-এর ঘরে এলেন তাঁর আটা পেষার কষ্টের কথা জানিয়ে একটি খাদিম চাওয়ার জন্য। কিন্তু ঘরে এসে তিনি রাসুলুল্লাহ-কে পেলেন না। তাই বিষয়টি আয়িশা-কে বলে চলে গেলেন।

রাসুল ঘরে এলে আয়িশা তাঁকে ফাতিমার খাদিম চাওয়ার কথা জানালেন।' আলি বলেন, এরপর রাসুল আমাদের কাছে আসলেন। ততক্ষণে আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমরা উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন "তোমরা আপন জায়গায় থাকো" বলে আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। আমি তখন আমার বুকে তাঁর দুপায়ের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম।

তিনি বললেন,

"আমি কি তোমাদের খাদিমের চেয়ে উত্তম কিছুর সন্ধান দেবো না? যখন তোমরা ঘুমানোর জন্য বিছানায় আসবে অথবা শুয়ে পড়বে, তখন =

৩৩ বার "আল্লাহু আকবার",
৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ",
৩৩ বার "আলহামদুলিল্লাহ" পড়বে।

"এটা তোমাদের জন্য খাদিমের চাইতেও বেশি উত্তম।"

[ফাতহুল বারি: ৫/২২৯]

রাসুল নিজ কন্যাকে খাদিম না দেওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি আহলে সুফফার দরিদ্রদের কষ্ট লাঘব করাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নিজের পরিবারের জন্য সবর করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। কারণ, এতে তারা অধিক সাওয়াবের অধিকারী হয়।

কন্যাদের তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন

আলি রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসুল একদিন রাতের বেলা ফাতিমা রাঃ এ-এর কাছে আসলেন। আলি ও ফাতিমা-কে বললেন, "তোমরা কি রাতের নামাজ পড়বে না?" আলি বললেন, "আল্লাহর রাসুল, আমাদের সবকিছু তো আল্লাহর হাতে। তিনি যখন (শেষ রাতে) আমাদের তুলবেন আমরা উঠব।"

আলি রাঃ বলেন, "আমার কথা শুনে রাসুল কোনো কিছু না বলেই চলে গেলেন। যেতে যেতে তিনি উরুর ওপর হাত দিয়ে প্রহার করে বলছিলেন:

وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

"কিন্তু মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বিতর্ককরী"

[সূরা: আল-কাহফ: ১৮:৫৪,

সহি বুখারি: ১১২৭, সহি মুসলিম: ৭৭৫]

দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে সাদকা প্রদানের প্রতি সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতেন

দুনিয়াবিমুখতা ও সাদাকা প্রদানের প্রতি সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতেন আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেন, 'একবার রাসুল ফাতিমা রাঃ -এর ঘরে যান। গিয়ে দেখেন, তাদের দরোজায় একটি পর্দা ঝুলানো। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে আসেন।

রাসুল সাঃ কোনো সফর থেকে ফিরলে প্রায়শ সবার আগে ফাতিমার ঘরে যেতেন। আলি ঘরে এসে ফাতিমাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন,
"কী হয়েছে তোমার?" ফাতিমা রাঃ বললেন, "নবিজি আমাদের ঘরের সামনে এসে ঘরে না ঢুকে ফিরে গেলেন।"

এরপর আলি রাঃ এলেন রাসুল সাঃ-এর কাছে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, আপনি ফাতিমার ঘরের সামনে গিয়েও ভেতরে গেলেন না, এটা ফাতিমার জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক হয়েছে।"

রাসুল বললেন, "দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কী? আমার সাথে কারুকার্যের কী সম্পর্ক? আমি তার ঘরের দরোজায় একটি নকশাদার পর্দা ঝুলতে দেখলাম।"
আলি রাঃ ফাতিমার কাছে এসে রাসুল-এর কথা জানালেন। ফাতিমা তখন বললেন, তাহলে রাসুল সাঃ -কে জিজ্ঞেস করুন, ওই পর্দার ব্যাপারে আমরা কী করব?" আলি রাসুল-এর কাছে এসে ফাতিমার কথা বললেন।

রাসুল সাঃ উত্তর দিলেন, "তাকে বলো, সে যেন অমুক গোত্রের কাছে এটি পাঠিয়ে দেয়। তাদের প্রয়োজন রয়েছে এটির।"

[সহিহুল বুখারি: ২৬১৩, সুনানু আবি দাউদ: ৪১৪৯]

কন্যাদের হাসিখুশি ও প্রফুল্ল রাখতে পছন্দ করতেন

আয়িশা রাঃ বলেন –

"একবার ফাতিমা হাঁটতে হাঁটতে (রাসুলুল্লাহ-এর ঘরে) এলেন। তার হাঁটার ভঙ্গি অবিকল রাসুল-এর মতো ছিল। নবিজি সাঃ বললেন, "এসো এসো আমার মেয়ে।"

তাকে নিজের ডানে বা বামে বসালেন। এরপর চুপিচুপি তাকে কী যেন বলতে লাগলেন। শুনে ফাতিমা কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তারপর রাসুলুল্লাহ আবারও তার কানে কানে কী যেন বললেন। এবার তিনি হেসে উঠলেন।

আমি তখন বললাম –

"আজকের মতো কখনো এভাবে কেঁদে উঠে পরক্ষণেই হেসে ফেলতে দেখেনি আমি।" আমি ফাতিমার কাছে এর কারণ জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, "রাসুল-এর গোপনে বলা কথা আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।"

এরপর একদিন রাসুল আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তখন আমি আবারও ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম। এবার তিনি বললেন, "রাসুল চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, "জিবরিল প্রতি বছর একবার আমাকে পুরো কুরআন শোনাতেন। কিন্তু এ বছর তিনি দুবার তিলাওয়াত করেছেন। মনে হয় আমার বিদায়ের সময় চলে এসেছে। আর আমার পরিবার থেকে তুমিই সবার আগে আমার সাথে যুক্ত হবে।"
রাসুল সাঃ -এর এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। তখন রাসুল আবার বললেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমিই হচ্ছ জান্নাতি নারী বা মুমিন নারীদের সর্দার?" তাঁর এ কথায় আমি হেসে উঠি।"

[সহি বুখারি: ২৬২৪]

হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ফাতিমা রাঃ-এর কান্নায় রাসুল-এর মন কেঁদে ওঠে। তাই সাথে সাথে নিজ কন্যার দুঃখ সারিয়ে তুলতে তিনি তাকে সুন্দর একটা কথা বলে দিলেন, যাতে তার অন্তর থেকে দুঃখ-কষ্ট চলে গিয়ে অন্তর পুলকিত হয়ে ওঠে।

বিপদের সময় সন্তানদের সবর করার উপদেশ দিতেন

উসামা বিন জাইদ বলেন –

রাসুলুল্লাহ-এর জনৈক কন্যা (জাইনাব) তাঁর কাছে এই খবর দিয়ে লোক পাঠালেন-আমার এক পুত্র মরণাপন্ন; আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন।

তিনি বলে পাঠালেন – জায়ণাব রাঃ-কে আমার সালাম দেবে এবং বলবে:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

"আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন—সব তাঁরই অধিকারে। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।"

জায়ণাব রাঃ তখন আল্লাহর কসম দিয়ে আবার লোক পাঠালেন, রাসুলুল্লাহ যেন তার কাছে অবশ্যই আগমন করেন। এবার রাসুলুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাদ বিন উবাদা, মুআজ বিন জাবাল, উবাই বিন কাব, জাইদ বিন সাবিত-সহ আরও কতিপয় সাহাবি।

রাসুলুল্লাহ-এর হাতে শিশুটিকে তুলে দেওয়া হলো। সে তখন অস্থির হয়ে হাত-পা ছুড়ছিল। তার শ্বাস পুরাতন মশকে পানি ঢালার মতো শব্দ করছে। রাসুলুল্লাহ-এর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল।

সাদ বললেন –

"ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ কী? আপনি কাঁদছেন।" তিনি বললেন:

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرحماء

"এ হলো রহমত! যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রাখেন। আর আল্লাহ তো কেবল তাঁর দয়ালু বান্দাদেরই রহম করেন।“

[সহি বুখারি: ১২৩৮, সহি মুসলিম: ৯২৩]

ইমাম নববি হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

"আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন-সব তাঁরই অধিকারে। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কাজেই, সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।"-এই কথাগুলো বলে রাসুলুল্লাহ জাইনাব-কে সবরের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

'রাসুলুল্লাহ-এর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল।'

সাদ বললেন –

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ কী? আপনি কাঁদছেন!"

'সাদ ধারণা করেছিলেন, (মৃত ব্যক্তির শোকে) সকল প্রকার কান্না হারাম। চোখে অশ্রু প্রবাহিত হওয়াও হারাম। তিনি মনে করেছিলেন, নবিজি বিষয়টা ভুলে গেছেন। তাই 'এ কী, আপনি কাঁদছেন! বলে, রাসুল সাঃ-কে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তখন রাসুল সাঃ জানালেন, কান্না করা, চোখে অশ্রু আসা হারাম নয়, মাকরুহও নয়। বরং অনেক কান্না আছে রহমত ও ফজিলতের। বিলাপ ও আর্তনাদ ইত্যাদি সহযোগে কান্না করাই হারাম।

[ইমাম নববি কৃত শারহু সহিহি মুসলিম: ৬/২২৫]

সন্তানদের যিকির ও দোআর প্রতি উৎসাহিত করতেন

আনাস বিন মালিক বলেন –

"রাসুল ফাতিমাকে বলতেন, "ফাতিমা, আমার উপদেশ শুনতে কীসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এ দোয়া পড়বে-

يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমারই রহমতের আশ্রয় চাই। আমার জন্য আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের দায়িত্বে সোপর্দ কোরো না।"

[ইবনুস সুন্নি কৃত আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ: ৪৬,
হাদিসের মান: হাসান]

সন্তানদের মৃত্যুতে নবীজির শোকাহত সময়

ছেলে-মেয়েদের মৃত্যুতে তিনি শোকাহত হতেন, রাসুলুল্লাহ তাঁর পুত্র-কন্যা সব হারিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেবল ফাতিমা জীবিত ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি একে একে তাঁর সকল সন্তান হারিয়েছেন। রাসুল সাঃ-এর কোনো সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তিনি কাঁদতেন। সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হতেন। তাঁর দুচোখ থেকে গড়িয়ে পড়ত ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তবে মুখে কেবল সে কথাই উচ্চারণ করতেন, যে কথায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, যে কথা আল্লাহ পছন্দ করেন।

আনাস উম্মে কুলসুম-এর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের বর্ণনায় বলেন –
'আমরা রাসুল সাঃ-কন্যার জানাজা পড়লাম। রাসুল সাঃ কবরের পাশে বসে রইলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।'

[সহি বুখারি: ১২৮৫]

রাসুল সাঃ-এর চোখের সে অশ্রু অস্থিরতার অশ্রু ছিলো না এবং আল্লাহর সিদ্ধারের প্রতি অসুন্তষ্টির কারণও ছিল না। বরং এ অশ্রু ছিল রহমতের, এ অশ্রু চিল স্নেহের। দয়াবানদের চোখ থেকে এমন অশ্রু বের হওয় অস্বাভাবিক নয়।

আনাস বিন মালিক এ বলেন –

"একবার আমরা কর্মকার আবু সাইকের বাড়িতে এলাম। তিনি ছিলেন নবি-তনয় ইবরাহিমের দুধ-পিতা। রাসুল সাঃ ইবরাহিমকে চুমু খেলেন, তাকে নাকে-মুখে লাগিয়ে আদর করলেন। এরপর আরেকবার আমরা ইবরাহিমের কাছে এসে দেখি, সে মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। রাসুল সাঃ এর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। আব্দুর রহমান বিন আওফ তখন বলে উঠলেন, "আপনিও হে আল্লাহর রাসুল?" রাসুল ও উত্তর দিলেন,

"এ অশ্রু রহমতের, হে ইবনে আওফ।"

এরপর রাসুল আবার কাঁদতে থাকলেন। বললেন –

تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ

"চোখগুলো আজ প্রবহমান, অন্তর বেদনাক্লিষ্ট। তবুও আমরা শুধু তা-ই বলব, যাতে খুশি হন আমাদের রব। আল্লাহর কসম, হে ইবরাহিম, আমরা তোমার বিয়োগব্যথায় শোকাহত।"

আনাস রাঃ বলেন –

'রাসুল ছাড়া শিশুদের প্রতি এত বেশি দয়াশীল অন্য কাউকে দেখিনি আমি। রাসুল-এর এক পুত্র ইবরাহিম মদিনার গ্রামাঞ্চলে দুধপানের সময় পার করছিলেন। রাসুল তাকে দেখতে যেতেন। আমরাও তাঁর সাথে থাকতাম। সে বাড়িতে প্রবেশ করে দেখা যেত ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিবেশ। অন্য বর্ণনায় আছে, বাড়িটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। আমি তখন রাসুল-এর সামনে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দুধ-পিতাকে বলতাম, "আবু সাইফ, বন্ধ করো, রাসুল এসেছেন।"

[সহি বুখারি: ১৩০৩, সহি মুসলিম: ২৩১৫]

ইবরাহিমের দুধ-পিতা একজন কামার ছিল। রাসুল তাঁর শিশুপুত্র ইবরাহিমকে তুলে নিয়ে চুমু খেতেন। এরপর ফিরে আসতেন।

ইবরাহিম যখন মারা যায়, তখন রাসুল সাঃ বলেন –

"ইবরাহিম আমার ছেলে। দুধপানের বয়সে সে মারা গেছে। তার জন্য জান্নাতে দুধ-পিতা ও দুধ-মাতা রয়েছে- তারা তার দুধপানের সময়টাকে পূর্ণ করবে"
অর্থাৎ ইবরাহিমের যখন দুধপানের বয়স, তখন সে মারা গেছে। অথবা দুধপান করা অবস্থায় সে মারা গেছে। জান্নাতের দুধ-পিতা ও দুধ-মাতা তাকে দুধপান করিয়ে দুবছর পূর্ণ করবে।

কেননা, ১৬ বা ১৭ মাস বয়সে তার ওফাত হয়ে যায়। তাই বাকি সময়টুকু ওরাই দুধ পান করাবে। কারণ, কুরআনে দুধপানের সময় দুই বছর বলা হয়েছে।

হাদিস থেকে শিক্ষা

ইমাম নববি বলেন: -

"রাসুল-এর মহৎ চরিত্র, শিশু ও দুর্বলের প্রতি তাঁর দয়া-স্নেহের অনুপম এক চিত্র দেখেছি আমরা এ হাদিসে। এ হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে –

শিশু সন্তানের প্রতি দয়া করার ফজিলত। তাদের গালে চুমু এঁকে দেওয়ার ফজিলত।

[ইমাম নববি কৃত শারহু সহিহি মুসলিম: ১৫/৭৬]

সন্তানদের মৃত্যুর পর রাসুল তাদের গোসল, কাফন, জানাজা ও দাফনের তত্ত্বাবধান করতেন। তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন।

উম্মে আতিয়্যাহ আনসারি বলেন, 'রাসুল-কন্যা উম্মে কুলসুমের ওফাতের পর রাসুল আমাদের কাছে এসে বললেন, "তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনে তারও
অধিকবার গোসল করাবে। বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল দাও। এরপর কপূর দিয়ে দেবে।"

[সহি মুসলিম: ২৩১৬]

অধ্যায়-৮: নাতিদের সাথে নবীজির আচরন

নাতিদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ-এর আচরণ পরিবারে উষ্ণ ভালোবাসা আর মমতাঘেরা পরিবেশ সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এতে তাদের মাঝে সুন্দর আখলাক ও মহৎ গুণের বিকাশ হয়। নবীজির নাতিরা এমনই এক অসাধারণ পরিবেশে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছেন। তাঁর কথা ও ব্যবহার থেকে তারা শিখেছেন মানবতার মহৎ গুণাবলি। ইতিহাসের পাতায় তারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের উদারতা ও অবদানের জন্য।

সন্তানের মতো রাসুলুল্লাহ-এর নাতির সংখ্যা ছিল সাত। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ:

১. হাসান বিন আলি: রাসুল-এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল তার। আলি ও ফাতিমা -এর প্রথম সন্তান তিনি। জন্মগ্রহণ করেন তৃতীয় হিজরিতে। আর মৃত্যুবরণ করেন ৪৯ হিজরিতে। রাসুল-এর মৃত্যুর সময় তার বয়স সাত বছরের মতো।

২. হুসাইন বিন আলি: আলি ও ফাতিমা-এর দ্বিতীয় সন্তান। চতুর্থ হিজরিতে জন্ম এবং মৃত্যু একষট্টি হিজরিতে।

৩. উম্মে কুলসুম বিনতে আলি: রাসুলুল্লাহ-এর মৃত্যুর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বিয়ে করেন উমর বিন খাত্তাব। তাদের ঘরে জন্ম নেয় জাইদ ও রুকাইয়া নামে দুজন সন্তান। উম্মে কুলসুম ও তার পুত্র জাইদ ৭৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. জাইনাব বিনতে আলি: রাসুল-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বিয়ে করেন রাসুল-এর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাফর । আব্দুল্লাহর বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জাইনাব ও জাফর-এর সন্তানদের অনেকে বেঁচেছিলেন তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক।

৫. আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আফফান: রাসুল-তনয়া রুকাইয়া-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান হাবশা। ৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. উমামা বিনতে আবুল আস: রাসুল-তনয়া জাইনাব-এর ঘরে জন্ম হয় উমামার। ফাতিমা রাঃ এর মৃত্যুর পর আলি উমামাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাদের কোনো সন্তান হয়নি। আলি মৃত্যুবরণ করার পর মুগিরা বিন নাওফাল তাকে বিয়ে করেন। তাদেরও কোনো সন্তান হয়নি। মুগিরার বিবাহ বন্ধনে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন উমামা।

৭. আলি বিন আবুল আস: উমামা বিনতে জাইনাবের ভাই ছিলেন তিনি। রাসুল-এর জীবদ্দশায় বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। রাসুল-এর সন্তানদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর পর বেঁচেছিলেন কেবল ফাতিমা ।

রাসুলুল্লাহ-এর নাতিদের মধ্যে কেবল বেঁচেছিলেন ফাতিমা রাঃ -এর সন্তানগণ। রাসুলুল্লাহ-এর দুই নাতি হাসান ও হুসাইন-এর মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে তাঁর বংশ। হাসানের বংশধরদের বলা হয় হাসানি আর হুসাইনের বংশধরদের বলা হয় হুসাইনি।

[ইমাম বুখারি আদাবুল মুফরাদে: ৮২৩, ইবনে হিব্বান গ্রন্থে: ৬৯৮৫, ইমাম আহমাদ মুসনাদে: ৭৬৯]

নাতিদের সঙ্গে রাসুল-এর আচরণ ছিল আদর, সোহাগ ও দয়ায় ভরা। তিনি ছিলেন আদর্শ পিতৃত্বের অনুপম নমুনা। নাতিদের সাথে মায়া ও স্নেহভরা ব্যবহারগুলো তাঁর উন্নত মানবিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর অসাধারণ তরবিয়ত ও নিখুঁত তত্ত্বাবধান সব সময় নাতিদের ঘিরে রাখত।

জন্মের পর নাতিদের কানে আযান দেয়া

জন্মের পর নাতিদের কানে আজান দিতেন, যখনই রাসুল-এর কোনো নাতি জন্ম নিতেন, রাসুল তার ডান কানে আজান দিতেন। যাতে শিশুর কর্ণকুহরে গুঞ্জরিত প্রথম শব্দটি হয় মহান রবের বড়ত্ব ও মহত্ত্বব্যঞ্জক আওয়াজ।

আবু রাফি বলেন –

“ফাতিমার যখন সন্তান হলো আমি দেখলাম, রাসুল নামাজের আজানের মতো করে হাসানের কানে আজান দিচ্ছেন।“

[সুনানে আবি দাউদ: ৫১০৫, সুনানুত তিরমিজি: ১৫১৪]

আলিমগণ বলেন –

নবজাতক শিশুর কানে আজান দেওয়া মুসতাহাব। এতে শয়তান বিতাড়িত হয়। আর শিশুর কানে প্রবেশ করা প্রথম শব্দ হয় আল্লাহর জিকির।

ইবনে কাইয়িম বলেন,

'আজান দেওয়ার মাহাত্ম্য আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আজান দেওয়ার কারণে একজন মানুষের কানে প্রবেশ করা প্রথম শব্দ হয় আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের বাণীর। একজন মানুষের কানে প্রবেশ করে ইসলামে প্রবেশ করার শাহাদাহর বাণী। যেন একরকমের তালকিন এটি। দুনিয়াতে আসার সময় তার কানে ইসলামের একটি

শিআরের উচ্চারণ হয়। যেভাবে দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় মানুষের কানে তাওহিদের কালিমার তালকিন দেওয়া হয়।

[তুহফাতুল মাওদুদ: ৩১]

নবজাতক নাতির তাহনিক করা

আজানের পর নবজাতক নারির তাহনিক করতেন তিনি আয়িশা এ বলেন, 'রাসুল সাঃ এর কাছে কোনো - নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসালে তিনি প্রথমে দোআ করতেন শিশুর জন্য, এরপর তাহনিক করতেন।

[সহি মুসলিম: ২৮৬]

তাহনিক হচ্ছে, খেজুর বা খেজুরজাতীয় কিছু চিবিয়ে শিশুর তালুতে ঘস দেওয়া। খেজুর ভিন্ন অন্য মিষ্টি সব্য দিয়ে তাহনিক করলেও সুন্নাত আদায় হবে। তবে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা উত্তম।

[ইমাম নববিকৃতপারছ সরিহিমুসলি১২৪/১৪ :]

তাহনিক করার উপকারিতা –

খেজুরের মিষ্টতা শিশুর জন্য সবচেয়ে ভালো।

তাহনিকের ফলে নবজাতকের শরীরে সুপ্রভার রাখে।

শিশুর শরীর বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

[চিকিৎসাবিজ্ঞান . মুহাম্মদ আলি আল-বার]

তাহনিকের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস- খেজুর বা মিষ্টিজাতীয় কোনো খাবার শিশুর উদরে যাওয়া উচিত। রাসুল এ-এর সুন্নাহ বিবৃত হওয়ার ১৪০০ বছর পর চিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কার কর‍েছে তাহনিকের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা।

সদ্যপ্রসূত শিশু দুকারণে মারা যেতে পারে:

এক, রক্তের মধ্যে সুগার লেবেল। কমে যাওয়া।

দুই, ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে শিশুশরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া।-

গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে, তাহনিকের সময় তালুতে দেওয়া খেজুর চেটে খেতে শিশু যখন জিব ও মুখের হাড়গোড় নাড়ায়, তখন পেশিগুলো শক্তিশালী হয়। ইসলাম ওয়েবে লিখিত আর্টিকেল।

http//www.islamweb.net

আজওয়া খেজুর তাহনিকের জন্য উত্তম ও বরকতময়। কারণ, আজওয়া খেজুর জান্নাত থেকে নাজিল হয়েছে। আবু হুরাইরা ও বলেন, 'রাসুল এ বলেছেন, "আজওয়া জান্নাতের খেজুর। এতে বিষের প্রতিষেধক আছে।

[সুনানে তিরমিজি: ২০৬৬, সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৪৫৫]

নাতিদের আকিকা ও নামকরণ

শিশু নাতিদের আকিকা দিতেন ইবনে আব্বাস বলেন, 'রাসুল হাসান ও হুসাইনের আকিকা দিয়েছিলেন জোড়া জোড়া ভেড়া জবাই করে।

[সুনানুন নাসায়ি: ৪২১৯। হাদিসের মান: সহিহ]

শিশুর জন্মের পর যে পশু জবাই করা হয়, তাকে আকিকা বলে। ছেলে শিশুর জন্য দুটি বকরি। আর মেয়ে শিশুর জন্য একটি বকরি।

ইবনে হাজার বলেন, 'আকিকার অনেক উপকারিতা। আকিকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এতে আছে মর্যাদা ও দয়া। এতে শিশু সন্তানের প্রতি (পিতামাতার) দায় সেরে যায়। এ ছাড়াও আকিকা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও স্থায়ী সুস্থতার কারণ হয় এবং শিশুকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাজত করে।

[তুফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ: ৬৯]

"রাসুল সাঃ আরও বলেন, 'শিশু আকিকার ওপর বন্ধক (দায়বদ্ধ) থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা দিতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে। ৩৬৭ রাসুল তাঁর এক সন্তানের নাম রেখেছিলেন শিশুর জন্মের দিনেই। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'গত রাতে আমার একটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি আমার বাবা ইবরাহিমের নামে।"

[সহি মুসলিম: ৩১২৬]

নাতিরা কোলে পেশাব করলেও রাগতেন না

লুবাবা বিনতে হারিস বলেন, 'একবার শিশু হুসাইন রাসুলুল্লাহ -এর কোলে প্রস্রাব করে দিল। তখন আমি বললাম, "অন্য একটি কাপড় পরে নিন। আপনার এ লুঙ্গিটি আমাকে দিন-আমি ধুয়ে দিচ্ছি।"

রাসুল বললেন, "মেয়ে শিশুর পেশাব লাগলে কাপড় ধুতে হয়। আর ছেলে শিশুর পেশাব লাগলে কাপড়ের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়।

[সুনানু আবি দাউদ: ৩৭৫, সুনানু ইবনি মাজাহ: ৫২২]

আবুস সামহ ও বলেন, 'আমি রাসুল এ-এর খিদমত করতাম। যখন তিনি গোসল করতে চাইতেন, তখন আমাকে বলতেন পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে আড়াল করতাম। একবার হাসান বা হুসাইনকে আনা হলো রাসুল এ-এর কাছে। রাসুল-এর বুকের ওপর পেশাব করে দিল সে। আমি পেশাব ধুয়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলাম।

তখন তিনি বললেন, "মেয়ে শিশুর পেশাব ধুতে হয়। ছেলে শিশুর পেশাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়।

[সুনানে আবি দাউদ: ৩৭৬, নাসায়ি ৩০৪, সুনানু ইবনি মাজাহ: ৫২৬]

আবু লাইলা বলেন, 'একদিন আমি রাসুল-এর কাছে ছিলাম। তাঁর বুক বা পেটের ওপর হাসান বা হুসাইন বসে ছিল। সে পেশাব করতে শুরু করছে দেখে আমরা উঠে তাঁর দিকে গেলাম।

তখন রাসুল বললেন, "তোমরা আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। পেশাব করা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে তোমরা ভয় দেখিও না।"

এরপর পেশাবের ওপর তিনি পানি ছিটিয়ে দিলেন।

[মুসনাদে আহমাদ: ১৮৫৮০]

এ হাদিসগুলোতে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি, নাতিদের প্রতি রাসুল-এর আদর-স্নেহ, ভালোবাসা ও উত্তম তত্ত্বাবধানের অনুপম কিছু চিত্র।

নাতিতের জন্য দোআ

রাসুল সাঃ নাতিদের জন্য দোয়া করতেন, ইবনে আব্বাস বলেন, 'অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে রাসুলুল্লাহ হাসান-হুসাইনের জন্য দোয়া করতেন।

তিনি বলতেন:

أُعِيذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامة

"আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাতের অসিলায় আমি তোমাদের দুজনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রতিটি শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী ও কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারী প্রতিটি চোখ থেকে।"

রাসুল সাঃ আরও বলতেন: "ইবরাহিম এভাবেই ইসহাক ও ইসমাইল-এর জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন।

[সহি বুখারি: ৩৩৭১, সুনানুত তিরমিজি: ২০৬০]

নাতিদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া

নাতিদের মসজিদে নিয়ে আসতেন। আবু বকর রাঃ বলেন, 'একবার রাসুল সাঃ -কে আমি মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। পাশে হাসান বিন আলি। সে একবার মানুষের দিকে তাকায় আবার রাসুল এ-এর দিকে তাকায়।

রাসুল সাঃ তখন বলছিলেন –

"আমার এ নাতি একজন মহান নেতা। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করবেন।“

[সহি বুখারি ২৭১৪]

বুরাইদা বিন হুসাইব বলেন –

“রাসুল সাঃ আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন হাসান ও হুসাইনকে দেখা গেল তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। গায়ে ভাদের লাল জামা। হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করছে, আবার সোজা হয়ে পা ফেলছে। রাসুল ও মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদের কোলে দিয়ে মিম্বারে উঠে গেলেন। এবং বললেন,

আল্লাহ সত্যি বলেছেন –

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

“তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু।"

[সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪: ১৫]

আমি এ দুজনকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না।" এতটুকু বলার পর রাসুল ফিরে গেলেন আবার খুতবায়।

[সুনানু আবি দাউদ ১১০৯, সুনানুত তিরমিজি: ৩৭৭৪, সুনানুন নাসায়ি: ১৪১৩, সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৬০০]

শিশুসুলভ দুর্বলতার কারণে কচি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার এদিকে ঝুঁকে যাচ্ছে তো আবার ওদিকে টলে পড়তে চাইছে। তাই রাসুল তাদের দুজনকে কোলে তুলে নিলেন। আল্লাহ তাআলা রাসুল-কে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন এ পৃথিবীতে। এ ঘটনায় আমরা তারই একখণ্ড চিত্র দেখতে পাই।

[হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানিন নাসায়ি: ৩/১০৮]

নাতিদের দোআ শেখানো

রাসুল সাঃ তাঁর নাতিদের দোয়া শেখাতেন। হাসান ও বলেন, 'রাসুল আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়েছিলেন, সেগুলো আমি বিতরে পড়তাম। বাক্যগুলো হচ্ছে।

اللهم اهدني فيمن هديته ونامي فيمن عافيته وتولي من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وفي شر ما قضيت، فإنك الحي ولا يقضى عليه وإله لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعانيد

"হে আল্লাহ যাদের আপনি হিদায়াত দিয়েছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। যাদের প্রতি আপনি উদারতা দেখিয়েছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের মতো আমাকেও আপনার অভিভাবকত্বে গ্রহণ করে নিন। আমাকে দানকৃত প্রতিটি বস্তুর মাঝে বরকত দিন। আপনার নির্ধারিত অনি অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ, আপনিই নির্দেশ দিতে পারেন, আপনার ওপর কারও নির্দেশ চলে না। আপনি যাকে বন্ধু ভাবেন, সে কখনো অপমানিত হয় না। আপনি কল্যাণময়, আপনার মর্যাদা সুউচ্চ।

[সহি বুখারি ২৭১৪]

সলাতের মাঝে নাতিদের শিশুসুলভ আচরণ সহ্য করা

শাদ্দাদ বলেন –

“রাসুল সাঃ একদিন মাগরিব বা ইশার সময় মসজিদে এলেন হাসান বা হুসাইনকে কোলে করে। তারপর উভয়কে একপাশে রেখে তাকবির হলে নামাজ শুরু করলেন। একসময় সিজদায় গেলেন। কিন্তু আর উঠছিলেন

না তিনি। সিজদা দীর্ঘ হতে দেখে আমি সিজদা থেকে মাথা তুললাম। দেখলাম, রাসুল-এর পিঠে বসে আছে শিশু নাতি। অবস্থা দেখে আমি আবার সিজদায় চলে গেলাম।

নামাজ শেষে মানুষ জন বলল –

"আল্লাহর রাসুল আপনি নামাজে অনেক দীর্ঘ সিজদা করেছেন। আমরা ভেবেছিলাম আপনার কোনো সমস্যা হয়েছিল কিংবা আপনার ওপর ওহি নাজিল হচ্ছিল।"

রাসুল জবাব দিলেন, "এমন কিছুই হয়নি। বরং আমার সন্তানটি পিঠে চড়ে বসে। তাই আমি দ্রুত উঠতে চাইনি। চাইছিলাম, সে তার খেলা শেষ করুক এরপর সিজদা থেকে উঠি।"

[সুনানে নাসায়ি: ১১৪১]

নাতিদের দুষ্টমিতে বিরক্ত হতেন না

আবু হুরাইরা বলেন –

“একবার আমরা রাসুল-এর পেছনে ইশার নামাজ পড়ছিলাম। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, হাসান-হুসাইন সাথে সাথে লাফ দিয়ে তাঁর পিঠে চড়ে বসত। তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন, তখন তাঁর পিঠ থেকে আস্তে করে তাদের নামিয়ে রাখতেন। এভাবে রাসুল সিজদায় গেলে, তারা আবারও তাঁর পিঠে চড়ে বসত, আর তিনি তাদের নামিয়ে রাখতেন। নামাজ শেষে তিনি তাদেরকে উরুর ওপর বসিয়ে নিলেন। তখন আমি এগিয়ে এসে বললাম, "আল্লাহর রাসুল, আমি কি তাদের ঘরে দিয়ে আসব?" সে সময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকের শব্দ শোনা গেল

তখন বললেন –

"তোমরা মায়ের কাছে যাও।" তারা মায়ের কাছে আগ পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকের আলো থেমে ছিল।

[মুসনাদে আহমাদ: ১০২৮১]

আবু বাকরা বলেন, '

একদিন রাসুল নামাজ পড়ছিলেন। দি সিজদায় যেতেন হাসান তাঁর পিঠে-কাঁধে উঠে পড়তেন। তখন ধীরে ধীরে সিজদা থেকে উঠতেন, যাতে হাসান পড়ে না যায়। এবসেসনান এমনটা করলেন তিনি। নামাজ শেষে লোকেরা রাসুল-এর কাছে জানতে চাইলেন, 'আধাস রাসুল, আমরা দেখলাম আপনি হাসানকে নিয়ে এমন কিছু করলেন, আগে কখনো করেননি।" রাসুল উত্তর দিলেন, "হাসান দুনিয়ায় আমার সুগন্ধময় ফুল। আমার সন্তান একজন নেতা। আশা করি, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিমদে দুটি দলের মধ্যকার বিভেদ মিটিয়ে দেবেন।"

[মুসনাদে আহমাদ: ১৯৯৯৪]

নাতি-নাতনিদের সাথে তাঁর আচরণের ভিত্তি ছিল দয়া ও স্নেহ।

নাতিদের কাঁধে নিয়ে আদর করতেন

আবু হুরাইরা বলেন, 'একবার রাসুল আমাদের সামনে এলেন। তখন তাঁর এক কাঁধে হাসান। অন্য কাঁধে হুসাইন। তিনি একবার হাসানকে চুমু দেন, তো আবার হুসাইনকে চুমু দেন। এভাবে তিনি আমাদের কাছে এসে পড়লেন।

তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "আল্লাহর রাসুল, আপনি তাদের দুজনকে ভালোবাসেন।" রাসুল বললেন, "যে এ দুজনকে ভালোবাসল, সে আমাকে ভালোবাসল। আর যে এ দুজনের প্রতি রাগান্বিত হলো, সে আমার প্রতি রাগান্বিত হলো। "

[সুনানু ইবনি মাজাহ ১৪৩, মুসনাদু আহমাদ: ৯৩৮১]

সলাতের সময় নাতিদের মধ্যে কাউকে কাঁধে উঠানো

সলাতের সময় তাদের কাউকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন আবু কাতাদা আনসারি বলেন, 'আমি দেখলাম, রাসুল মানুষদের সাথে নামাজে ইমামতি করছেন। আবুল আস ও রাসুল-কন্যা জাইনাবের মেয়ে, রাসুলের নাতনি উমামা তখন রাসুলের কাঁধে। রাসুল যখন রুকুতে যেতেন, তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন সিজদায় যেতেন, তাকে উঠিয়ে নিতেন।

[সহি বুখারি: ৫১৬, সহি মুসলিম ৫৪৩]

নাতিদের জন্য বিশেষ উপহার

উপহারের একটি অংশ নাতিরাও পেত উপহার মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। বিশেষ করে শিশুদের মনকে আনন্দে বিহ্বল করে তোলে। রাসুল -এর কাছে উপহার এলে তিনি উপহারের একটা অংশ নাতিদের দিয়ে দিতেন।

আয়িশা বলেন, 'নাজ্জাশির কাছ থেকে রাসুল-এর জন্য কিছু অলংকার উপহার আসলো। অলংকারের মধ্যে একটি সোনার আংটি ছিল। আংটিতে একটি হাবশি পাথর বসানো। রাসুল অন্যদিকে ফিরে কাঠি বা তাঁর আঙুল দিয়ে আংটিটি তুলে ধরলেন। এরপর আবুল আস ও জাইনাবের ঘরের রাসুলের নাতনি উমামাকে ডাক দিয়ে বললেন, "প্রিয় কন্যা, এটি পরো।"

[সুনানু আবি দাউদ: ৪২৩৫, সুনানু ইবনি মাজাহ ৩৬৪৪]

নাতিদের সাথে হাসাহাসি ও খেলাধুলা করতেন

শিশুদের সাথে হাসাহাসি ও খেলাধুলা করতেন সাইদ বিন আবু রশিদ বর্ণনা করেন –

ইয়ালা বিন মুররা তাকে বলেন, “একবার তারা নবিজি সাঃ -এর সাথে খাওয়ার দাওয়াতে বের হলেন। তখন হুসাইন সরু গলির মধ্যে খেলছিলেন। রাসুল তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালেন। কিন্তু হুসাইন এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছিল। রাসুল তাকে হাসাতে হাসাতে ধরে ফেললেন। তার চোয়ালের নিচে এক হাত রেখে, আরেক হাত তার মাথার পেছনে রেখে তাকে চুমু খেলেন এবং বললেন –

"হুসাইন আমার থেকে। আমি হুসাইনের থেকে। যে হুসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন একাই একটি জাতি।"

[সুনানে ইবনি মাজাহ: ১৪৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকারে এসেছে-সুনানে তিরমিজি: ৩৭৭৫]

"হুসাইন আমার থেকে। আমি হুসাইনের থেকে।" অর্থাৎ আমাদের এমন গাঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান যে, আমাদের একজন অন্যজনের অংশ বললে অত্যুক্তি হবে না। "হুসাইন একাই একটি জাতি।"

অর্থাৎ কল্যাণজনক দল। যারা কল্যাণের কাজ করবে। রাসুল-এর এ কথাটি ইঙ্গিত করে যে, হুসাইনের মাধ্যমে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠবে। তার সন্তানসন্ততি অনেক হবে। তার বংশধর অনেক হওয়ার সাথে সাথে দীর্ঘস্থায়ী হবে তার বংশধারা। আর বাস্তবেই এমনটি হয়েছে।

[তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/১৭৮]

নাতিদের বুকে জড়িয়ে চুমু খাওয়া

রাসুল তাঁর নাতিদের বুকে জড়িয়ে চুমু খেতেন। আবু হুরাইরা বলেন,

“রাসুল সাঃ হাসান বিন আলিকে চুমু খেলেন। তখন পাশে বসা আকরা বিন হাবিস বলল, "আমার দশজন সন্তান। কখনো আমি তাদের কাউকে চুমু দিইনি।" রাসুল আকরার দিকে তাকিয়ে বললেন,
"যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।“

[সহি বুখারি: ৫৯৯৭, সহি মুসলিম ২৩১৮]

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার বলেন, 'আকরা এ-এর প্রতি বলা রাসুল এ-এর কথার মধ্যে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শিশুদের চুমু খাওয়া স্নেহ, দয়া ও ভালোবাসার পরিচয়। অনুরূপভাবে শিশুদের বুকের সঙ্গে লাগানো, তাদের ঘ্রাণ নেওয়া ইত্যাদিও স্নেহের নিদর্শন।

[ফাতহুল বারি: ১০/৪৩০]

নাতি হাসান রাঃ এর ঠোঁটে চুমু খেতেন, মুআবিয়া বলেন, 'আমি দেখলাম, রাসুল হাসানের জিহ্বা বা ঠোঁটে চুমু দিচ্ছেন। আর সে জিহ্বা বা ঠোঁট কখনো আজাব প্রাপ্ত হবে না, যেটাতে রাসুল চুমু খেয়েছেন।"

মুসনাদু আহমাদ: ১৬৪০৬

নাতির মুখ থেকে লালা ঝরলে অস্বস্তি বোধ করতেন না

আবু হুরাইরা বলেন, 'আমি দেখলাম, নবিজি হুসাইনকে কাঁধে বহন করে আছেন। ওদিকে হাসানের মুখের লালা ঝরছে তাঁর গায়ে।

[সুনানু ইবনি মাজাহ: ৬৮৫, হাদিসের মান: সহিহ]

নাতিদের জন্য রহমতের দোয়া করতেন

তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতেন উসামা বিন জাইদ বলেন – "রাসুল আমাকে উঠিয়ে তাঁর এক উরুর ওপর বসাতেন। অপর উরুতে বসাতেন হাসানকে। এরপর উভয়কে জড়িয়ে ধরে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আপনি এ দুজনের ওপর রহম করুন, কারণ আমি এ দুজনকে ভালোবাসি।"

[সহি বুখারী: ৬০০৩]

নাতিদের নিয়ে বাহনে চড়া

নাতিদের নিয়ে বাহনে চড়তেন আব্দুল্লাহ বিন জাফর বলেন, 'রাসুল সফর থেকে ফিরে এলে পরিবারের শিশুদের মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানানো হতো। একবার তিনি সফর থেকে ফিরলে আমাকে এগিয়ে দেওয়া হলো স্বাগত জানানোর জন্য। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে নিলেন বাহনে। এরপর ফাতিমার কোনো এক ছেলে আসলে তাকে পেছনে বসিয়ে নিলেন।"

[সহি মুসলিম: ২৪২৮]

ইয়াস থেকে বর্ণিত আছে, তার পিতা সালামাহ বলেন, “রাসুল-এর সাদা খচ্চরটির ওপর রাসুল নিজে এবং তাঁর দুই নাতি হাসান-হুসাইন বসা ছিলেন। আমি খচ্চরকে টেনে তাঁর ঘরে প্রবেশ করালাম। তখন হাসান-হুসাইনের একজন তাঁর সামনে আরেকজন তাঁর পেছনে বসা ছিল।“

[সহি মুসলিম: ২৪২৩ সহিহু মুসলিম: ২৪২৩]

ছোটবেলা থেকেই নাতিদের হারাম বর্জনে নবীজির শিক্ষা

ছোটবেলা থেকেই নাতিদের হারাম বর্জনের শিক্ষা দিতেন আবু হুরাইরা বলেন, 'হাসান বিন আলি সাদাকার খেজুর হতে একটি খেজুর তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন। সাথে সাথে নবিজি "কাখ, কাখ" বলে উঠলেন যেন হাসান খেজুরটা ফেলে দেয় মুখ থেকে।

এরপর বললেন, "তুমি কি জানো না যে, আমরা সাদাকা খাই না?"

[সহি বুখারি: ১৪১৯, সহি মুসলিম: ১০৬৯] '

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, শিশুদের উপকারী কথা ও কাজ শেখাতে হবে। ছোট থেকেই হারামের মতো ক্ষতিকর কথা ও কাজ করতে নিষেধের শিক্ষা দিতে হবে।

[ইমাম নববিএ কৃত শারহু সহি মুসলিম: ৭/১৭৫, ফাতহুল বারি: ৩/৩৫৫]

অধ্যায় – ৯: নবীজির জীবন সঙ্গীনি - উম্মুল মুমিনিনদের পরিচয় ও বৈবাহিক জীবনের গল্প

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনিন। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন পূতপবিত্র। তারা ছিলেন পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ নারী। তারা ছিলেন মাগফুর; তাদের ছোটবড় সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা।

কুরআনে কারিমে বর্ণিত –

-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تظهيرا

"হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।"

[সুরা আহজাব- ৩৩:৩৩]

তদুপরি আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের গৃহকে 'ওহির' অবতরণস্থল' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যা তাদের মর্যাদাকে শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

এরশাদ হয়েছে-

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং হিকমতের (হাদিসের) কথাসমূহ, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, সেগুলো তোমরা স্মরণ রাখো। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত।

[সুরা আহজাব- ৩৩:৩৪]

এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত জানা যতটা জরুরি, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ উম্মুল মু'মিনিনদের জীবনী জানা।

প্রিয় নবিজি সাঃ এগারো জন স্ত্রীদের পরিচয় ও বৈবাহিক জীবনের সংক্ষিপ্তরূপ -

উম্মাতুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ রাঃ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন –

একদিন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন-

“ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই যে, খাদিজা আপনার জন্য পাত্রে করে তরকারি, খাদ্যসামগ্রী অথবা কিছু পানীয় নিয়ে এসেছেন। আপনি তাকে তার প্রতিপালক ও আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আর জান্নাতে মণিমুক্তার তৈরি একটি প্রাসাদের সুসংবাদ জানাবেন।“

[সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৮২০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪৩২]

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবীজির প্রথম ভালোবাসা। মা খাদীজা (রাঃ) ছিলেন নবী সহধর্মিণীদের মধ্যে সর্বপ্রথমা ও সর্বশ্রেষ্ঠা, জান্নাতী মহিলাদের প্রধান হযরত ফাতিমাতুয যাহ্‌রার মহীয়সী মাতা। নবী মুহাম্মাদ সাঃ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর এই মহীয়সী নারী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই একমাত্র মহিলা যাঁকে দুনিয়া থেকেই জান্নাতের খোশ খবর জ্ঞাপন করা হয়েছিল। জাহেলী যুগের কোন প্রকার অন্যায় বা পাপ তাকে স্পর্শ করেনি বিধায় বাল্যকালেই তিনি ‘তাহেরা বা পবিত্রা’ উপাধিতে ভূষিতা হয়েছিলেন এবং এই নামেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন পরিচিতা ও খ্যাতনামা।

রূপে-গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নবিজির সন্তানদের মাতা। মহীয়সী ফাতিমা, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম, জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মাতা। নবীজির বংশধারা চালু রেখেছেন তিনিই। তাই তিনি অনন্যা। নবীজির সকল সঙ্গিনীর মাঝে অদ্বিতীয়া তুলনারহিতা। সতী-সাধ্বী ও পতিব্রতা এই বিদুষী মহিলার গুণাবলী বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

খাদিজা রাঃ আনহার কুরবানির ইতিহাস খুবই দীর্ঘ ও উদ্দীপ্ত। নবুওয়াতের পরিচিহ্ন মানবসমাজের সামনে উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বেই তিনি চিনেছিলেন নবুওয়াতের শেষ সূর্য মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। ব্যবসার পর বিবাহের মাধ্যমে নিজেকে নবীজির যোগ্য সাথি করেছিলেন তিনি। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ, বিত্তবৈভব কুরবান করেছিলেন নবীজির সেই দাওয়াহ'র কাজে। সাহস জুগিয়েছেন নবীজির বিপদাপদে, সংশয়ে-সংকটে, দিয়েছেন নিঃসীম সান্ত্বনা।

নাম, জন্ম ও বংশ

হস্তী বর্ষের ১৫ বছর পূর্বে ৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হযরত খাদীজা (রাঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কুনিয়াত উম্মে হিন্দ ও লকব ছিল ত্বাহেরাহ। পিতা ছিলেন খুওয়ালিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্‌যা বিন কুছাই। তিনি কেবল একজন

সফল ব্যবসায়ী ছিলেন না বরং তার বিশ্বস্ততা, গাম্ভীর্য, সাহস আর দূরদর্শিতার কারণে সমগ্র কুরাইশের মধ্যে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। মাতা ফাতিমা বিনতে যায়েদা আমের বিন লুআই-এর বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে বহু গুণ সম্পন্না ছিলেন, তার কন্যা খাদীজার (রাঃ) অনন্য সাধারণ গুণবত্তা থেকে তা অনুমান করা যায়

ব্যাবসার পথে খাদিজা রাঃ

খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদের কপাল মন্দ। একটি পুত্রসন্তানও জীবিত নেই তার। হিজাম মারা গেছে অনেক আগে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু হজরত সাফিয়া বিনতু আবদিল মুত্তালিবকে বিবাহ করেছিলেন আওয়াম। আওয়ামও মারা গেছে কিছু দিন হলো।

এজন্য চিন্তায় পড়ে যান বৃদ্ধ খুওয়াইলিদ। দিন যায়, রাত আসে। রাত যায়, দিন আসে। সময়ের সবধরনের পালাবদল লক্ষ্য করেন তিনি; কিন্তু চিন্তা শেষ হয় না তার। কী হবে তার বিশাল বাণিজ্য বহরের? এভাবেই ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু? চিন্তায় সারা হয়ে যান তিনি; তবে কোনো কূল-কিনারা হয় না।

খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদ এখন বৃদ্ধ। অথচ তার ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ বিস্তৃত। একসময় সবকিছু নিজেই দেখতেন। অত্যন্ত সহজে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতেন; কিন্তু এখন বয়স ভারী হয়েছে, তাই ব্যবসার ভার বহন করতে পারেন না। ব্যবসার এ সব ঝুট-ঝামেলা ক্লান্তিকর মনে হয় তার কাছে। সবকিছু সুন্দরভাবে পেরে উঠেন না আগের মতো সুষ্ঠু নিয়মে।

তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন রমণী হলেন খুওয়াইলিদ কন্যা খাদিজা। সবসময় পিতার কাছে কাছে থেকেছেন। বাণিজ্য ব্যবস্থাপনাকে কী করে সুন্দর ও সচল রাখতে হয় সে বিদ্যা বস্ত করেছেন ভালো করেই। সেই বাল্যকাল থেকে পিতার বাণিজ্য নীতি ও কর্মচারী পরিচালনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

খুওয়াইলিদ ইবন আসাদও বিষয়টি জানতেন। এজন্য পুত্রের স্থানে কন্যার পাশে থাকাকে তিনি অন্যান্য আরবের মতো অভিশাপ মনে করেননি; বরং আশীর্বাদ হিসেবেই দেখেছেন। কারণ, কন্যা হলেও তার মধ্যে সাহসিকতা ও শৃঙ্খলার ছাপ সুস্পষ্টভারে দেখতে পেয়েছিলেন পিতা খুওয়াইলিদ।

এজন্য আর বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে গেলেন না খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদ। দেরি করলেন না একটুও। বুদ্ধিমতী, বিদুষী কন্যা খাদিজার কাঁধে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত ভার অর্পণ করে নিজে চলে গেলেন অবসরে। এভাবে নিজের বোঝা কন্যার উপর চাপিয়ে উপভোগ করতে চাইলেন শেষ জীবনটাকে। বেছে নিলেন নির্জনতাকে।

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ ঘরনি থেকে হয়ে গেলেন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। তাতে কী হবে? একটুও ঘাবড়ালেন না এই রমণী। বিব্রত হলেন না মোটেও; এগিয়ে যেতে লাগলেন তীব্র গতিতে। সফলতার পথে। বরং অনেক ক্ষেত্রে পিতার চেয়েও লাভবান মনে হতে লাগল তাঁকে।

দিনে দিনে ব্যবসার পরিধি বাড়তে লাগল খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদের। দিন যায়, রাত আসে। রজনি শেষ হয়ে দিবস দেখা দেয়। বেড়ে যেতে লাগল বাণিজ্যকর্মীর বহর। তারাও প্রীত ও তুষ্ট হতে লাগল তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সদয় ব্যবহার দেখে। এজন্য তাঁর ব্যবসাও বাড়তে লাগল গাণিতিক হারে।

১ম ও ২য় বিবাহের যাত্রা

আসলে কপালে যা লেখা থাকে তাই হয়। জোর করে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। শত চেষ্টায়ও ফল মিলে না কপালে না থাকলে। এখানেও হলো এমনই কাণ্ড। খুওয়াইলিদ মনে মনে হাজারবার চেয়েছিল যে, জামাই হবে তার মনের মতো; কিন্তু তার আশা পূরণ হলো না। অতএব খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদের বিয়ে হলো না তাওরাত ও ইনজিলের আলিম ওয়ারাকা ইবনু নওফেলের সঙ্গে।

অবশ্য বিবাহ নিয়ে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়পক্ষের আগ্রহের কমতি ছিল না বিন্দু পরিমাণ। মতবিনিময়ও চলেছিল কিছুকাল ধরে। তারপর কী এক অজ্ঞাত কারণে সে বিয়ে হয়নি। অভিভাবকগণ খুব বেশি চিন্তিত হলেন না। কারণ, সবার বিশ্বাস ছিল যে, এমন সুপাত্রীর জন্য পাত্রের অভাব হবে না।

অবশেষে খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। তার পাশে বর হিসেবে বসার সৌভাগ্য অর্জন করলেন মক্কার বিখ্যাত ব্যক্তি আবু হালা হিন্দা ইবনু সুরারা আত-তামিমি। তাওরাত ও ইনজিলের আলিম ওয়ারাকা ইবনু নওফেলের মতো না হলেও সবাই মেনে নিল আবু হালাকে।

তাহিরা খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ সংসার জীবনে প্রবেশ করলেন। এখন তিনি সফল ও যত্নশীল ঘরনি। তার ঘরটি যেন হয়ে উঠেছে মক্কার শ্রেষ্ঠঘর। স্বর্গের ছায়া এসে পড়েছে খাদিজা-আবু হালা হিন্দা ইবনু সুরারা আত-তামিমির ছোট্ট কুটিরে। হাসি-আনন্দে কেটে যাচ্ছে তাদের মধুর সময়গুলো।

তাহিরা খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ একসময় মাতা হলেন দুই সন্তানের-

এক ছেলে ও এক মেয়ে। নাম হিন্দা ও হালা।

শিশু বয়সেই ইন্তিকাল করেন হালা। আর হিন্দা বেঁচে ছিলেন বহুদিন। ইসল প্রচারের শুরুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। লাভ করেছিলেন সম্মানিত সারদি মর্যাদা। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরও জীবিত হিচ্ছে তিনি। শেষে শহিদ হয়েছিলেন জামাল যুদ্ধে। বীরশ্রেষ্ঠ হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনন্দ পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে।

সুখ বেশিদিন সইল না তাহিরা খাদিজা বিনত খুওয়াইলিদের কপালে। সংসার তেন্দ্র গেল অল্প কয়েক বছরের মধ্যে। কারণ, স্বামীর মত্যজনিত কারণে বিধবা গান্ড তিনি। শিা বৈধব্যের বিষণ্ণতায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন তাহিরা। তবে কপালের লিখনাও মেনে নিলেন নীরবে। জীবনের অভিঘাতসমূহকে বেষ্টন করে বয়ে চলল তার সমা রাত-দিন। রজনি-দিবস।

এভাবেই তো এগিয়ে চলে মানবজীবন। সুতরাং তাহিরা খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদে জীবনও এগিয়ে যেতে লাগল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সময়কে পেছনে ফেলে চলার লাগলেন সামনের দিকে। কারণ, যারা অতীতমুখী হয়ে পেছনে পড়ে থাকে, তাজ কিছুতেই সফল হতে পারে না।

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদের জীবনেও একসময় অশান্ত শোক-দুঃখ মিলিয়ে গেজ অজানা ও দূরবর্তী স্মৃতিময় কোনো এক অতীতে। তার জীবনধর্মের রুটিনে ফিরে এসে স্বাভাবিকতা। গতিময় হতে শুরু করল, তার দৈনন্দিন কাজকর্ম। মেঘের আড়াল থেরে ধীরে ধীরে উঁকি দিতে লাগল আলোকিত সূর্য।

তাহিরা খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ তখনও যৌবনবতী। তদুপরি বিদুষী, সতী-সাধী বিত্তবান ব্যবসায়ীর কন্যা। পুনবিবাহের প্রস্তাব আসতে লাগল বিভিন্নজনের কাছ থেকে একে একে অনেকগুলো জমা হলো এই তালিকায়। কোনোটার চেয়ে কোনোটা কম নয়। ভালো থেকে আরও ভালো।

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করলেন। অভিভাবকরাও মেনে নিতে আরম্ভ করলেন তার সিদ্ধান্ত। এভাবে স্থিরও রইলেন কিছুদিন। তবে শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল ব্যতিক্রম কিছু। কী মনে করে যেন নতুন বিয়েতে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। সম্মতি দান করলেন বুদ্ধিদীপ্ত ও বিচক্ষণ আতিক ইবনু আবিদের প্রস্তাবে।

শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো যথাসময়ে। কিন্তু তার এ সংসারও ভেঙে গেল অল্প কিছুদিনের মধ্যে। এমনকি, এই ঘরে তার কোনো সন্তানাদিও হলো না। এর আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল আতিক ইবনু আবিদের সঙ্গে।

[সিয়ারু আলামিন-নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১১]

এরপর আরও অনেক বিবাহের প্রস্তাব পেলেন খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ। কিন্তু আর কোনো প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। পরপর দুটি সংসার ভেঙে যাওয়াতে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবছিলেন হয়তো। এই ভাবনায় হয়তো সংসারের প্রতি কিছুটা অনাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রবীণা রমণীদের মতো কাটিয়ে দেবেন বাকি জীবন। নিজেকে ধর্ম-কর্মে নিমজ্জিত রাখতে চাইবেন সারাক্ষণ।

[সিয়ারু আলামিন-নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১১।] আল ইসাবা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৮১। আনসাবুল আশরাফ খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৭]

মহা সাফল্যের পথে

ইয়েমেন ও সিরিয়া ছিল তখনকার প্রধান দুটি বাণিজ্য কেন্দ্র। উভয় কেন্দ্রেই খাদিজা বিনত খুওয়াইলিদ মহাসমারোহে ব্যবসা করতে লাগলেন। দিন দিন তার সততা, ন্যয়পরাণতা ও সদয় আচরণের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবখানে। সব মানুষের কানে কানে। সবাই মুগ্ধ হতে লাগল অমায়িক তার ব্যবহারে। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল তার ব্যবসায়িক কৌশল দেখে।

তখন কুরাইশ দলপতি ছিলেন জনাব আবু তালিব। তিনিও ছিলেন একজন নামকর ব্যবসায়ী। এমনকি, তাকে গণ্য করা হতো মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের একজন হিসেবে। তবে আবু তালিব একপর্যায়ে লক্ষ্য করলেন খুওয়াইলিদ কন্যা খাদিজা পিতার চেয়েও বেশি বুদ্ধিমতী। তার সঙ্গে পেরে উঠছে না কেউ।

সুতরাং তার বাণিজ্যের বিস্তৃতি অল্প দিনেই আবু তালিবকে ছাড়িয়ে যেতে চলেছে। এমনকি, এতদিনে খাদিজার একার পণ্য কুরাইশদের অন্য সব ব্যবসায়ীর পণ্যের সমান হয়ে গেছে।

আসলেই ব্যবসা অনেক বেড়েছে খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদের। বর্তমানে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তিনি একা আর সামলাতে পারছেন না। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে স্থির করলেন, একজন সহযোগী নিতে হবে। এজন্য তিনি অংশীদারী বা মজুরির বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করলেন, যারা দেশ-বিদেশে পণ্য কেনাবেচা করতে লাগল খাদিজার পণ্য।

কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতেও বিপত্তি আসতে লাগল বিভিন্ন দিক থেকে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য দরকার সততা, পরিশ্রম ও আমানতদারি। অবশ্য এমন লোকের অভাব ছিল সর্বযুগেই। এখনও আছে। হয়তো থেকেই যাবে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত। এ অভাব পূরণ হওয়ার নয় কোনোকালেই।

[সিয়ারু আলাদিন দুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪২]

প্রিয় নবীজির সাথে সাক্ষাৎ

মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আবু তালিব ইবনু আবদিল মুত্তালিব। অবশ্য এখন তিনি আর খাদিজার মতো এত বড় ব্যবসায়ী নন। তবে স্বচ্ছ-সুন্দর ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম আছে তার। ব্যবসায়িক কাজে মাঝেমধ্যে সফর করতেন সিরিয়াতে। উঁচু ব্যাক্তিত্ববোধের কারণে সম্মান পেতেন সবখানে।

কখনও কখনও সঙ্গে নিতেন একান্ত আদরের ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহকে। এতিম ছেলে। জন্মের আগেই পিতা ইন্তিকাল করেছেন। মাকেও হারিয়েছেন শৈশবকালে। মাত্র ছয় বছর বয়সে। তবে দুধমাতা হালিমা সাদিয়ার কাছ থেকে অর্জন করেছেন অনেক কিছু। সুন্দর, সাবলীল ও শুদ্ধ ভাষাভঙ্গিমা। আর চমৎকার বাগ্মিতা এর মধ্যে অন্যতম।

আবু তালিবের পিতা আবদুল মুত্তালিব পরপারে পাড়ি জমানোর সময় দায়িত্বশীল পুত্র আবু তালিবের হাতে দিয়ে যান এই এতিম ছেলেটির দেখভালের দায়িত্ব। তিনিও প্রগাঢ় মমতায় লালন পালন করতে থাকেন বিশ্বস্ত ভাতিজাকে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখেন। আদর-আত্তির কোনো কমতি নেই চাচার ঘরে।

আরবে ঐ সময় লেখাপড়ার কোনো রেওয়াজ বা প্রচলন ছিল না। এজন্য লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি আবু তালিবের ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহর। এদিকে ঐ সময়ের অভিজাত পেশা ছিল ব্যবসা। এর মধ্যে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা ছিল সবার ওপরে। আরবের উচ্চবংশীয় লোকেরা এই ব্যবসাই করতেন।

স্নেহশীল চাচা আদরের ভাতিজাকে বানাতে চেয়েছেন সফল ব্যবসায়ী। এজন্য সবসময় এবং সবকাজে সঙ্গে রাখেন তাঁকে। তিনিও চাচার সঙ্গে মিলেমিশে বিভিন্ন কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছেন সমানতালে। এভাবেই ধীরে ধীরে যুবক বয়সে উপনীত হয়েছেন তিনি।

[ওয়াকফাতুত তারবিয়্যাহ মাআস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, আহমাদ ফরিদ, পৃষ্ঠা: ৫৩]

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ তখনও ছিলেন চাচার সঙ্গে। হঠাৎ আরবে দেখা দিলো ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এতে অল্প মূলধনের ব্যবসায়ীরা পড়ে গেলেন মহাবিপাকে। হয়তো এই কারণেই বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূলধন সংকটে পড়ে গেলেন আবু তালিব। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি ভাতিজাকে ডেকে বললেন-মুহাম্মাদ, অবস্থা তো বুঝতেই পারছ, এবার একটা কাজকর্ম গ্রহণ করতে হয়।

ছোটবেলা থেকেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিচক্ষণ পুরুষ। তাই চাচার কষ্ট তিনি উপলব্ধি করেছেন আগ থেকেই। অপেক্ষা করছিলেন এমন একটি প্রস্তাবের। যাতে নিজ হাতে কামাই-উপার্জন করে চাচার সংসারের জোয়াল কিছুটা হলেও নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া যায়।

চাচার সঙ্গে ব্যবসা করে এতদিনে ব্যবসার হাত পাকা করে করে ফেলেছেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্যান্য কাজেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন প্রচুর পরিমাণ। পরিবেশ এমন যে, তাঁর সততা ও আমানতদারির সুনাম তখন সবার মুখে মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। এমনকি, সবার কাছে তিনি 'আল আমিন' নামে পরিচিতি লাভকরেছেন।

খাদিজাও হয়তো শুনে থাকবেন তাঁর কথা। হ্যাঁ, শুনবেন। কারণ, তার ভাই আওয়ামের বউ হলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু হজরত সাফিয়া বিনতু আবদিল মুত্তালিব। তিনি মহাবীর হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বড় বোন। হামজা হলেন নবিজির খেলার সাথি ও দুধভাই। সুতরাং তাঁর খবর পৌঁছতেই পারে খাদিজার কানে।

এদিকে চাচার কথা মতো একটি কর্ম খুঁজতে লাগলেন নবিজি। জানতে পারলেন, মক্কার সফল ব্যবসায়ী খাদিজার কাছে কর্ম আছে; কিন্তু উপযাজক হয়ে কর্মের আবেদন জানাতে সংকোচ বোধ করলেন তিনি। কারণ, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ববোধের অধিকারী।

রাসূল সাঃ বলেছেন-

আমি অধিক ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন। আর আল্লাহ তাআলা আমার থেকেও অধিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

[সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৮৪৬]

একদিন আবু তালিবের বাড়িতে উপস্থিত হলেন তার বোন আতিকা বিনতু আবদিল মুত্তালিব। দেখলেন তার ভাই ভীষণ চিন্তিত। বোনেরা কখনও ভাইয়ের কষ্ট সহ্য করতে পারে না। তাই জিজ্ঞেস করলেন চিন্তার কারণ। আবু তালিব বললেন নিজের জন্য না, মুহাম্মাদের উপার্জনের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এই নিয়ে আমি চিন্তিত।

ফুফু আতিকাও পিতৃমাতৃহীন ভাতিজা মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসতেন গভীরভাবে। তিনি জানতে পেরেছিলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য একজন ব্যবস্থাপক খুঁজে চলেছেন অনেকদিন ধরে। ভেবে দেখলেন, খাদিজার বাণিজ্য বহরই সবচেয়ে বড়। লোক হিসেবেও যথেষ্ট ভালো তিনি। বলতে গেলে তুলনাহীন।

তাই আর দেরি করলেন না। সোজা চলে গেলন খাদিজার বাড়িতে। খাদিজা যেন এমন একজন মেহমানের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ, আতিকা হলেন মক্কার সরদার আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। তাই সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে। কুশল বিনিময়ের পর মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু হলো দুজনের মাঝে। খাদিজা বললেন-আমি তো ঐ যুবকের কথা অনেক শুনেছি। লোকে যাকে আল আমিন (বিশ্বাসী) বলে ডাকে। আপনার প্রস্তাব আমি সাদরে গ্রহণ করলাম।

খাদিজা রাঃ সিরিয়ায় বাণিজ্য বহর প্রেরণের জন্য এমন একজন বিশ্বস্ত লোককেই খুঁজে ফিরছিলেন মনে প্রাণে। অবশ্য আবু তালিব মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিরিয়ায় যাওয়াকে পছন্দ করতেন না। কারণ, ইহুদিদের পক্ষ থেকে তাঁর জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করতেন।

বিষয়টি খাদিজার কানে গেল। তিনি ছিলেন পাক্কা ব্যবসায়ী। তাই পৃথিবী সেরা এ বিশ্বস্ত লোকটি পাওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন একটু ভিন্ন কৌশলে। জানালেন অন্য লোক আপনাকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেবে, আমি আপনাকে তার চেয়ে দ্বিগুণ দেবো। [২৮]

খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদের বিশ্বস্ততা নিয়েও কারও কোনো কথা ছিল না। তাই সবদিক বিবেচনা করে আবু তালিবও রাজি হয়ে গেলেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো চাচার অনুমোদনের অপেক্ষায়ই ছিলেন।

নিয়োগ লাভের পর জনাব আবু তালিব আদরের ভাতিজাকে ডেকে বললেন-এটা তোমার প্রতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটি অনুগ্রহ।

সেদিনই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাফেলার দায়িত্বভার বুঝে নিলেন। সাক্ষাৎ করলেন খাদিজা তাহিরার সঙ্গে। প্রথম দর্শন দুজনার। এতেই মুগ্ধতা ছেয়ে গেল একে অন্যের প্রতি। ভালোলাগার পরশ ছড়িয়ে পড়ল দুজনার মাঝে। কাছাকাছি হলো-শুভ্র, শুদ্ধ দুটি হৃদয়। আল আমিন ও তাহিরা।

দায়িত্বসচেতনে রমণী খাদিজা রাঃ

আলাপ আলোচনা করে ঠিক করা হলো সবকিছু। পরদিন শুভযাত্রা। খাদিজা চিন্তা করলেন, আল আমিন একা গেলে কষ্ট হবে তাঁর। এজন্য বিশ্বস্ত গোলাম মাইসাবাকে!») তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সেবা ও সহযোগিতার জন্য। এভাবেই পেশ করলেন তাঁর মমতাময়ী হৃদয়ের প্রথম নিবেদন।

যাত্রাকালে কাফেলার সঙ্গে এগিয়ে এলেন খাদিজা তাহিরা। বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ট সেবক মাইসারাকে উপদেশ দিয়ে বললেন-

মাইসারা, মনে রেখো, এ যাত্রায় তোমাদের সঙ্গে কর্মধ্যক্ষ হিসেবে যাচ্ছেন মান্যবর আবু তালিবের প্রিয় ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ। তোমাকে পাঠানো হচ্ছে তাঁর বিশেষ খাদেম হিসেবে। তাঁর সেবা শুশ্রুষায় কোনো ধরনের ত্রুটি করো না। তাঁকে কখনও একা থাকতে দিয়ো না।

ব্যাবসায়ী কাজে নবীজির দায়িত্বশীলতার পরিচয় ও এক অপূর্ব ঘটনা

দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। এদিনও খাদিজা তাহিরা প্রতীক্ষায় বসে আছেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একজন অশ্বারোহী। যিনি এগিয়ে আসছেন অতি দ্রুত গতিতেং যোখ পাতলেন খাদিজা তাহিরা, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগল তাঁর কাছে। তিমি দেখলেন, অপূর্ব এক অশ্বারোহীকে।

খাদিজা আরও দেখলেন, দুজন ফিরেশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে ঐ দ্রুত গতিসম্পন অশ্বারোহীর মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। তখন তাঁর সঙ্গে যেসব সহচরক ছিলেন তাদেরও বিষয়টি দেখালেন। অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল সহচরগণ চেয়েই রইল শুধু...

ভাবতে লাগলেন খাদিজা তাহিরা এই অশ্বারোহীকে নিয়ে। তখন তাঁর মনে পড়ে গেল অনেক আগের একটি ঘটনা:

মহিলাদের একটি অনুষ্ঠান চলছে। সবাই আনন্দে বিভোর। আকস্মিকভাবে সেখানে উপস্থিত হলেন একজন অপরিচিত ব্যক্তি। সে সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল-

ওহে মক্কার রমণীরা, শোনো। তাড়াতাড়ি-ই তোমাদের এ মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হবেন একজন নবি। তাঁর নাম হবে আহমাদ। তোমাদের মধ্যে যে পারবে, সে যেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটটি ছিল খুবই দ্রুত গতিসম্পন্ন। তাই অতি দ্রুতই খাদিজা তাহিরার কাছে পৌঁছতে সক্ষম হলেন তিনি। তাঁকে জানালেন ব্যবসায় অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা।

আল ইসাবা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৮২

উচ্ছ্বাসের প্রধান কারণ। ব্যবসার মুনাফা হয়তো এর একটি অংশ; তবে মূল কারণ নয়।

পরদিন এসে উপস্থিত হলো পুরো বাণিজ্য বহরটি। মাইসারার মুখমণ্ডল মুগ্ধতা ও প্রফুল্লতায় পূর্ণ। উচ্ছ্বাসভরে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন অনেক কিছু। তার কথা যেন শেষই হয় না। আর মালিকান খাদিজাও শুনে অধৈর্য হন না।

পাদ্রী নাসতুরার মন্তব্য, পণ্যক্রেতার বক্তব্য, ফিরিশতাদ্বয় ও মেঘমালার ছায়াদানের কথা। কোনোকিছুই মাইসারার বিবরণের বাইরে রইল না। খাদিজাও এসব সত্য গল্প শুনে সীমাহীন প্রশান্তি লাভ করলেন শুভ্র-শুদ্ধ পবিত্র অন্তরে।

মাইসারা আরও জানালেন মহানুভতা, উদারতা, সততা, বিশ্বস্ততা ও সহিষ্ণুতার স্বর্ণোজ্জ্বল প্রতীক হলেন মুহাম্মাদ। আমরা তাঁর বরকতপূর্ণ সাহচর্যে ছিলাম বলে আমাদের কোনো কষ্টই হয়নি। কোনো দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি কোনো কিছুতে।

প্রায় দ্বিগুণ বা তার কাছাকাছি লাভ হয়েছে।

যে তাঁকে দেখে, সেই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়। সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে।

আল আমিন মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আচরণ সম্পর্কে মাইসারা

আরও বলেন-আমি তাঁর সঙ্গে খেতে বসতাম। আমাদের পেট ভরে যেত, অথচ অধিকাংশ খাবার পড়ে থাকত। এ সবকিছু অবাক হয়ে শুনতে থাকেন খাদিজা রাঃ আনহা।

[তাবাকাতে ইবনু সাদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৩১, সিরাতে ইবনু হিশাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৯। আনসাবুল আশরাফ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৯]

নীরব সম্মতি ও শুভবিবাহ

মক্কার বিশিষ্ট ধনী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি ছিল খাদিজা তাহিরার। এছাড়াও তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমতি ও দৃঢ়চেতা নারী। তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মুগ্ধ ছিল আরবের সব মানুষ। এর পাশাপাশি বংশীয় মর্যাদায়ও তিনি ছিলেন কুরাইশদের মধ্যমণি। অন্যান্য অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী।

এসব কারণে মক্কাসহ সমগ্র আরবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সুপরিচিত। অহমিকা না থাকলেও ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য, আভিজাত্য ও প্রভাবের উষ্ণতার কারণে সাধারণ মানুষ থেকে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। খাদিজা তাহিরার ক্ষেত্রেও হয়েছিল এমনটি। আমাদের সমাজেও তো এমন হয়ে থাকে অহরহ।

তবে আল আমিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের পবিত্র বিবরণ শুনে খাদিজা তাহিরার ঐ দূরত্বের মাঝে ছেদ পড়ল কিছুটা। তাঁর প্রতি আকর্ষণ যেন স্থায়ীভাবে জমা হয়ে গেল পবিত্র প্রিয় হৃদয়ের গভীরতম কেন্দ্রে। অবশ্য বাইরে এ মনোভাবের বিষয়টি মোটেও প্রকাশ করলেন না তিনি। সবাইকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় জানালেন। প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন পরবর্তী কোনো এক বাণিজ্যযাত্রার জন্য।

যথাসময়ে পরবর্তী কাফেলা প্রস্তুত হয়ে গেল। ভরপুর সফল হলো এ কাফেলাও। লাভও হলো প্রচুর। এভাবে আরও দুয়েকবার চলল প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে খাদিজা তাহিরার বাণিজ্য কাফেলা। নবিজির ব্যবসা ছিল হালাল উপায়ে। তাই দ্রুততম সময়ে সব কর্মচারী বিত্তবান না হলেও অভাব ঘুচে গেল সবার। আর্থিক অনটন রইল না কারও ঘরে। একজনের কল্যাণে সবাই সুখী।

খাদিজা তাহিরার বংশগত কৌলিন্য, আভিজাত্য ও বিত্ত-বৈভবের কারণে আরবের অনেক অভিজাত যুবকই পাণিপার্থী ছিলেন তাঁর।কিন্তু তিনি তাদের সবার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে চলছিলেন সচেতনতার সাথে।

এবার খাদিজা তাহিরা নিজ মনের আর্তিকে আর গোপন রাখতে পারলেন না। পরামর্শ করতে বসলেন বান্ধবীসম ছোটো বোন হালা বিনত খুওয়াইলিদের সঙ্গে। এছাড়াও একান্ত নৈকট্যভাজনা ও সহচরী নাফিসাকেও ৩৯। খুলে বললেন মনের বাসনা। বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী ও দৃঢ়চেতা খাদিজা তাহিরা এখন কেমন যেন একটু অস্থির। কিছুটা চঞ্চল।

তাঁর এ অস্থিরতার যৌক্তিক কারণও আছে। তিনি যখন একান্ত বিশ্বস্ত গোলাম মাইসারার মুখে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি শোনেন, তখন দৌড়ে যান গাগতো ভাই তাওরাত ও ইনজিল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবন নওফেলের কাছে। ওয়ারাকা জ্ঞানী মানুষ। ধীর-স্থিরভাবে শুনে যান তাঁর কথা। সবকিছু শোনার পর মুখে বলেন-

খাদিজা, তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহই এ উম্মতের নবি। আমি জানতে পেরেছি, খুব শীঘ্রই এ উম্মতের মধ্যে মক্কা নগরীতে একজন নবি আগমন করবেন। এখনই সে সময়।

এরপর থেকে ওয়ারাকা প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তাঁর কথার কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি খুঁজে পান খাদিজা তাহিরা।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোট্ট একটি ঘর। এ ঘরে উপস্থিত হলেন খাদিজা তাহিরার বান্ধবী নাফিসা। প্রথমে কুশল বিনিময় করলেন। এরপর সাধারণ কিছু কথাবার্তাও হলো।

[আল ইসাবা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৮৩; তাবাকাতে ইবনু সাদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮২; সিরাতে ইবনু হিশাম: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৯, আশরাফ খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯৮। সিরাতে ইবনু হিশাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯১]

এরপর নাফিসা রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন-

আচ্ছা আপনাকে যদি একটি সুন্দরের প্রতি আহ্বান করা হয়। অর্থাৎ এমন কেউ যদি থাকেন, যে কুরাইশ বংশের, পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী, রূপবতী, বিত্তশালী, তাহলে কি আপনি তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি আছেন?

কে সে?

যদি তিনি হন...

বলুন।

মাননীয়া খাদিজা তাহিরা?

-এটাও কি সম্ভব?

-কেন নয়?

-তিনি তো অগাধ সম্পদের মালিক। আর আমার অবস্থা তো আপনার জানাই আছে।

-সে দায়িত্ব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে আর কোনো কথা বের হলো না। নীরব রইলেন।

জ্ঞানীরা বলেন, নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। কারণ, চোখের ভাষায় মনের ভাষা বোঝা যায়।

[আল ইসাবা: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৮২; তাবাকাতে ইবনু সাদ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৩২]

বিবাহের খুৎবা সুখের শুভ যাত্রা

নাফিসা বিনতু মুনইয়া সফল। কারণ, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দেওয়া প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। এবার তিনি মহাআনন্দে চলে গেলেন খাদিজা তাহিরার বাড়িতে; কিন্তু এতে খাদিজার মন ভরল না। এমন সুসংবাদ কি নিজ কানে না শুনে পারা যায়? নিজ কানে শুনে হৃদয় না জুড়ালে কি মনের ব্যথা লাঘব হয়? এজন্য তিনি নিজেই কথা বললেন নবিজির সঙ্গে। [৪০]

পিতার কাছে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তবে নবিজি এতে রাজি হলেন না। তিনি এই বলে অস্বীকৃতি জানালেন যে, দারিদ্র্যতার কারণে হয়তো তিনি এই প্রস্তাবে সায় দেবেন না। তখন তিনি লজ্জা পাবেন। তিনি তো ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান।
অবশেষে খাদিজা নিজেই গেলেন পিতার কাছে। খুলে বললেন সবকিছু। তার স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে একান্তভাবে পাওয়ার আশায়।

খাদিজা তাহিরার মনে যেন খুশি ধরে না। তাই কথাটা জানিয়ে দিলেন চাচা আমর বিন আসাদ এবং চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নওফেলকেও। তাঁরা প্রথমে একটু বিস্মিত হলেন। কারণ, তারা ভেবে নিয়েছিলেন, খাদিজা হয়তো এ বয়সে সংসারধর্মে আর জড়াবেন না। আজ তিনি মত পরিবর্তন করেছেন। ভালো কথা।

এরপরও খুওয়াইলিদ পরিবারের লোকজন ভীষণ খুশি। কারণ, দেরিতে হলেও খাদিজা সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছে এক মহান ব্যক্তিকে, যিনি শুদ্ধ বিবেক ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী অসাধারণ পুরুষ। যিনি গোটা আরবে 'আল আমিন' নামে পরিচিত।

[সিরাতে ইবনু হিশাম: (টাকা): খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৯]

কথা পৌঁছানো হলো প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রদ্ধেয় চাচা মান্যবর আবু তালিবের কাছে। তখন তিনিই ছিলেন তাঁর অভিভাবক। এ কথা শুনে তো তাঁর মনে খুশি ধরে না। তিনি জানতেন, আল আমিন মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম) উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী একমাত্র খাদিজা তাহিরাই হতে পারেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

শুভবিবাহের দিন ঠিক করা হলো। আলোকমালায় সাজানো হলো খাদিজা তাহিরার বাসভবন। নিত্য নতুন কাপড় চোপড় ও অলংকারে সজ্জিত হলো বাড়ির লোকজন। দাস-দাসীরাও পরিধান করল সুন্দর ও নতুন পোশাক। শুরু হলো কচিকাঁচা শিশুদের নাচ-গান। বেজে উঠল বিবাহসংগীত।

খাদিজা তাহিরা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন চাচা আমর ইবন আসাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেন। আমর তখন অনেক বয়োবৃদ্ধ। যা হোক, তিনি চাচাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বরযাত্রী হিসেবে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন চাচা আবু তালিব ও হামজা। সাদর অভ্যর্থনা শেষে আপন আপন আসন গ্রহণ করলেন সবাই। বকরী জবাই করে আগত মেহমানদের আপ্যায়ন করা হলো। কন্যা পক্ষের অভিভাবক হলেন চাচা আমর ইবনু আসাদ। আর তার সহকারী হলেন ওয়ারাকা ইবনু নওফেল।

চাচা আবু তালিব এ মহাপবিত্র বিবাহের মোহর নির্ধারণ করলেন, চারশ দিরহাম। সবার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও চারিত্রিক নিস্কুলষতা বর্ণনা করে খুতবা দিলেন তিনি। যখন পাত্র পক্ষ থেকে আবু তালিবের খুতবা শেষ হলো তখন খাদিজা তাহিরার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নওফেলও একটি খুতবা পাঠ করলেন।

এবার শুরু হলো ভোজনপর্ব। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তৃপ্তি সহকারে ভোজনপর্ব সমাপ্ত করলেন। শেষে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন নিজ নিজ আবাসে। মান্যবর আবু তালিবপ্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন নবদম্পতিকে। খাদিজা তাহিরাও মুক্ত করে দিলেন অনেক দাস-দাসী। অসহায় জনতার মাঝে বিতরণ করলেন অনেক টাকা-পয়সা। সবাই তুষ্ট হলো। প্রাণভরে দুআ করতে লাগল এ দম্পতির সুখময় জীবনের জন্য।

প্রসিদ্ধ মতানুসারে তখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল ২৫ বছর। আর খাদিজা তাহিরার ছিল ৪০ বছর।

শুদ্ধ-শুভ্র দুটি হৃদয় মিলেমিশে একাকার হয়েছিল। এরপর কীভাবে এ পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, ইতিহাস তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইতিহাস এই দম্পতিকে পৃথিবীর সেরা দম্পতি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। অবশ্য একটুও বাড়িয়ে বলেনি; বরং এদ্বারা সৌভাগ্য অর্জন করেছে ইতিহাস নিজেই।

[সিরাতে ইবনু হিশাম ১/১৮৭]

পিতামাতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য

আল আমিন ও খাদিজা রাঃ হলেন জনক জননী। একে একে তাঁদের ঘর আলোকিত করতে আগমন করলেন ছয়জন সন্তান-সন্ততি। অর্থাৎ দুই পুত্র ও চার কন্যা। পুত্রদয় হলেন –

১. হজরত কাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও

২. হজরত তাইয়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আর কন্যা চারজন হলেন-

১. হজরত জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা।

২. হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।

৩. হজরত উম্মু কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা ও

৪. হজরত ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

পুত্র দুজন শিশুকালেই আল্লাহর মেহমান হয়ে যান। অনেকেই কাসিমের নামের সঙ্গে মিলিয়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'আবুল কাসিম' ডাকনাম/উপনামে ডাকতেন। আর দ্বিতীয় পুত্র তাইয়িবের আরেক নাম ছিল তাহির।
মক্কার লোকেরা আল আমিন মুহাম্মাদ ও খাদিজা তাহিরাকে ভালোবাসত; কিন্তু তাঁদের সন্তান বিয়োগের পর কতিপয় লোক নিন্দা করতে আরম্ভ করে। তাদের একজনের কথা

ইমাম বাগভি রহিমাহুল্লাহ এভাবে লিখেছেন –

একবার প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তখন সেখানে প্রবেশ করছিল আস ইবনু ওয়াইল। কিছু কথাবার্তা হলো দুজনের মধ্যে। তখন কাবা প্রাঙ্গণে বসেছিল মক্কার কিছু খারাপ লোক। আস যখন তাদের কাছে পৌঁছল, তখন তাদের একজন বলল:

দুজনে কী নিয়ে কথা বললে?

আস তখন একটু ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উত্তর দিলো-

তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আর কী হবে, সে তো নির্বংশ?'

তখন খাদিজা তাহিরার সন্তান হজরত তাইয়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু সদ্য বিগত হয়েছেন। 'নির্বংশ গালি' শুনে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদিজা মনে অনেক কষ্ট পেলেন; কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। কারণ, তাঁরা তো তাদের মতো ছিলেন না। যখন তখন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। এমনকি, নবিজি তো অশুভ কামনা থেকেও পবিত্র ছিলেন। চিরকালের জন্য। [৪৪]

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মহাসৌভাগ্য যে, তাঁর গর্ভজাত প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পূর্বস্বামীর সন্তানেরা সকলে ইসলাম কবুল করেন। শেষনবির সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন সবাই।

[তাফসিরে মাজহারি। রহমাতুল্লিল আলামিন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৮]

নবীজিকে উৎসাহ ও সান্তনা দিয়ে স্ত্রী হিসেবে খাদিজা রাঃ

মক্কা নগরী এমন এক জায়গায় গড়ে উঠেছিল, যার চতুর্দিক ছিল পাহাড়ে ঘেরা। অর এরই মধ্যখানে অবস্থিত পবিত্র কাবা শরিফ। যখন বরফের ধারা বর্ষিত হতো তবন শহরের অলিতে-গলিতে বয়ে যেত পানির স্রোত। পানি ঢুকে পড়ত বাসিন্দাদের ঘরের মধ্যে কাবার দেয়াল ছিল একেবারে নিচ। তা ছাড়া এর উপরে ছাদও ছিল না। এজন্য বর্ষণের ফলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হতো কাবা-ইমরাতের। এতে দেয়ালের বিভিন্ন অংশে ফাটলও সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য কাবার ইমারত পুনরায় নতুন, উঁচু ও মজবুত করে নির্মাণ করতে চাইল মক্কাবাসী।

ঘটনাক্রমে ঐ সময় মক্কার জেদ্দা নামক বন্দরে এসে আটকে গেল একটি জাহাজ। সংবাদ পেয়ে ওয়ালিদকে জাহাজের কাঠ ক্রয়ের জন্য পাঠালো কুরাইশরা। ঐ জাহাজে ছিল 'বাকুম' [৫১] নামক একজন রোমান মিস্ত্রী। ওয়ালিদ তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলো কাবা-নির্মাণ কাজের জন্য। এই বাকুম-ই কাবাঘর নির্মাণ করেন মিস্ত্রী হিসেবে।
যখন কুরাইশরা দেয়াল গেঁথে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছল, তখন প্রতিটি গোত্রই আবদার করতে লাগল যে, এ বরকতময় পাথর আমরা উঠিয়ে নিয়ে প্রতিস্থাপন করব। এই নিয়ে পারস্পরিক বাদানুবাদ ও ঝগড়া বেঁধে গেল তাদের মধ্যে। শুরু হলো বচসা ও কলহ। একসময় ঝগড়া এ পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, তরবারি কোষমুক্ত করে ফেলল সবাই। তখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটি শিখ এর ফায়সালা এভাবে দিলেন

'আগামীকাল সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি পবিত্র কাবা শরিফে আগমন করবেন, তিনিই এ ঝগড়ার সমাধান বাতলে দিবেন। তাঁর থেকে যে ফায়সালা আসে আমরা সবাই তা মেনে নিতে বাধ্য থাকব।'

উপস্থিত সবাই তার এ সিদ্ধান্ত পছন্দ করল এবং মন থেকে মেনে নিল সন্তুষ্টচিত্তে।

পরদিন সকালে দেখা গেল, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আগমন করেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সবাই খুশি হলো হজরতকে দেখে। প্রসন্ন হলো সবার মন। একবাক্যে বলে উঠল-

هذا الامين قد رضيناه

এই যে, আমাদের প্রিয় আল-আমিন এসে পড়েছেন, আমরা সবাই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সবাই আল আমিন মুহাম্মাদের দিকে। তাঁর ফায়সালা দেখার জন্য। সবার অপেক্ষার পালা শেষ। তিনি বললেন-

যেসব গোত্র পবিত্র হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন করতে আগ্রহী, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করুন। তার কথামতো প্রতিনিধি নির্বাচন করা হলো সকল গোত্র থেকে। তখন তিনি একটি চাদর বিছালেন এবং পাথরটি নিজ হাতে ঐ চাদরের উপর রেখে দিলেন। অতঃপর প্রতিনিধিদের বললেন-

আপনারা আসুন, প্রত্যেকেই চাদরের একেক প্রান্ত ধরে উঠিয়ে নিয়ে আসুন।

এভাবে সবাই যখন পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে এলো তখন নবিজি নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করলেন। তাঁর বিবাদ মীমাংসায় সন্তুষ্ট হলো সবাই। হারবুল ফিজারের পরে মক্কাবাসী যেই মারাত্মক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার উপক্রম হয়েছিল, তার থেকে পরিত্রাণ লাভ করল আল-আমিনের কল্যাণে। এজন্য একবাক্যে তাঁর বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রশংসা করতে লাগল সবাই।

তখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বছর। তখন থেকেই নবিজির জগৎসংসারের প্রতি অনাসক্তি এবং বিশ্বসংসারের প্রতি আসক্তির বিষয়টি বাইরে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। সবাই দেখতে পান, আল-আমিন সংসারে সম্পৃক্ত থেকেও সংসার থেকে পৃথক।

[মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪২৫; দালাইলুন নুবুওয়াহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৫-৬০; সিরাতে ইবনু হিশাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯৬-১৯৭]

মাঝেমধ্যে ঘর থেকে কোথায় যেন হারিয়ে যান। অবশেষে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় আশপাশের কোনো পাহাড়ের পাদদেশে। কিংবা তিনি কোনো এক চূড়ায় নির্জনে বসে আছেন। খাদিজা তাহিরার বয়স তখন ৫০ বছর। এ বয়সেও তিনি প্রাণপ্রিয় স্বামীকে খুঁজে বের করেন। তাঁর কাজে সমর্থন যোগান। একটুও বিরক্ত হন না কখনও।

নারী মনের প্রকৃতি হলো, মুহর্তের জন্য তারা স্বামীর বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারে না, সেখানে তিনি নিত্যদিনের এই বিচ্ছেদকে সমর্থন করেন এবং সহযোগিতা ও ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁর প্রতি। প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে বসে থাকেন তাঁর অপেক্ষায়।

শেষ পর্যন্ত প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বাচন করলেন একটি নিভৃততম ঠিকানা-হেরা পর্বতশৃঙ্গের নির্জনতম একটি গুহা। এই হেরা গুহার চারপাশ ছিল জনমানবশূন্য বিস্তৃত প্রান্তর। সূর্যের কিরণ, চাঁদের কোমল জ্যোতি, জ্যোৎস্নার বিমুগ্ধ আলো ও মিষ্টি-মধুর বাতাস ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না। তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেতেন। এ হেরা গুহাকেই 'জাবালে নূর' বলা হয়।
সেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে থাকতেন। সাধনা করতেন নিজের সীমানা অতিক্রম করে উপরে যেতে। অসীমের স্পর্শ পেতে। তাঁকে অনুভব করতে চাইতেন, যিনি দৃষ্টির বাইরে। দৃশ্যের অতীত। তিনি উপস্থিত হতে চাইতেন সেখানে, যেখানে সময় ও সীমানা বলতে কোনো কিছু নেই।

তিনি ভাবতে থাকতেন- এই যে জগৎ, মহাজগৎ, এর মধ্যবর্তী সবকিছু। এসব কার জন্য? কেন এত আয়োজন? মানুষ আসছে, কোত্থেকে আসছে? আবার চলেও যাচ্ছে? কার কাছে যাচ্ছে? ভীষণ, মহানিসর্গজুড়ে সৃজন-নির্মাণের এ মেলা, খেলা, লীলা-রহস্য কেন এত নিখুঁত। কে এসবের নিয়ন্ত্রণকারী? আবার কিছুদিন পরেই ভূমিস্যাৎ-ধূলিস্যাৎ, কার হাতে এর কলকাঠি? এই মহাসত্যের উৎস কী?

আমাদের আম্মাজান হজরত খাদিজা ছিলেন ভীষণ বুদ্ধিমতী। স্বামীর মধ্যে যে বিরাট বিপ্লব ও বড় পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে, তা তিনি ভালো করেই বুঝতে পারলেন। এজন্য তিনি স্বামীকে বাধা দিলেন না; বরং প্রেমময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর প্রতি। তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হেরা গুহায় যেতেন তখন দুই তিন দিন চলতে পারে এ পরিমাণ খাবার স্বামীকে দিয়ে দিতেন। খাবার ফুরিয়ে গেলে নবিজি কখনও নিজে আসতেন এবং খাবার নিয়ে যেতেন। আবার কখনও হজরত খাদিজাই ঐ উঁচু পাহাড়ের গুহায় খাবার নিয়ে হাজির হতেন।

আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত করুণা জারি থাকুক আম্মাজান হজরত খাদিজার সমাধিতে। কারণ, তিনি সবসময় চাইতেন-এ মহান সাধক পুরুষের সাধনা ও আরাধনায় কোনো ধরনের ছেদ না পড়ুক। তিনি সর্বদা আন্তরিকভাবে কামনা করতেন-

তিনি যেন সফল হন। যা চান, তা যেন পেয়ে যান।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স প্রায় ৪০ ছুই ছুই করছে। এ বয়সে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি পরিপূর্ণ হয়। সবকিছুর ভালো-মন্দ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়। মূর্খদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হবার সর্বোত্তম সময়ও এটি। এমন সময় (নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার ছয় মাস আগ থেকে) নতুন একটি বিষয়ের অবতারণা হলো। তিনি প্রতি রাতেই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। শুভ, শুদ্ধ ও সত্য স্বপ্ন। যা দেখতেন, বাস্তবে তাই ঘটে যেত। প্রতিফলিত হতো ঐসব বিষয়বস্তু। এভাবেই কেটে গেল ছয় মাস।

এসে পড়ল পবিত্র রমজান মাস। জন্মের ৪১তম বর্ষ, ৬ আগস্ট ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ। সোমবার। এ রাতে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মন-প্রাণ উজাড় করে তিনি চিন্তা করছিলেন মহান স্রষ্টাকে নিয়ে। এমন সময় শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে। সারা শরীর কেঁপে উঠল তাঁর। তিনি চোখ খুললেন। এরই মধ্যে গুহার মধ্যে ফুটে উঠল সুপ্রখর আলোকচ্ছটা। ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। দেখলেন, সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতিষ্মান মহাব্যক্তিত্ব।

তিনি বললেন, আমি জিবরাইল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে এ শুভসংবাদটি জানাতে বলেছেন-

আপনি তাঁর রাসুল।

সুতরাং আপনি মানুষ ও জিনকে কালিমা لا إله إلا الله এর দাওয়াত দিন। এরপর তিনি জান্নাতি রেশমী বস্ত্রসদৃশ কোনোকিছুতে লিখিত বাণী বের করলেন, যা ছিল মোতি ও ইয়াকুত দ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত। বললেন-

اقرأ

'আপনি পড়ুন'।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয়ের সঙ্গে বললেন
ما أنا بقارئ

'আমি তো পড়তে জানি না।'

এবার হজরত জিবরাইল তাঁকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে চাপ দিলেন। ছেড়ে দিয়ে আবারও বললেন-

افرأ

'আপনি পড়ুন'।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের মতোই উত্তর দিলেন-

ما أنا بقارئ

'আমি তো পড়তে জানি না'।

তখন হজরত জিবরাইল আবারও তাঁকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বুকে চাপ দিলেন। এভাবে মোট তিনবার হলো। এবার তিনি রাসুল সুলভ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উচ্চারণ করে যেতে লাগলেন -

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَى اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(হে নবি) আপনি পাঠ করুন। আপনার প্রভুর নামে। যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, জমাট রক্ত থেকে। আপনি পাঠ করুন, আর আপনার পালনকর্তা তো মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন। কলমের মাধ্যমে। তিনি মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

[সুরা আলাক, আয়াত: ১০৫]

এ মহান দায়িত্বের বোঝা বহনের ভয়ে কেঁপে উঠল প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোমল হৃদয়। কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন জীবনসঙ্গিনী হজরত খাদিজা। অবাক বিস্ময়ে তিনি লক্ষ করলেন, চিরচেনা স্বামী আজ ভিন্নরূপে জ্যোতিষ্মান। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বজুড়ে নুর আর নুর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি বিস্মিত ও বিমোহিত হলেন।

হজরত খাদিজা ছিলেন বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী। নবিজি বললেন

'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।'

তিনি কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলেন ঠান্ডা পানি। কিছুটা সুস্থির হওয়ার পর জীবনসঙ্গিনীর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললেন নবিজি। নারীমন ভীষণ কোমল ও ভীতু হয়। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেল। একটুও ভয় পেলেন না খাদিজা। উল্টো স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ

আল্লাহর কসম! এমনটি কখনও হবে না। আল্লাহ তাআলা কখনও আপনাকে অপমান করবেন না। কারণ...

আপনি আত্মী-য়স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন।

অনাথ-অসহায়দের দায়িত্ব বহন করেন।

নিঃস্বকে জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেন।

প্রথম মুসলিম

একদিন ঘটে গেল বিশেষ এক ঘটনা। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন, শ্বেতশুভ্র পোশাক পরিহিত একজন অপরিচিত লোক। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মুহাম্মাদের খোঁজ করতে যাচ্ছেন?

হজরত খাদিজা চমকে ওঠলেন। ভয় পেলেন। লোকটির কথার কোনো উত্তর দিতে। পারলেন না। থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সহসাই হারিয়ে গেলেন রহস্যময় লোকটি। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁকে খুলে বললেন সবকিছু। তিনি অভর। দিয়ে বললেন, তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। তিনি আমাকে বলেছেন-

আমি যেন তোমাকে সালাম জানাই। আর তোমাকে সুসংবাদ দিই যে, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরি একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ সুসংবাদ শুনে ভীষণ আনন্দিত হলেন মহাপুণ্যবতী হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা। প্রত্যুত্তরে বললেন-

إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই শান্তিদাতা। শান্তি বর্ষিত হোক হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের ওপর এবং শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর।

[আল ইসাবা, খণ্ড: ৪; পৃষ্ঠা: ২৮৩]

কোনো কল্যাণ বিবেচনায় কিছুদিন ওহি আগমন বন্ধ রইল। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আকাশ থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। ওমনি মাথা গুঁ করে তাকিয়ে দেখলেন, আসমান-জমিনের মাঝখানে একটি সিংহাসনের উপর বসে আছেন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এ দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। শুয়ে পড়লেন কম্বল মুড়ি দিয়ে। তখন ওহি অবতীর্ণ হলো-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন এবং (মানুষকে) সতর্ক (ভীতি প্রদর্শন) করুন। আর আপনি স্বীয় প্রভুর মহিমা ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-সাফ করুন। আর পৌত্তলিকতা বর্জনে অটল থাকুন।

[সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ১-৫।]

এই ওহি আগমনের পরে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা করে। আল্লাহ তাআলার বাণী শোনাতে আরম্ভ করলেন মানুষকে। মহিমা ঘোষণা করতে লাগলেন আল্লাহ তাআলার। অপবিত্রতা ও মূর্তিপূজা থেকে মানুষকে বাঁচানোর কাজ আরম্ভ করলেন।

[সহি বুখারি: ৪]

'সতর্ক (ভীতি প্রদর্শন) করুন' এ নির্দেশ অনুসারে আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সত্যের আওয়াজ তুললেন। ইসলাম প্রচার শুরু করে দিলেন। তখন সর্বপ্রথম যে মহাসৌভাগ্যবান ব্যক্তি এ দাওয়াত কবুল করলেন, তিনি হলেন রাসুলের সুখ-দুঃখের সাথি, প্রাণের প্রিয়তমা স্ত্রী হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবিজি বললেন-

আমার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করো, ঈমান আনো। বলো-

لا إله إلا الله محمد رسول الله

আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসুল।

এ সুমহান দাওয়াত হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামনে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম কবুল করে নেন এবং মুসলমান হয়ে যান। তিনি হলেন প্রথম মুসলমান। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। এ বিশ্বাস যে শুধু তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই না; বরং এই সুমহান বাণী সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে তিনি নবিজির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস: ০৪]

ঈমানের এই বীজ সবার অন্তরে বপন করতে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন সফল কিষাণী। মানব-হৃদয়ের শস্যক্ষেত্রে ঈমানের চাষ দিয়ে গেছেন তিনি। নবিজির পাশে সবসময় ছায়ার মতো লেগে থাকতেন এই মহীয়সী রমণী। আল্লাহর রহমতে তাঁর মিশন ব্যর্থ হয়নি।

নবীজির ঘরে আল্লাহর বরকত ও খাদিজা রা: এর বিচক্ষণতা

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর ওপর ওহি নাজিল হতে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে। গোপনে চলতে থাকে ইসলাম পালন ও তার প্রচার-প্রসারের কার্যক্রম। ছোটোবেলা থেকেই নবিজি ছিলেন স্থির স্বভাবের। কোনো কিছুতেই তাড়াহুড়ো পছন্দ করতেন না। সুতরাং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও তিনি অবলম্বন করলেন ধীর-স্থিরতার পন্থা।

কিছুদিন পর প্রতিষ্ঠা করা হলো একটি গোপন মাদরাসা। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে বসতেন। সাহাবায়ে কেরাম সেখান বসেই তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ইসলাম গ্রহণকারী নতুন ব্যক্তিকে নিয়ে আসতেন। এই গোপন মাদরাসাই হলো ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল আরকাম।

এভাবেই কেটে গেল কিছুকাল। ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হলো পুরো তিনটি বছর। তবে এখন পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন ৪০/৪২ জন মহামানব। অনেক কষ্ট করে, ধৈর্য ধরে তাঁরা টিকে আছেন ইসলামের ওপর।

তিন বছর কেটে যাওয়ার পর মহান আল্লাহ প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পরিবার-পরিজনকে দাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হলো-

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

আর যারা আপনার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হোন।

[সুরা শুআরা - ২৬ : ২১৪-১৫]

মহান আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম তার পরিবারের লোকদের ইসলামের পথে আহ্বান জানান। প্রথমেই বেছে নেন ফুফু সাফিয়াকে। তিনি বলেন-

হে ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ, হে সাফিয়া বিনতু আবদিল মুত্তালিব, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা করো। কেননা আল্লাহর দরবারে সেদিন আমার কিছু করার থাকবে না।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৭৭, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭১]

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

নিকটাত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আয়াত নাজিল হলে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এক সা (সাড়ে তিন সের) আটা, ছাগলের সামনের একটি রান এবং এক পেয়ালা দুধের ব্যবস্থা করতে বললেন। এরপর কওমের সবাইকে দাওয়াত দিতে বললেন। আমি তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করলাম।

প্রিয় নবী সাঃ ভীষণ চিন্তিত। কীভাবে তিনি কওমের সামনে কথাটা পেশ করবেন? তাই নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত। তখন এলেন হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। জিজ্ঞেস করলেন, চিন্তিত কেন?

নবীজি বললেন-

মহান আল্লাহ আমাকে আমার পরিবারের লোকজনকে দাওয়াত দিতে বলেছেন। কিন্তু জীভাবে দেব, তা ভেবে কূল পাচ্ছি না।

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বিচক্ষণ মানুষ। এবারও বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন তিনি। এই প্রোগ্রামের কথা শুনতেই বললেন-

সবাইকে দাওয়াত দেবেন ঠিক আছে: কিন্তু আবু লাহাবকে দাওয়াত দেবেন না।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুই বললেন না। তাঁর দাওয়াতে প্রায় ৪০ জন লোক উপস্থিত হলো। এদের মধ্যে চাচা আবু তালিব, আব্বাস ও হামজাও ছিলেন। সেদিন উপস্থিত হলো আবু লাহাবও।

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খাবার রান্না করলেন। যথাসময়ে খানা পরিবেশন করা হলো। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেয়ালা থেকে এক টুকরা গোশত নিলেন। দাঁত দিয়ে সামান্য একটু ছিঁড়লেন।

অতঃপর পেয়ালায় রেখে দিলেন। উপস্থিত মেহমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন-

আল্লাহর নাম নিয়ে আপনারা খাবার শুরু করুন। আল্লাহর খাস রহমত নাজিল হলো ঐ খাবারের ওপর। সীমাহীন বরকত হলো খাবারে। মাত্র এক পেয়ালা গোশত ও সামান্য কিছু রুটি। সবাই মিলে সেগুলো খেয়ে শেষ করতে পারল না। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও বাকি রয়ে গেল কিছু খাবার। অথচ খাবার ছিল অতি সামান্য। যা মাত্র একজনের জন্য যথেষ্ট ছিল।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আলিকে বললেন, ঐ এক পেয়ালা দুধ এনে সবাইকে পান করাও।

নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে দুধ পান করানো আরম্ভকরলেন। মাত্র এক পেয়ালা দুধ। আরবরা তো এই দুধ এক চুমুকেই শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু এবার আর তা হলো না। সবাই তৃপ্ত হয়ে পান করার পরও অনেকখানি দুধ রয়ে গেল পেয়ালায়। অথচ মেহমানের সংখ্যা ছিল ৪০ জনেরও বেশি।

সবাই খাওয়া শেষ করেছে। বসে বসে গল্প করছে আপন মনে। তখন তাদের সামনে এলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিছু বলতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় খবিস আবু লাহাব বলে উঠল-

উঠে পড়ো, চলো সবাই। মুহাম্মাদ তো আজ তোমাদের খাবারেও জাদু করে ফেলেছে। এমন জাদু তো জীবনে আর কখনও দেখিনি!

আবু লাহাবের এমর হঠকারিতার কারণে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন কিছু বলারই সুযোগ পেলেন না। আবু লাহাবের কথা শুনে সবাই উঠে পড়ল। যে যার মতো চলে গেল বিভিন্ন দিকে।

শ্রধা ও ভালোবাসার সঙ্গীনি খাদিজা রাঃ

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে এসে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা ভীষণ বদলে গিয়েছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করাকেই জরুরি মনে করেছিলেন তিনি। এজন্য নবিজির নির্দেশনা অনুযায়ী অসহায় দুঃখীজনের মধ্যে দান করে দেন তাঁর সম্পদের বিরাট অংশ।

এবার প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভকরলেন, তখন তিনি বাকি সম্পদ নিয়ে নবিজির পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইসলামের কল্যাণে অকাতরে সম্পদ বিলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। এ কারণে দুশ্চিন্তা কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি প্রসন্ন চিত্তে দান করে যান সহায়-সম্পদ।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের কী পরিমাণ দুরবস্থা ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এসময় কী পরিমাণ

[আল-খাসায়িসুল কুবরা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৩; সিরাতুল মুস্তাফা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৩৮; মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৯৪]

সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কী পরিমাণ সঙ্গ দিয়েছেন ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় তা স্বার্থকভাবে ফুটে ওঠেছে। তিনি বলেন-

মুশরিকদের প্রত্যাখান ও অবিশ্বাসের কারণে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত কষ্ট অনুভব করতেন, হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তা দূর করে দিতেন। কারণ, তিনি নবীজিকে সান্ত্বনা দিতেন, সাহস যোগাতেন এবং উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় মেনে নিতেন।

[আল ইস্তিআব, খণ্ড: 8, পৃষ্ঠা: ২৮৩]

ইবনু ইসহাক আরও বলেন-

وكان له وزير صدق على الإسلام، يشكو إليها

ইসলামের ব্যাপারে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুযোগ্য উজির। নবিজি সকল বিপদাপদে তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলতেন।

[সিরাতে ইবনু হিশাম, খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৪১৬]

কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়তেই থাকে। ঐ যে একদিনের ঘটনা। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর মাথার উপর মাটি ছুড়ে মারল কোনো এক জালিম। নবীজি এ অবস্থায়-ই ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর কন্যা পানি নিয়ে এলেন এবং মাথা ধৌত করার সময় পিতার এহেন অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

তখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

“হে আমার কলিজার টুকরা, কেঁদো না। আল্লাহ তাআলা তোমার পিতাকে এমন দুরবস্থায় ছেড়ে দেবেন না।“

একবার প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ আদায় করছিলেন। ওদিকে কুরাইশ সরদাররা জটলা পাকিয়ে বসেছিল। নামাজ পড়তে দেখে তারা বলল, একজন উটের ভুঁড়ি এনে তাঁর গলার উপর রেখে দাও। যাহোক, হতভাগা উকবা ইবনু আবি মুআয়াত উটের একটি ভুঁড়ি এনে নবীজির গলার উপর রেখে দিলো। এ ভুঁড়ির ভারের কারণে তাঁর পিঠ মুবারক দেবে গেল।

তখন কোনো একজন গিয়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হজরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এ খবর দিল। তিনি এসে এ নাপাক বস্তুটি অপসারণ করলেন।

একবার এক হতভাগা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গলায় চাদরের ফাঁস দিতে চাইল। যাতে তাঁর দম আটকে যায়। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ আনহু এসে রাসুলকে মুক্ত করলেন। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বললেন –

"তোমরা একজন লোকের প্রাণ এজন্যই হরণ করতে চাচ্ছো যে, তিনি বলেন, 'এক আল্লাহ তাআলাই আমার প্রতিপালক।"

কুরাইশদের এহেন জঘন্য আচরণে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-ই বেশি কষ্ট পেতেন। প্রতিটি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও নির্যাতন তাঁর হৃদয়কে রক্তাক্ত করে দিত। আঘাতে আঘাতে পাথর হয়ে যান তিনি: কিন্তু ভেঙে পড়েন না। প্রিয়তম স্বামী ও আল্লাহ তাআলার নবীকে এই বলে সান্ত্বনা দেন-

''আপনি সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত আপনি আল্লাহ তাআলার বার্তাবাহক আপনার পূর্বেকার বার্তাবাহকরা সবাই অত্যাচারিত হয়েছেন তবে তাঁরা কখনও পিছপা হননি। আপনিও হবেন না , নিঃসন্দেহে সামনে রয়েছে সাহায্য ও বিজয়।''

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর গোত্রের লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন অনেকেই। তাঁর পিতৃকূল বনু আসাদ ইবনু আবদিল উজ্জার ১৫ জন প্রভাবশালী লোক জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ১০ জনই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। এমনটি ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কারণে। তিনি ছিলেন বহুলোকের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রী।

চিরবিদায়

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মহাসৌভাগ্যবতী। কারণ, তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও সঙ্গ পেয়েছেন। আজওয়াজে মুতাহহারাতদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এবং তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান। তিনি এমন সময় নবীজির পাশে ছায়াসঙ্গিনীর মতো অবস্থান করতেন, যখন তাঁর পাশে কেউ ছিল না।

জীবনের একেবারে সংকটময় মুহূর্ত, যখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁড়াবার মতো জায়গাও ছিল না। তখন তিনি তাঁকে ব্যবসায়িক সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। হাতে কোনো টাকা-কড়ি না থাকা সত্ত্বেও নবিজিকে বিবাহ করেছিলেন।

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দীর্ঘ ২৫টি বছর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভাগাভাগি করে জীবন কাটিয়েছেন। হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, গভীর প্রেম, সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়ে প্রাণের প্রিয়তম মহামানব স্বামীর খেদমত করেছেন। প্রসন্ন চিত্তে যত্ন নিয়েছেন স্বামীর প্রিয়জনদের। নবিজির প্রিয়তমাদের মধ্যে এমন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারিনী আর কেউ নেই।

নবুওয়াত লাভের আগেই তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসাধারণ ব্যক্তি হিসেবে জানতেন। নবিজির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। কোনো মলিনতা এর মাঝে কখনও স্থান দখল করতে পারেনি। যখন ওহি নাজিল হলো, তখন তিনি হলেন সর্বপ্রথম বিশ্বাসিনী। নবিজির সঙ্গে প্রথম নামাজ আদায়ের সৌভাগ্য তিনিই লাভ করেন। তার জীবদ্দশায় যদিও নামাজ ফরজ হয়নি, তারপরও নবিজি তাকে নিয়ে নামাজ আদায় করতেন।

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তার পিতৃকুলের মধ্যেও ছিল। ইসলামের আবির্ভাবকালে তার পিতৃকল বনু আসাদের ১৫জন বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রীবিত ছিলেন। এঁদের ১০জন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। অন্য পাঁচজন শ্রাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়পটে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্মৃতি ছিল অম্লান। ইমাম জাহাবি রহিমাহুল্লাহ তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

‘’তার ফজিলত অনেক। তিনি তার সময়ের সকল নারীর নেত্রী। যেসব নারী পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, সম্মানিতা, ধর্মপরায়ণা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিনী একজন পূত-পবিত্র রমণী। তিনি জান্নাতি।‘’

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে রোগশয্যা গ্রহণ করলেন হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে প্রিয়জন নবিজিকে শোকের অকূল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন। চিরস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করলেন মহাবিশ্বের মহাপ্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে।

শোকে পাথর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছরকে 'আমুল হুজন' বা বিষাদের বছর বলে আখ্যা দেন।

তখনও নামাজ ফরজ হয়নি। জানাজা নামাজের নিয়মও প্রবর্তিত হয়নি। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার জানাজা নামাজের বিষয়ে ভাতিজা হাকিম ইবনু হিজাম বলেন –

‘’আমরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে 'হাজুন' নামক কবরস্থানে গেলাম। আগেই কবর খোঁড়া হয়েছিল। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কবরে শুইয়ে দিলেন। জানালেন চিরবিদায়...।

মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

[আনসাবুল আশরাফ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৬]

তোমার স্মরণে প্রিয় খাদিজা-যার অবদান চির অম্লান

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা জীবিত থাকলে অন্তত তার কাছে দুঃখের কথা বলতে পারতেন। ইবনু ইসহাক বলেন, হজরত খাদিজার ইন্তিকালের পর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে একের পর এক দুঃখ-দুর্দশা আসতেই থাকে। কারণ, পৌত্তলিক শক্তিকে রুখতে পারে, আবু তালিব ও হজরত খাদিজার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তখন আর কেউ ছিলেন না।

উম্মুল মুমিমিন হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ফজিলত, মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি যে, আরবের ঐ ঘোর অন্ধকার দিনে কীভাবে একজন মহিলা সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে একাকী ইসলাম ও তার নবির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় ছিল না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের আগ থেকেই হজরত খাদিজা বাদিয়াল্লাহু আনহা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, তিনি মহামানব হবেন। তাই হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যও তার মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় দেখা যায়নি।

আরেকটি বিষয় হলো, নবুওয়াত লাভের আগে ও পরে হজরত খাদিজা রাঃ আনহা নবীজির প্রতিটি কথাকে প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বাস করতেন। কখনও 'কে বা কেন' এজাতীয় প্রশ্ন করেননি। শুনেছেন, মান্য করেছেন। তার হৃদয়ে নবীজির প্রতি যত শ্রদ্ধা ছিল, এতটা অন্য কারও অন্তরে ছিল না।

২৫ বছরের সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে কখনও তার হৃদয়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। সেই অপবিত্রতার যুগেও হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন পূত-পবিত্র। তিনি কখনও মূর্তিপূজা করেননি। নবিজি একদিন তাঁকে বলেন

وَاللّٰهِ لَا أَعْبُدُ اللَّاتَ وَاللّٰهِ لَا أَعْبُدُ الْعُزَّى أَبَدًا

আল্লাহর কসম! আমি কখনও লাত-উজজার উপাসনা করব না।

প্রত্যুত্তরে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন-

خَلِّ اللَّاتَ، خَلِّ الْعُزَّى

"লাত-উজজার কথা বাদ দিন, ওদের প্রসঙ্গই উঠাবেন না"

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১৭৯৪৭]

ইসলাম, মুসলমান ও প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর দুর্দিনে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে শক্তি-সাহস যুগিয়েছেন তার কোনো তুলনা করা চলে না। ইসলামের জন্য চির অম্লান হয়ে থাকবে তাঁর অবদান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ছিলেন নবিজির সঠিক পরামর্শদাত্রী।

আরবের একজন বিত্তশালী নারী হওয়া সত্ত্বেও হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ হাতে স্বামীর খেদমত করতেন। সন্তান প্রতিপালনসহ গৃহকর্মের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন। নবিজির আহার, বিশ্রাম ইত্যাদির তদারকি করতেন।

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রসঙ্গ উঠলে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো প্রশংসা না করে ছাড়তেন না।

[সিয়ারু আলামিন-নুবালা: ২/১১২]

প্রিয় জননী খাদিজা রাঃ

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাদের জননী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন-

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

নবি মুমিনদের কাছে তাদের আপন জীবনের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীরা তাদের মাতা।

[সুরা আহযাব, আয়াত: ০৬]

বিশ্বাসীরা হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণকে মা বলেই ডাকেন। বলেন, 'উম্মাহাতুল মুমিনিন'। উম্মত জননীও বলে থাকেন কখনও কখনও। আবার কখনও শুধু 'জননী' শব্দটাই ব্যবহার করেন।

ইমাম জাহাবি রহিমাহুল্লাহ, হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্থান, মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

তাঁর ফজিলত অনেক। তিনি তার সময়ের বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী। যেসব নারী বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় পূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতমা।প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভূয়সী প্রশংসা

করেছেন এবং অন্যান্য স্ত্রীগণের ওপর তাকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তার প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাকে হারিয়ে নবিজি শোকে কাতর হয়ে পড়েন।

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদের মধ্যে মহাসম্মানিতা; বরং সবার চেয়ে বেশি। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সালাম জানিয়েছিলেন। সালাম জানিয়েছিলেন ফিরিশতাকুলের সরদার হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম। আর আমাদের প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্তরিক মুহুর্মুহু সালাম তিনি পেয়েছেন সবসময়।

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অবিচল হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিজের সবকিছু নবিজির হাতে তুলে দিয়ে মানবজাতির অপার কল্যাণ সাধন করে গেছেন। আমরা তার গুণাবলি বর্ণনা করে শেষ করতে পারি না।

''হে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় জননী, দয়া করে আমাদের আন্তরিক সালাম গ্রহণ করুন।''

উম্মাতুল মু'মিনিন সাওদা বিনতে জামআ রাঃ

অনেক দুর্লভ গুণের অধিকারিণী ছিলেন হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন সাওদা ও তার স্বামী সাকরান ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের উভয়ের ইসলাম গ্রহণের সময়কাল একই। কুরাইশ কাফিরদের শত নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে তারা মক্কার মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন।

তবে নির্যাতনের মাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলটির সঙ্গে তারা হিজরত করেন। সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করার পর তারা মক্কায় ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর হজরত সাকরান ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান না ফেরার দেশে।

একরাতে ঘুমিয়ে ছিলেন হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা। স্বপ্নে দেখলেন-

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে এলেন। নিকটতর হলেন। পা মোবারক রাখলেন তার কাঁধে।

এ স্বপ্ন দেখে বিস্মিত হলেন সাওদা। স্বপ্নের কথা জানালেন স্বামী সাকরান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন সাওদা, তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এ রকম, অতি শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে। আর তোমার বিবাহ হবে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে।

[তবাকাতে ইবনু সাদ: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৭; আল ইসাবা: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৩৮]
এর কিছুদিন পর সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন আরেকটি স্বপ্ন-

তিনি বালিশে হেলান দিয়ে আছেন। হঠাৎ আকাশ থেকে চাঁদ ভেঙে পড়ল তার কোলের ওপর।

সকাল বেলা ঐ স্বপ্নের কথা খুলে বললেন প্রিয়তম স্বামী সাকরান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি বললেন, তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এ রকম-
আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর তুমি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুলের

এমনই হলো। কয়েক দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন হজরত সাকরান রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামের ওপরই সমাপ্ত হলো তার পরকাল যাত্রা। প্রিয় সাহাবির ইন্তিকালে ব্যথিত হলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অংশগ্রহণ করলেন তাঁর কাফন-দাফন কর্মে। এভাবেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার।

[আনসাবুল আশরাফ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৭]

উম্মুল মুমিনিন হজরত সাওদা বিনতে জামআ রাঃ আনহা ছিলেন সৌভাগ্যবতী রমণী। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহূর্তকালের সান্নিধ্য লাভ পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে শ্রেয়তর ও প্রিয়তর। সেখানে উম্মুল মুমিনিন হিসেবে তাঁর সাহচর্য লাভ তো অতুলনীয়, সৌভাগ্যের বিষয়।

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা আনহা ও জনাব আবু তালিব মৃত্যুপরবর্তী সময়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে নেমে আসে কঠিন মুহূর্ত। এই প্রতিকূল সময়ে তাঁকে উত্তম সঙ্গদান করেন হজরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা।

এতিম নাবালিকা মেয়েদের তিনি মাতৃস্নেহের পরশে আগলে রাখতেন সব সময়। মা-হারা মেয়েরা তার মাঝে খুঁজে পেতেন আপন মায়ের মমতাময় মুখচ্ছবি। নবি পরিবারকে তিনি পরিচালনা করেন পরম যত্ন ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসায়। এজন্য প্রতিটি সদস্যের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন অতি আপনজন।

জন্ম, বংশ ও পরিবার

উম্মুল মুমিনিন হজরত সাওদা বিনতে জামআ কুরাইশিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা। মায়ের নাম সামুস বিনতে কায়েস ইবনু আমর ইবনু জাইদ নাজ্জারিয়্যা। তিনি ছিলেন মদিনার বনু আদি ইবনু নাজ্জার বংশীয়া। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতা সালমাও নাজ্জারিয়্যা ছিলেন। এই সামুস ছিল সালমার ভাতিজী। কারণ, কায়েস ইবনু আমর (অর্থাৎ সামুসের পিতা) ছিলেন সালমার ভাই এবং আবদুল মুত্তালিবের মামা। সালমার বংশধারা হলো-সালমা বিনতে আমর ইবনু জাইদ।

হজরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা কুরাইশ বংশের একটি শাখা বনু আমির ইবনু লুওয়াই-এর সন্তান। তাঁর ডাকনাম বা উপনাম ছিল উম্মুল আসওয়াদ। তাঁর জন্ম সময়কাল নিয়ে কিছু পাওয়া যায় নি।

জাহিলি যুগে হজরত সাওদা রাঃ আনহার প্রথম বিবাহ হয়েছিল হজরত সাকরান ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে। হজরত সাওদা ও তার স্বামী সাকরান দুজন সম্পর্কে চাচাতো ভাই-বোন ছিলেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত চার জন সাহাবি

হজরত সুহাইল ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হজরত সাহাল ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হজরত সালিত ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু’

হজরত হাতিব ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।‘

এরা সবাই ছিলেন সাকরান রাঃ এর আপন ভাই।

শুভবিবাহ

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিচ্ছেদে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেও দেখা দিয়েছিল এক ছন্দপতন।

পুনরায় সংসার জীবনে প্রবেশ করবেন নবিজি-হয়তো এমনটি ভাবেননি। কিন্তু প্রয়োজন আজ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনুরোধ জানাচ্ছে বিধ্বস্ত বাসাটি পুনঃনির্মাণ করতে।
ছেলে দুজন বিদায় নিয়ে চলে গেছেন মহান মালিকের মেহমান হয়ে। বড় মেয়ে জয়নাব স্বামীর বাড়িতে। রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুম আবু লাহাবের ছেলেদের থেকে তালাক নিয়ে চলে এসেছেন পিত্রালয়ে। রুকাইয়া রাঃ এর পুনরায় বিয়ে হয়েছে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে। ভালোই আছে তারা।

কিন্তু মা হারা ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম কন্যা দুটির দিকে তাকালে বুকটা খা খা করে ওঠে। কী মমতাময় দুটি মুখ। মাতৃহারা মেয়ে দুটিকে দেখলে চোখের পানি আটকানো যায় না। এ সময় তাদের থাকার কথা ছিল মায়ের বুকে। স্নেহময় নরম-কোমল হাতের স্পর্শে। পরম আদর যত্নে।

মহাদুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ভালো করে বুঝে ডাতে পারছেন না তারা-কী করলে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষন্ন মুখমণ্ডলে ফুটে উঠবে নির্মল হাসি। প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির দ্যুতি। সুখশান্তিতে ভরে উঠবে নববি কুটির।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ভাবনা মগ্ন হন। তবে তিনি ব্যগ্রতা ও অসষ্ঞুিতা পরিহার করে চলেন সব সময়। তিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন এবং জানেন। তার কাছ থেকেই আসবে শান্তি ও সমাধান। মানবজীবনে একমাত্র তিনিই শান্তি ও সমাধানদাতা।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতৃস্থানীয়া হজরত খাওলা বিনতে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহাতি একদিন বেড়াতে এলেন নববি গৃহে। তিনি হলেন স্বনামধন্য প্রবীণ সাহাবি হজরত উসমান ইবনু মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী। এতিম কন্যাদের দেখভাল করে থাকেন সব সময়। এজন্য আসেন মাঝেমধ্যে। প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিয়ে যান যত্ন সহকারে।

সন্তানদের সাহায্য করার ফাঁকে এক সময়, খাওলা রা এক রাসূল সাঃ কে বললেন -

আপনার জন্য একজন সহানুভূতিশীল জীবনসঙ্গিনীর বড় প্রয়োজন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার এ শৃঙ্খলাহীন জীবনকে আবার কে জোড়া লাগাতে রাজি হবে? এমন আত্মস্বার্থত্যাগিনী কেউ কি আছেন?

খাওলা বিনতে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা বুঝতে পারলেন, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন হয়তো গলতে পারে। তাই বেশ আস্থার সঙ্গেই বললেন-হ্যাঁ, আছেন। আপনি যেমন চান ঠিক তেমনই আছেন। প্রবীণা-বিধবা হলেও পাবেন। আবার নবীনা-কুমারীও পাবেন।
প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু কৌতূহলী হলেন। জানতে চাইলেন তাঁদের পরিচয়। হজরত খাওলা বললেন-প্রবীণা বা বিধবা হলেন সাওদা বিনতে জামআ।

আর কুমারী হলেন আপনার বাল্যবন্ধু একান্ত সহচর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আয়েশা।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন খুশিই হলেন। কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন –

بَلَى أَمَا إِنَّكُنَّ مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَرْفَقُ بِذَلِكَ

''আচ্ছা ঠিক আছে, অবশ্য এ ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য মেয়েরা অধিকতর উপযুক্ত।''

খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন ভীষণ বুদ্ধিমতী। কাজকর্মে বেশ দক্ষ। তাই এ কথা শুনে বুঝে ফেললেন, সম্মতি হয়ে গেছে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সম্মতি পেয়ে হজরত খাওলা চলে গেলেন সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে। তাকে জানালেন নবিজির সম্মতির কথা। তার তো খুশি ধরে না। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে খুশি মনে বলে দিলেন-

أمري إليك يا رسول الله

হে আল্লাহর রাসুল! আমার বিষয় আমি আপনার হাতে সোপর্দ করলাম।

সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা শুনে খুশি নবিজি বললেন-

তাহলে তার পরিবারের কাউকে দায়িত্ব নিতে বলো।

হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন তার পিতা জামআ ইবনু কায়েসের কাছে। তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ।

জামআ ইবনু কায়েস বৃদ্ধ হলেও দায়িত্ব সচেতন। কন্যা বিধবা হয়েছেন। পিতা হিসেবে দায়িত্ব হলো দ্রুত তাকে পাত্রস্থ করা। তাই প্রস্তাব পেয়ে খুশি মনে হাসিমুখে বললেন-

আচ্ছা, পাত্র কে?

হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তর দিলেন-

মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব। আপনার কন্যা সাওদাকে বিবাহ করতে চান তিনি।

ভীষণ উৎফুল্ল হলেন বৃদ্ধ জামআ ইবনু কায়েস। হাসতে হাসতে বললেন-

উত্তম প্রস্তাব। পাত্র তো অভিজাত বংশের।
তা সাওদা কী বলে? ওর অভিমতও তো নেওয়া দরকার।

হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা আগেই সবকিছু ঠিকঠাক করে গিয়েছিলেন। দ্রুত উত্তর দিলেন মনে হয় সে অমত করবে না। আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি।

আসলে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা। কারণ, তিনি দেখেছিলেন দুটি শুভস্বপ্ন। তখন তাঁর প্রয়াত স্বামী স্বপ্নের বিবরণ শুনে বলেছিলেন-তুমি আল্লাহর রাসুলের গৃহিণী হবে।

হজরত খাওলা উৎফুল্ল চিত্তে জামআ ইবনু কায়েসের পিতার কাছে গিয়ে বললেন-

সাওদা তো রাজি। এখন আপনি বললেই আমি বিয়ের আয়োজন করতে পারি। বিষয়টি জানাতে পারি পাত্রপক্ষকে।

হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার পিতা জামআ ইবনু কায়েস ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেননি তখনও। তবে তিনি গোঁড়া খ্রিষ্টান ছিলেন না। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তাই আনন্দচিত্তে বললেন দেরি করে আর কী হবে?

হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা খুবই খুশি হলেন। আবার সংসারী হবেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এতিম ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম ফিরে পাবে তাঁদের মাকে। নববি কুটিরে আবারও হাসি ফুটবে। আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে তাঁর ইসলাম।

বিবাহের আয়োজন করা হলো ঐ দিনই। মক্কা নগরীতে পালিত হলো নিতান্ত আড়ম্বরহীন একটি বিবাহ অনুষ্ঠান। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যাগৃহে উপস্থিত হলেন। সাওদার পিতা জামআ ইবনু কায়েস নিজে উকিল হয়ে তার আদরের কন্যাকে তুলে দিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের হাতে। [

দুনিয়ার বুকে আরেকটি জান্নাতি বিবাহ সম্পন্ন হলো এভাবেই।

[তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবকাতু মাশাহিরিল আলাম: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৬৬; সিরাতুন্নবি খণ্ড: ১. পৃষ্ঠা ১৬৬; সিরাতুন্নবি খণ্ড: ১. ৩১৭-১৮]

নবীজির ঘরে সাওদা রাঃ এর ভালোবাসা ও নিজেকে বিলিয়ে দেয়া

হজরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও মমতাময়ী। মহান আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। এজন্য তিনি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তবে পরপর দুটি স্বপ্ন বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই ভালোবাসাকে।

অবশ্য এর আগেও বাসতেন; কিন্তু এখন জীবনসঙ্গী হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করলেন নবিজির জন্য। প্রগাঢ় মমতা দিয়ে নবিজির জীবন ভরিয়ে দিতে লাগলেন। সার্বক্ষণিক সেবা ও শুশ্রূষা দিয়ে নবিজির বিধ্বস্ত জীবনকে জোড়া লাগাতে চাইলেন আপন মনে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ায় ধন্য ও সৌভাগ্যবতী মনে করতে লাগলেন নিজেকে।

নবিদুহিতা উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে দিতে লাগলেন অকৃত্রিম আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা। তাঁদের জীবনও ভরিয়ে দিতে লাগলেন আদর, সোহাগ ও মমতা দিয়ে। ঠিক মায়ের মতো করে। নবিদুহিতারাও এমন আদর, সোহাগ ও মমতা পেয়ে বিমোহিত হলেন। অল্প দিনেই তাঁদের মায়ের শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম হলেন সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে আরও দুজন সদস্য ছিলেন-

সন্তানতুল্য চাচাতো ভাই আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পালকপুত্র জাইদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এই নতুন তত্ত্বাবধায়কের খাতির-যত্নে খুশি হলেন তারাও। আর নবিজিকে প্রসন্ন দেখে স্বস্তি পেলেন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন সবাই। ইসলাম প্রচারের কাজ চলতে লাগল পূর্ণ উদ্যমে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মাঝে মাঝে ওহি নাজিল হতো। এই ওহি সযত্নে প্রচার করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু মক্কার দুষ্ট লোকেরা তা শুনতেই চাইল না। আর শুনলেও বিশ্বাস করত না। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও উপহাস করে উড়িয়ে দিত। শান্তির দূতকে কষ্ট দিত নানাভাবে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবতে লাগলেন, মক্কাবাসী নয়-হয়তো অন্য কোনো জনপদের অধিবাসীরা হবেন ইসলামের প্রকৃত সেবক। তিনি মনস্থ করলেন, ইসলামের এ সুমহান পয়গাম তিনি ছড়িয়ে দেবেন মক্কার বাইরে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে। আনাচে কানাচে।

কারণ, তিনি তো কেবল আরব উপদ্বীপের নবি নন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবি। দুনিয়ার সব মানুষের নবি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুমহান লক্ষ্য দিয়ে প্রেরণ করে বলে দিয়েছেন

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

''আমি তো আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।''

[সুরা সাবা: : ২৮]

গুনমুগ্ধ ও উৎসর্গোভিত নারী

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রায় তিন বছর ধরে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন একজনই হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবিজি কখনো তার ব্যাপারে বিরূপ ভাব প্রকাশ করেননি। উপরন্তু তার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও আন্তরিক সেবার চিত্র আমরা দেখতে পাই হাদিসে নববি, সিরাতে রাসুল ও ইতিহাস গ্রন্থে।

হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুরো সত্তাই ছিল প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যময় এবং তার জন্য উৎসর্গশোভিত। ইসলামের জন্য সবকিছুকে অম্লান বদনে সহ্য করে নেওয়ার বিশাল ক্ষমতা ছিল তার মাঝে। এজন্য নবিজিও তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রীত ছিলেন সবসময়।

হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার অল্প কিছুদিন পরেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। এজন্য নবিজি তাকে নিজ ঘরে না এনে পিতার বাড়িতেই রেখে দিয়েছিলেন।
যখন হজরত আবু বকরের পরিবার মদিনায় এলো তখন হজরত আয়েশার বয়স বেড়ে হয়েছে নয় বছর। প্রিয়নবি সা. এবার তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এলেন। নয় বছরের এ উম্মুল মুমিনিনকে নিয়ে ঘর করা শুরু করলেন। তবে ছোট্ট আয়েশার সঙ্গে হজরত সাওদার সম্পর্ক ছিল স্নেহশীল সহযোগী ও অভিভাবক তুল্য।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা হয়তো অনেকের চেয়ে একটু বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর সারাক্ষণের সাধনা ছিল-

নবিজিকে পরিতুষ্ট রাখা।

তাঁর ক্লান্তিময় জীবনে সুখের পরশ বুলিয়ে দেওয়া।

শান্তি ফিরিয়ে আনা নবিজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে

হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা লক্ষ করলেন, তিনি বুড়ি হয়ে গেছেন।অপরদিকে,হজরত আয়েশা নব যুবতি আয়েশা যেভাবে আমোদে-আহ্লাদে ভরিয়ে রাখতে পারেন, তিনি সেভাবে পারেন না। এটা অন্য কারও নয়, নিজের দুর্বলতা। এখানে তিনি উপহার দিলেন বিরাট কুরবানি। সতিনসুলভ ঈর্ষা ছড়ানোর পরিবর্তে ভালোবাসার কোমল চাদর মেলে ধরলেন তিনি।
প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোনো সন্তান হয়নি। তবে যতটুকু জানা যায়, পূর্বয়ামী হজরত সাকরান ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে তার একটি ছেলে ছিল। তার নাম ছিল হজরত আবদুর রহমান ইবনু সাকরান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি পারস্যের 'জালুলা' যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।

হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে হজরত আয়েশা বলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে হজরত সাওদাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট ও স্থূলকায়। এজন্য সহজেই লোকেরা তাকে সনাক্ত করতে পারত।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হজরত সাওদার গুণমুগ্ধ। এমনকি হজরত সাওদার মতো প্রশস্ত হৃদয়ের অন্য কোনো নারীকে হয়তো তিনি কখনো দেখেননি। তাই অকপটে স্বীকার করেছেন হজরত সাওদার শরীরে যদি আমার আত্মা স্থান পেতে পারত!

পর্দার বিধান

পর্দা ও শালীনতা মহৎগুণ। এ গুণ বাড়িয়ে দেয় মানুষের মর্যাদা। ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি পর্দা ও শালীনতা। একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনে পর্দা ও শালীনতা অপরিহার্য।
তখনও ইসলামে পর্দার বিধান জারি হয়নি, কিন্তু উম্মাহাতুল মুমিনিনদের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া শোভনীয় নয়-হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা এ রকম মনোভাব পোষণ করতেন। এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাবি জানাতেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি, তাই তিনি চুপ করে থাকতেন। আবার সে সময় আরবের কোনো ঘরের মধ্যে টয়লেট বানানোর রেওয়াজ ছিল না। এমনকি বসতঘরে টয়লেট থাকাকে ভালোও মনে করত না আরবের লোকেরা। তাই প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে বাইরে যেতে বাধ্য ছিল সবাই।

একদিনের ঘটনা হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বাইরে যাচ্ছিলেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখে ফেললেন। সতর্ক করার জন্য বললেন-

হে উম্মুল মুমিনিন, আমি তো আপনাকে চিনে ফেলেছি। হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভীষণ লজ্জা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হলেন। হজরত উমরের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাজিল হলো-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

''হে নবি! আপনি আপনার পত্নী, কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ (মাথার দিক থেকে) নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।''

[সুরা আহজাব: আয়াত: ৫৯]

হজরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত –

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন –

المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

''নারীজাতি পর্দায় গুপ্ত থাকার সত্তা, কিন্তু যখনই তারা পর্দার বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।''

[তিরমিজি, হাদিস: ১১৭৩]

আবার পুরুষকেও পর্দার হুকুম মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআনে পুরুষকে প্রয়োজনীয় পর্দা রক্ষা করে চলতে বলা হয়েছে। সুতরাং পুরুষ হইহই করে ঘরে ঢুকে পড়বে না, বরং সে পর্দার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

''(হে নবি) আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা। তারা যা করে আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে অবহিত।''

[সুরা নূর, আয়াত: ৩০]

সরল মনের মানুষ প্রিয় সাওদা রা:

হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে সরলতা বেশি ছিল। হজরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার সরলতার বহু ঘটনা আছে। কখনো কখনো তার কথায় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিতেন। একদিন তিনি নবজিকে বললেন-হে আল্লাহর রাসুল, কাল রাতে আমি আপনার সঙ্গে নামাজে দড়িয়েছিলাম।

আপনি এত লম্বা সময় রুকুতে ছিলেন যে, আমার মনে হয়েছিল, নাক দিয়ে হয়তো রক্ত ঝরে পড়বে। এ কারণে আমি দীর্ঘক্ষণ নাক চেপে ধরে রেখেছিলাম। তার কথা শুনে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন। এ হিসেবে হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন সরল মনের মানুষ।

পবিত্র জীবন

পবিত্র জীবন হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন খুবই ভাগ্যবতী। ছিলেন সুন্দর ও সুপ্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারিণী। রূপবতীও ছিলেন নিঃসন্দেহে। তার পুরো জীবনটাই ছিল পবিত্র আনুগত্যময় এবং সেবাপরায়ণতায় সুশোভিত। উন্নাসিকতার লেশমাত্রও ছিল না তার চরিত্রের মধ্যে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, তখনই তিনি সর্বান্তকরণে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের জন্য হাবশায় হিজরত করেন সাওদা রাঃ। প্রিয়তম রাসুলের জীবনসঙ্গিনী বানিয়ে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদাকে আরও উন্নত করে দেন। এভাবে তিনি হয়ে ওঠেন মহাসৌভাগ্যবতী।

হিজরতের পর তিনি মদিনায় এসে একে একে অন্যান্য সপত্নীদের পেতে থাকেন। হিংসামুক্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন বলে সবাইকে অন্তর থেকে নিখাঁদ ভালোবাসা দিতে পারতেন। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে। এ রকম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। হজরত আয়েশাও সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। দানশীলতা ছিল প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্বভাব। প্রার্থনাকারীকে কখনো খালি হাতে ফেরাতেন না তিনি। প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু বিলিয়ে দিতেন অকাতরে। তাঁর পবিত্রা জীবনসঙ্গিনীদের সবাই ছিলেন দানশীলা। সুতরাং হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই তাঁকে হাদিয়া পাঠাতেন।

একবার খলিফা হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে লোক মারফত একটি থলে পাঠালেন। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন- مَا هَذَه؟ কী আছে ওতে? খলিফার প্রেরিত লোকটি উত্তর দিলো- دَرَاهِمُ. অনেকগুলো দিরহাম। হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- فِي الْغِرَارَةِ مثل التَّمْرِ. আচ্ছা থলিতে খেজুরের মতো দিরহামও পাঠানো হয়! এ কথা বলে তখনই সব দিরহাম মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

তবাকাতে ইবনু সাদ: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৬; আল-ইসাবা: খণ্ড: 8, পৃষ্ঠা: ৩৩৮ হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিশ্বাসী জনতার জননী। তার এ পরিচয়টি পৃথিবীর মানুষের কাছে অক্ষয় হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এদের আপন মায়ের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করতেন। ভালোবাসতেন। শ্রদ্ধা করতেন। কারণ তারা জানতেন, বিশ্বাস জীবনের চেয়ে বড়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর ও হজরত ইয়াহইয়া ইবনু আবদুল্লাহ আল-আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুম হজরত সাওদার কাছে হাদিস শুনেছেন। তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস সংখ্যা পাঁচটি। হিজরিতে হজরত জয়নাব বিনতে রাসুলিল্লাহ ইন্তিকাল করেন। তাকে গোসল দেন হজরত সাওদা, উম্মু আইমান ও উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৬৬ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত সাওদার জন্য খায়বারে জীবিকার ব্যবস্থা করে যান। যার পরিমাণ ছিল ৮০ ওয়াসাক খেজুর ও ২০ ওয়াসাক গম। তবে এর কিছুই নিজে ভোগ করতেন না তিনি। সবই বিলিয়ে দিতেন গরিব-দুঃখীদের মাঝে। মানবতার কল্যাণে। তবাকাতে ইবনু সাদ: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৬]

চিরবিদায়

চিরবিদায় হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার অপেক্ষাও শেষ হলো একসময়। হজরত উমর বাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের শেষ দিকে ডাক এলো তাঁর। মুমিনরা আরেকবার মাতৃহারা হলেন। শোকার্ত জনতা সমবেত হলেন। জানাজার নামাজে কাতারবদ্ধ সবাই।

এ উম্মত জননীর নামাজে জানাজার ইমামতি করলেন খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। ব্যথাতুর জনতা জননীকে বিদায় জানিয়ে ভগ্নহৃদয়ে ফিলে এলো আপন নীড়ে।

হজরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের অনেক মতভেদ রয়েছে।

ওয়াকিদি এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ৫৪ হিজরির শাওয়াল মাসে, মদিনায়, হজরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে হজরত সাওদার ইন্তিকাল হয়।

ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ৫৫ হিজরির কথা বলেছেন।

ইমাম বুখারি রহ. তার 'তারিখ' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে লিখেছেন, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তার ইন্তিকাল হয়।

ইমাম জাহাবি রহ. নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের শেষ সময়ের দিকে তার ইন্তিকাল হয়। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ ২৩ হিজরির জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে হয়েছে। এজন্য হজরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল তারও আগে হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

[আসাহুস-সিয়ার: ৬০২]

উম্মাতুল মুমিনিন আয়েশা বিনতে আবু বকর রাঃ

ভূমিকা হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তিনি নবিজির শেষলগ্ন পর্যন্ত তার সঙ্গ দিয়েছেন। তার গৃহেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

তিনি নবিপত্নীদের মধ্যে ইলমের পাণ্ডিত্যে ছিলেন সবচেয়ে এগিয়ে। ছিলেন ফকিহ সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিয়িদের উস্তাদ। বহু হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় জঙ্গে জামালের যুদ্ধে তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ ও জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহুমার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

নবিজির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকে সাংসারিক জীবন, অপবাদ, ফিতনার সময়ের যুদ্ধসহ সকল ক্ষেত্রে এই নারী মহিয়সীর ছিল ব্যাপক ভূমিকা। তিনি ছিলেন সেই নারী-যার পবিত্রতা আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ঘোষণা করেছেন। রটনাকারীদের দিয়েছেন শাস্তির বিধানও।

জন্ম, বংশ ও পরিবার

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সাত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন-আমার বয়স যখন ছয় বছর, তখন রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে বিয়ে করেছেন, আমার সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আর আমার সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়েছেন আমার বয়স যখন ছিল নয় বছর। হাদিসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি-বুখারি ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা উভয়েই বর্ণনা করেছেন। পিতা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার মূল নাম-আবদুল্লাহ ইবনু আবু কুহাফা। আবু কুহাফার মূল নাম-উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কাআব বিন সাআদ বিন তাইম বিন মুররাহ। মুররায় পৌঁছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশপরম্পরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সঙ্গে মিলে যায়।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা]

তার মা ছিলেন-উম্মে রোমান। তিনি নিজের প্রকৃত নামের চেয়ে এই উপাধিতেই অধিক খ্যাত ছিলেন। প্রণিধানযোগ্য মত হলো-তার প্রকৃত নাম জায়নাব। কেউ কেউ বলেছেন-দাআদ বিনতে আমের। তার বংশপরম্পরা কিনানা পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে অন্যতম। তার ব্যাপারে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন-
''আমি বুঝ হওয়ার পরই তাদের দুজনকে (মাতাপিতাকে) ইসলামের ওপর পেয়েছি।''

বিশুদ্ধ মত হলো, উম্মে রোমান রাদিয়াল্লাহ আনহা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তার খিলাফতকালে এসে হজরত উম্মে রোমান রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেছেন।

[ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি: ৭/৩৩৭]

শৈশব

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই বলেছেন-আমি একটি মজাদার শৈশব কাটিয়েছি। তিনি খেলাধুলা এবং ধুলোবালির সঙ্গে ফুর্তি করার অংশটি পুরোদমেই উপভোগ করেছিলেন। বধূর সাজে সজ্জিত হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মধুর মিলনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পূর্ণরূপে অবিরাম মজা করে খেলাধুলা করেছেন। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের ব্যাপারে বলেছেন-আমি বান্ধবীদের সঙ্গে দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যেই উম্মে রোমান এসে চিৎকার করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে গেলাম। আমি জানতাম না-আমার সঙ্গে কী করা হবে! আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা বাড়ির দরজায় গিয়ে থামলেন। আমি বললাম, ধ্যাৎ... ধ্যাৎ...। হঠাৎ দ্রুত চলায় আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল প্রায়। তিনি আমাকে ঘরে প্রবেশ করালেন। সেখানে অনেক আনসারি মহিলাকে দেখলাম। তারা বলছিলেন-কল্যাণময় হোক! বরকতময় হোক! কল্যাণময় পাখি হোক!

[ফাতহুল বারি শরহু সহি বুখারি: ৭/৩৩৭]

শুভবিবাহ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহির মাধ্যমে এমন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-

''তিন রাত্রি তোমায় আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। ফেরেশতা রেশমের একটি মূল্যবান টুকরায় উঠিয়ে তোমায় আমার কাছে নিয়ে এসেছেন, অতঃপর বলেছেন-এটা তোমার স্ত্রী। তারপর তোমার মুখাবয়বের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে দিলে দেখলাম-সেটা তো তুমি। আমি বললাম-যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তা বাস্তবে রূপান্তর করুন''

এই স্বপ্নটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছিলেন হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবদ্দশায়। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর হজরত খাওলা বিনতে হাকিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন-

হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি বিয়ে করবেন না?

নবিজি সাঃ বললেন কাকে?

খাওলা বললেন –

আপনি চাইলে কুমারীও হতে পারে, অকুমারীও হতে পারে।

নবিজি সাঃ তখন জিজ্ঞেস করলেন –

কুমারী কে? অকুমারী কে?

খাওলা জবাবে বললেন –

কুমারী হলো-আপনার কাছে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি আবু বকরের মেয়ে আয়েশা। আর অকুমারী হলো- সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা। সে আপনার প্রতি ঈমান এনেছে, আপনার আনুগত্য গ্রহণ করেছে।

নবিজি সাঃ বললেন –
তাহলে দুজনের নিকট গিয়েই আমার সঙ্গে বিয়ের বিষয়ে আলোচনা করো। হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে গিয়ে উম্মে রোমানকে পেলেন। অতঃপর- খাওলা রাঃ বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাদের জন্য অনেক কল্যাণ ও বরকত প্রেরণ করেছেন। উম্মে রোমান জিজ্ঞেস করলেন কী সেটা? খাওলা রাঃ বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর সঙ্গে আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে।

উম্মে রোমান তখন বললেন, আমি চাচ্ছি তুমি আবু বকর আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো! ইতিমধ্যেই হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমন ঘটল। হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সামনে পুরো ব্যাপারটি খুলে বললেন। আবু বকর: এক ভাইয়ের জন্য কি আরেক ভাইয়ের মেয়ে (বন্ধু হিসেবে ভাই, আপন ভাই নয়) উপযোগী হবে?

প্রশ্নটি নিরসনের জন্য হজরত খাওলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বিষয়টি আলোচনা করলেন। নবিজি সাঃ বললেন তুমি আবু বকরকে গিয়ে বলো-আপনি তো আমার ইসলামি ভাই (আপন নয়)। অতএব, আপনার মেয়ে আমার জন্য হালাল হবে। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যার বিয়ে দিলেন। তখন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স হয়েছিল ছয় বছর, মতান্তরে সাত বছর।'। বিয়ের বিষয়টি প্রস্তাব এবং আকদ-বৈবাহিক চুক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকল।

এরপর মদিনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে সরাসরি বিয়ের অনুষ্ঠানও করেননি, তার সঙ্গে একান্তে মিলিতও হননি। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিজরতের দ্বিতীয় বছরে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হিজরতে শামিল হন। আর হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির দশম বছর রমজান মাসে বিয়ে করেন। অর্থাৎ হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিয়ে করার প্রায় তিন বছর পূর্বে।

ইবুন হাজার রচিত-আল ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবা: ৪/৩৪৯; মুসনাদে আহমদ: ৬/২১০

নবীজির ঘরে প্রিয় আয়েশা রাঃ আনহা

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাইয়িদুনা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী বেশে ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তার পুরো অবয়বে তখনো শৈশবের ভাবমূর্তি ছিল প্রবল। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে সর্বোত্তম স্বামীর পরিচয় দিয়েছেন, তৎসঙ্গে তার শৈশব ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পরিবেশের আয়োজনও করেছেন, যা ছিল হজরত আয়েশার শৈশবের পূর্ণ অনুকূল।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে –

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সখিদেরকে খেলাধুলার জন্য তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মসজিদে যখন হাবশি সাহাবিগণ যুদ্ধের মহড়া করতেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যেমন তা উপভোগ করতেন, ঠিক তেমনি হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সুযোগ করে দিতেন। তিনি নবিজির কাঁধে মাথা রেখে তাঁর পিছনে লুকিয়ে থেকে এই মহড়া উপভোগ করতেন।

সাইয়িদা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবরণ দিয়ে বলেছেন-ঈদের দিন ছিল। সেদিন হাবশিগণ যুদ্ধের মহড়া করছিল। আমি নবিজিকে বিষয়টির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেন-তুমি কি মহড়া দেখবে? আমি বললাম-হ্যাঁ। সুতরাং তিনি আমাকে নিজের পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে নিলেন যে, আমার গাল নবিজির গালের ওপর ছিল। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজির হৃদয়ে ভালোবাসার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। হৃদ্যতার দিক দিয়ে নবিজির অন্য কোনো স্ত্রী যেখানে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। যে কারণে কখনো কখনো কোনো কোনো উম্মুল মুমিনিন নারীসুলভঈর্ষাকাতর হয়ে পড়তেন।

বুখারির বর্ণনায় হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্য উদ্ধৃত আছে –

আয়েশার পালার দিনগুলোতে লোকজন উপঢৌকন পেশ করতো। যে কারণে আমার সতীনগণ হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে একত্রিত হয়ে বললেন-হে উম্মে সালামা, আল্লাহর কসম, লোকজন আয়েশার পালার দিন উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়, আমরাও তো আয়েশার মতো কল্যাণ প্রত্যাশা করি।

অতএব, তুমি রাসুলুল্লাহকে নির্দেশ দাও, তিনি যেন লোকজনকে নির্দেশ দেন-যে ঘরেই আপনি অবস্থান করেন, সেখানেই যেন তারা উপঢৌকন পাঠায়। সুতরাং হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিষয়টি নবিজির দরবারে উপস্থাপন করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করলেন। নবিজি এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হজরত উম্মে সালামা তৃতীয়বার কথাটি বললেন।

এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন-উম্মে সালামা, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মাঝে আয়েশাই একমাত্র স্ত্রী-যার লেপের মধ্যে অবস্থানকালেও আল্লাহ তাআলা আমার ওপর ওহি নাজিল করেছেন।

আয়েশা রাঃ এর প্রতি নবীজির ভালোবাসা ও ইনসাফ

নবিজির ভালোবাসা ইনসাফের পথে বাধা হতে পারেনি তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে ভালোবাসার যেই অনন্য স্থানে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তা কখনোই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের পথে অন্তরায় হতে পারেনি।

সহিহ সনদে বর্ণিত আছে –

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেনদেনের ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর মাঝে শতভাগ সমান আচরণ করেছেন। এমনকি সফরের প্রাক্কালে স্ত্রীদের মাঝ থেকে কাউকে সরাসরি সফরসঙ্গিনী না করে লটারির মাধ্যমে করেছেন, যেন এটাই সফরসঙ্গিনী নির্বাচনের নীতি হয়ে যায়। স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করার ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

"হে আল্লাহ, এই বণ্টন হলো আমার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়ের। অতএব, আপনি আমার নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বের বিষয়ে আমাকে তিরস্কৃত করবেন না।"

নবীজির প্রতি প্রেমময় অভিমান

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হজরত উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন –

এক রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ফলে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাগ করেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার ঘরে ফিরে এলেন। তিনি ঘরে ফিরে দেখেন, হজরত আয়েশা রাগ করে বসে আছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'আয়েশা! তুমি কি ঈর্ষা করেছ? তোমার কী হলো?'

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন –

'আমার মতো মেয়ে আপনার মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কি ঈর্ষা করতে পারে!' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার কাছে শয়তান এসেছিল।' হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন-'হে আল্লাহর রাসুল! আমার সঙ্গেও কি শয়তান আছে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'হ্যাঁ।'

এরপর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার সঙ্গেও কি আছে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ।' তবে আমার রব তাকে মুসলিম বানিয়ে দিয়েছেন। আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ শয়তানকে মোকাবিলা করার শক্তি আমাকে দিয়েছেন। আমি তার কাছ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।

খুনসুটি

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে –

একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হারিরাহ রান্না করেছিলাম। হারিরাহ হলো-আটা, দুধ ও ঘি মিশ্রিত এক ধরনের খাবার। সে সময় আমাদের ঘরে হজরত সাওদাও উপস্থিত ছিলেন। আমি হারিরাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করলাম। হজরত সাওদাকে বললাম, তুমিও গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি খেতে অনিহা প্রকাশ করলেন। এ কারণে আমি পাতিলে হাত দিয়ে হজরত সাওদার চেহারায় তা মেখে দেই। এটা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসেন।

এ ব্যাপারে হজরত সাওদা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন-তুমিও আয়েশার চেহারায় হারিরাহ মেখে দাও। হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাও পাতিলে হাত দিলেন এবং তা হজরত আয়েশার চেহারায় মেখে দিলেন। এ ঘটনা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় মুচকি হাসেন। সে সময় হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান দিয়ে আসছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়তো ভিতরে আসবেন। তাই তিনি বললেন, যাও হাতমুখ ধুয়ে আসো।

ভালোবাসা

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রেম-প্রীতি এবং মান-অভিমানের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে সিরাত এবং হাদিসের গ্রন্থসমূহে। ইসলাম মানুষের স্বভাবগত আবেগ-অনুভূতিকে কখনো অস্বীকার করেনি। তার প্রমাণ মিলে তাদের আচরণে। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাদের এমন বহু মান-অভিমান এবং ভালোবাসার ঘটনা পাওয়া যায় বিভিন্ন ইসলামিগ্রন্থে। যা আমাদের জন্য সারা জীবন শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

একবার হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তীব্র মাথা ব্যথায় ভুগছিলেন। সে সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা দেখা দেয়। আর এই অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! তুমি যদি আমার সামনে মৃত্যুবরণ করতে, তাহলে আমি তোমাকে আমার হাত দিয়ে গোসল করিয়ে দিতাম। আমি তোমাকে আমার হাত দিয়ে কাফন-দাফন করতাম। আমি তোমার জন্য হাত তুলে দুআ করতাম।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন –

''হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমার মৃত্যু কামনা করছেন? তিনি অভিমানের সুরে বলেন, তাহলে এই ঘরে নতুন স্ত্রী নিয়ে আসতে পারবেন। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে মুচকি হাসলেন।''

ঈমানদীপ্ত ঘটনা

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন –

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সঙ্গে ছিলেন। একরাতে তিনি চাদর এবং তাঁর জুতা মুবারক খুলে রাখলেন। আমি সেগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের কাছে রাখি। তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। এরপর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাননি, যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা। একপর্যায়ে রাসুল মনে করলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তিনি খুব ধীরে ধীরে নিজের চাদর উঠালেন। খুব সতর্কতা অবলম্বন করে দরজার বাহিরে বের হলেন। আমিও নিজেকে লুকিয়ে রেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে চলা শুরু করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে গেলেন। অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি তিনবার হাত মুবারক উপরের দিকে উঠালেন। এ অবস্থা দেখে আমি তাড়াহুড়া করে ঘরে ফিরে আসি।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজায় এসে ভালোবাসার সুরে ডাকলেন, 'হে আয়েশা! তুমি ভয় পেয়েছ কেন?'
আমি বললাম- 'কিছু না, হে আল্লাহর রাসুল!'

তিনি বললেন- 'তুমি আমাকে বলবে? না আল্লাহ তাআলা আমাকে সবকিছু বলে দিবেন?' তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন-'আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক।

এরপর হজরত আয়েশা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'সে ছায়া কি তোমারই ছিল, আমি আমার সামনে যে ছায়া দেখেছিলাম।' হজরত আয়েশা বললেন- 'জি আল্লাহর রাসুল।' আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকা আঘাত করলেন, আমি হালকা ব্যথা অনুভব করি।

এরপর আমাকে বললেন –

''তুমি কি এমন ধারণা করেছ যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল তোমার সঙ্গে কোনো বেইনসাফি কাজ করবে?'' আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- ''মানুষ যতই তার কথা গোপন রাখুক আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত। 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।''

নবীজির সান্তনা

রাসুলের সান্ত্বনা উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, বিদায় হজের সময় আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারাফ নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। এদিকে আমার হায়েজ শুরু হয়ে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা সকল আদম কন্যাদের ভাগ্যাকাশে এই নিয়ম লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। হজের সব কাজ পূরণ করে নাও। শুধু তাওয়াফ করা বাকি রাখবে। পবিত্র হলে তা আদায় করে নিবে।

সুন্দর সময়

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাত ধৌত করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পানি ছিটিয়ে দিলেন। এই পানি ছিটানো ছিল মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার হৃদয়ের ভালোবাসা থেকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেসময় হাতের তালুতে পানি নিলেন। হজরত আয়েশার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিলেন। তারা দুজনেই হাসতে লাগলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আয়েশা! দেখো! আমি অতিরঞ্জিত কিছু করিনি; আমি বরং বদলা নিয়েছি। আর কুরআনুল কারিমে বদলা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মান-অভিমান

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। এমনও সময় অতিবাহিত হয়েছে মাসের পর মাস চুলায় কোনো আগুন জ্বলেনি। রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিগণের জন্য যে পরিমাণ গম ও খেজুর বরাদ্দ রাখতেন, তা তাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ হয়ে যেত। তবে রাসুলের স্ত্রীগণ এটা জানতেন যে, মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেসব গনিমতের মাল বাইতুল মালে জমা করতেন, তা থেকে কিছু পরিমাণ নিলে তাদের প্রয়োজন মিটে যেত।

একবার আবু বকর এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তারা দেখলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয়তমাদের মাঝখানে উপবিষ্ট আছেন। চারপাশে তাঁর স্ত্রীরা তার কাছে বিভিন্ন অভাব অভিযোগ এবং নিজ নিজ চাহিদার কথা তুলে ধরেন। হজরত আবু বকর এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কন্যা আয়েশা এবং হাফসাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এভাবে চাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আগে থেকে সতর্ক করেছিলেন। এর ফলে তারা দুজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু দাবি করেননি।

ঘটনাক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। তিনি একটি গাছের মূলের সঙ্গে ধাক্কা খান। এতে তিনি পাঁজরে ব্যথা অনুভব করেন। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরের সঙ্গে একটি ঘর ছিল। যাকে আল-মাশরাবা বলা হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থান করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, আগামী এক মাস কোনো স্ত্রীর সঙ্গে অবস্থান করবেন না। মুনাফিকরা সে সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। তারা ভাবল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন।

সংবাদটি তারা ভালোভাবে প্রচার করতে শুরু করল। এ কথা সাহাবায়ে কিরামগণের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা খুবই মর্মাহত এবং হতাশ হয়ে পড়েন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ খবর শুনলেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নিচে চৌকির উপরে শুয়ে আছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারকে গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। তা দেখে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিও নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর দুচোখ দিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টির মতো অঝোর ধারায় পানি পড়তে থাকে। পরে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে অশ্রুসজল নয়নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আপনার প্রিয়তমাদের তালাক দিয়েছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, না, এমন কিছু হয়নি।

একথা শুনে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জোরে আওয়াজ করে বলেন, আল্লাহু আকবার। পরে তিনি এই খবর সাহাবিদের মাঝে পৌঁছে দিলেন। ইলার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে গেলেন। এ দিকে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক এক করে প্রত্যেকটি দিন গুনে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো একমাসের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আজ তো উনত্রিশতম দিন। আর তো একদিন বাকি আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! মাস কখনো উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে।

আয়েশা রাঃ আনহার ইলমি জ্ঞান

হজরত সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখনই দীনের কোনো বিষয়ে সমস্যায় পড়তেন, কোনোভাবেই উদ্ধারের পথ খুঁজে না পেতেন, তখনই তারা হারানো ইলম অন্বেষণের জন্য ছুটে যেতেন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার দরবারে।

ইমাম জারকাশি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কিতাবুল ইজাবায় হজরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন –

আমাদের মতো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা যখন কোনো সমস্যায় পড়তাম, তখন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই কোনো ইলমি সমাধান বের হয়ে আসতো।

ইবনু হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল ইসাবা তদীয় গ্রন্থে বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত মাসরুক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন –

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃস্থানীয় বড় বড় সাহাবায়ে কিরামকে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফারায়েজ (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।

আরেকজন বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত আতা ইবনু আবি রাবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকিহ, সবচেয়ে বড় আলেম এবং সবচেয়ে সুন্দর মতামত প্রদানের অধিকারী।

হিশাম ইবনু উরওয়া স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-
আমি আয়েশার চেয়ে বড় ফকিহ, বড় চিকিৎসক এবং বড় কবি কাউকে দেখিনি।

ইমাম জুহরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

যদি হজরত আয়েশার ইলমের কাছে সকল উম্মুল মুমিনিনের ইলম জমা করা হয়, সকল নারীর ইলম জমা করা হয়, তাহলে হজরত আয়েশার ইলমই বেশি ও উত্তম প্রমাণিত হবে।

[আল ইসাহাবা: ৪/৩৪৯; আলইস্তিয়াব-ইবনু আবদিল বার: ৪/৩৪৮]

ইবাদত ও তাকওয়া

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বেশি বেশি রোজা রাখতেন। এমনকি মনে করা হতো যে, তিনি গোটা বছর রোজা রাখতেন, কখনো রোজা ছাড়তেন না। তিনি খুব বেশি নামাজ পড়তেন, শেষ রাতের নামাজের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। নামাজে চরম বিনীতভাবে খুব বেশি বেশি দুআ করতেন। যখন তিনি ভয় বা শাস্তির কোনো আয়াত পড়তেন, সেই আয়াতটি বারবার পড়তেন এবং উপযোগী দুআ করতেন। হাফিজ আবু নুআইম তদীয় গ্রন্থ 'আলহুইয়ায়' আবুজ জুহা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-হজরত আয়েশা রাদি.-এর নামাজকালীন তেলাওয়াত শ্রবণকারী জনৈক ব্যক্তি বলেছেন –

হজরত আয়েশা রাঃ নামাজে এই আয়াতটি পড়ছিলেন-

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করেছেন।

[সুরা তুর, আয়াত: ২৭]

আর কেঁদে কেঁদে বলছিলেন-আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন। নামাজরত হজরত আয়েশার তেলাওয়াত শ্রবণকারী আরেকজন বলেছেন-

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিলাওয়াত করলেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

''তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো''

তারপর এমনভাবে কাঁদতে থাকলেন যে, তার ওড়না অশ্রুতে ভিজে গেল, আর তিনি বলতে থাকলেন।

রাবি আরও বলেছেন-

তিনি রোজা রাখতেই থাকতেন রাখতেই থাকতেন, এমনকি তাপদাহ তাকে কাহিল করে ফেলতো।

[হিলইয়াতুল আউলিয়া: ২/৪৮, ৪৯]

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

আমার কাছে জনৈকা অসহায় নারী আসল, যার কোলে দুটি কন্যা সন্তানও ছিল। আমি নিজের কাছে রক্ষিত তিনটি খেজুরই তাকে দিয়ে দিলাম। নারীটি দুটি খেজুর দুই সন্তানকে দিয়ে নিজে একটি মুখে দিতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যেই তার কন্যারা ওই খেজুরটিও চেয়ে বসল। নারীটি খেতে যাওয়া খেজুরটিকে দুইভাগ করে দুই সন্তানকে দিয়ে দিলো। তার এমন আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। ঘটনাটি আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করলাম। এতশ্রবণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে ওই নারীর জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করেছেন কিংবা জাহান্নামকে হারাম করেছেন।

[হিলইয়াতুল আউলিয়া: ২/৪৯]

মার্জিত ভাষার অধিকারী

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনীকারগণ একমত হয়েছেন যে, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সে যুগের আরব নারীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ভাষাশৈলীর অধিকারী ছিলেন।

তিরমিজি রহ, হজরত মুসা বিন তালহা রাদি, থেকে বর্ণনা করেছেন –

তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে বড় ভাষাশৈলীর অধিক অধিকারী কাউকে দেখিনি। মুহাম্মদ বিন সিরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি আহনাফ বিন কাইস রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-আমি আবু বকর সিদিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুতবা শুনেছি, উমর ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তৃতা শ্রবণ করেছি, উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়ান আমার কানে পৌঁছেছে, আলি বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সকল খলিফার আলোচনাই আমার কান শুনেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সৃষ্টির এমন কোনো কথা শুনতে পারিনি, যা হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথার চেয়ে অধিক সুন্দর ছিল!

[মুস্তাদরাক হাকিম; আলইজাবাহ লিজ-জারকাশি: ৫৭]

যেদিন হজরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেছেন, হজরত আয়েশা রাদি, তাঁর কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন-

نضر الله يا ابت وجهك وشكر لك صالح سعيك فلقد كنت للدنيا مدلا بإدبارك عنها وللآخرة معزا بإقبالك عليها ولئن كان اجل الحوادث بعد رسول الله رزؤك وأعظم المصائب بعده فقدك ان كتاب الله تعالى ليعد بحسن الصبر عنك حسن العوض عنك وانا استنجز موعود الله تعالى بالصبر فيك واستقضيه بالاستغفار لك فعليك سلام الله توديع غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك

আব্বাজি! আল্লাহ আপনার চেহারাকে উজ্জ্বল করুন। আপনার নেক প্রয়াস আপনার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। আপনি তো দুনিয়াকে পিছে ঠেলে দিয়ে তাকে লাঞ্ছিতকারী, পরকালকে বুকে ধারণ করে তাকে সম্মান প্রদানকারী। আল্লাহর রাসুলের পর সবচেয়ে ভারী ছিল আপনার তিরোধান, তাঁর পর আপনার বিচ্ছেদই আমার জন্য সবচেয়ে বড় মসিবত। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার কিতাব আপনাকে হারানোর উত্তম ধৈর্যের কারণে আপনার চেয়ে উত্তম বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর আমি সবর দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে কেবল আপনাকে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি চাচ্ছি, আপনার জন্য ইস্তিগফারের মাধ্যমে সেই দাবি পেশ করব। অন্যরা যদি দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে আমি দাঁড়াব দীনের জন্য। আর তা হলো-দীন নিয়ে তৃপ্ত থাকা, দিনের মাঠে বিচরণ করা এবং তাঁর চারপাশকে নাড়াচাড়া করা। জীবনকে নষ্ট না করে বিদায় গ্রহণের কারণে আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তির বর্ষিত হোক, আপনার বিচারে কোনো বৈষম্য থাকবে না।

[জাহরুল আদাবি লিলকায়রাওয়ানি: ১/৩৯]

আয়েশা রাঃ এর একচ্ছত্র গুন

আয়েশার একচ্ছত্র গুণ হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, আমি কেবল গৌরবের কথা বলছি না। আমি বাস্তববাদী কথা বলছি। রাব্বে কারিম আমাকে কিছু একচ্ছত্র গুণ দান করেছেন, যেগুলো অন্য কারোর মাঝে খোঁজে পাওয়া যাবে না।

সেগুলো হলো-

- রাব্বে কারিম কাপড়ের মধ্যে আমার দেহাকৃতি দিয়ে ফিরেশতার মাধ্যমে স্বপ্নযোগে প্রিয় নবিকে দেখিয়েছেন।
- আমার বয়স ছয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।
- নয় বছর বয়সে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে আগমন করি।
- কেবলমাত্র আমি ছিলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুমারী স্ত্রী।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বিছানায় শুয়ে আছেন। সেসময়েও তাঁর উপর ওহি নাজিল হতো।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমি ছিলাম তাঁর সর্বাধিক প্রিয়তমা।
- রাব্বে কারিম আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহি নাজিল করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাজিল করেছেন।
- জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আমি আমার স্বচক্ষে দেখেছি।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কোলে মাথা রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।
- আমি তাঁর খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা।
- আমাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- আমার মাগফিরাত এবং পরকালে আমাকে উত্তম রিজিক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়াবি জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার মুখের লালা তাঁর লালার সঙ্গে মিলেছে।
- তিনি আমার ঘরেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। এ ধরনের আরও গৌরবময় মর্যাদার কথা তিনি নিজেও বর্ণনা করেছেন। আরও বহু সাহাবি তার এ ধরনের গুণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রামাণ্য হিসেবে যা হাদিস এবং সিরাতের গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে।

আয়েশা রাঃ-এর বিখ্যাত শাগরিদগণ

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাতে অনেক শাগরিদ তৈরি হয়েছেন। যাদের অধিকাংশই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ তাবেয়িন এবং আলেম। তারা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরা শরিফে প্রবেশ করে পর্দার আড়ালে বসে হজরত আয়েশার ইলমি বিষয়গুলো মুখে শুনতেন এবং তাকে শোনাতেন। এসব শাগরিদের মাঝে কিছু ছিলেন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকটাত্মীয় এবং মাহরাম।

হজরত আয়েশা রাঃ তাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতেন এবং তাদের শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। নিঃসন্দেহে আত্মীয়তার সূত্রে, হজরত আয়েশার কাছে তাদের প্রবেশ ও ওঠাবসা সহজ হওয়ার কারণে অন্যদের তুলনায় তারা ছিলেন হজরত আয়েশার অধিকতর নিকটবর্তী। তারা হলেন-আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিকের গর্ভে হজরত জুবাইরের দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম, কাসিম বিন মুহাম্মদ, তিনি ছিলেন হজরত আয়েশার ভাতিজা, হজরত আয়েশার ভাইয়ের নাতি আবদুল্লাহ ইবনু আবি আতিক, আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের দুই পুত্র আব্বাদ ও খুবাইব, উবাদা বিন হামজাহ বিন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর, হজরত আয়েশার দুধ বোনের সন্তান আবু সালামা বিন আবদুর রহমান।

[আবদুল হাদিম তাহমাজ রচিত-সাইয়িদাহ আয়েশাহ: ২০৩]
হজরত উরওয়া ছিলেন এদের মাঝে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে অধিক ইলম অর্জনকারী এবং বর্ণনাকারী। তিনি ছিলেন মদিনার উলামাদের মাঝে বিখ্যাতদের মধ্যে অন্যতম। ২৩ হিজরিতে হজরত উমরের খিলাফতের শেষদিকে জন্ম গ্রহণ করেছেন। উষ্ট্রীর যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল তেরো বছর। কুবাইসা জিয়িব বলেছেন, আমাদের মধ্যে উরওয়াই হজরত আয়েশার দরবারে অধিক যাতায়াত করতেন। হজরত আয়েশার হাদিসের ব্যাপারে উরওয়াই ছিলেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। হাদিস বিশারদগণ বলেছেন-হজরত উরওয়া ছিলেন নির্ভরযোগ্য, অধিক হাদিস বর্ণনাকারী, ফকিহ, আলেম, মজবুত ধীশক্তির অধিকারী এবং আমানতদার।

হজরত আয়েশা রা: আনহার শেষ দিনগুলো ও চিরবিদায়

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স যতই বাড়ছিল তার ইবাদত, দুনিয়াবিরাগ এবং একাকিত্ব ততই বেড়ে চলছিল। তিনি কেবল ইলমের সৌজন্যে, মানুষের প্রয়োজনে ফতওয়া প্রদানের জন্য এবং হালাল-হারাম বিষয়ে মানুষকে অবহিত করার জন্যই কথা বলতেন।

ইবনু কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি জোর দিয়ে বলেছেন যে –

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা রমজান মাসের সাতাইশ তারিখ রোজ মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেছেন। তিনি অসিয়ত করেছিলেন- তাকে যেন রাত্রিবেলা জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

বিতর নামাজের পর হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন। মোট পাঁচজন তার কবরে নেমেছিলেন, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন-জুবাইর ইবনুল আওয়ামের ঔরশে আসমা বিনতে আবু বকরের দুইপুত্র আবদুল্লাহ ও উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৭টি বছর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল আঠারো বছর, হিজরতের সময় তার বয়স ছিল নয় বছর। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহমত নাজিল করুন। মহান আল্লাহ মু'মিন নারিদের তাঁর অনুসারি হয়ে পথ চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৯৪]

উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাঃ আনহা

উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার ফজিলত অনেক। তার শ্রেষ্ঠমহিমা এই যে, তিনি নবিপ্রিয়া, তার জীবনসঙ্গিনী। পৃথিবীতে যেমন, তেমনই জান্নাতেও। বিশ্বাসীগণের যথার্থ জননী-এটাও তার অনন্য সাধারণ মর্যাদা। এ মর্যাদা ঢাকে আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন।

হজরত জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে প্রশংসা করেছেন তার-

إِنَّ حَفْصَةَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ.

''নিশ্চয় হাফসা খুব বেশি রোজা পালন করেন। আর নামাজ পড়েন রাত জেগে জেগে।''

[তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সাদ: ৮/৬৮]

জন্ম, বংশ ও পরিবার

আরবের নানা ঘটনা প্রবাহের সাক্ষী উমর ইবনুল খাত্তাব ইসলামের ছায়াতলে আগমনের পর ইসলামের শক্তি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন পাষণ্ড ইবনুল খাত্তাব থেকে তিনি হয়ে যান হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু। এতদিন যারা তার ! হাতে নির্যাতিত হয়েছিল, এখন তিনিই হয়ে ওঠেন তাদের পরম আশ্রয়স্থল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একসময়ের অত্যাচারী উমর ইবনুল খাত্তাব ইসলামের খিদমতে নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দেন যে, তার উপাধি হয়ে যায় –

اَلْفَارُوق আল-ফারুক

তথা হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। এরচেয়েও বড় পুরস্কার হলো, তিনি ঐ সৌভাগ্যবানদের একজন, যিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কারণ, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেছিলেন।

হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হজরত জায়নাব বিনতে মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহার কন্য। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর আরও দুজন ছেলে ছিলেন-

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাঃ। ২. হজরত আবদুর রহমান ইবনু উমর রাঃ।

হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা হস্তীবর্ষের ৩৫ বছর পর এবং নববিবর্ষের পাঁচ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলামের সংস্পর্শে

পবিত্র ধর্ম ইসলামের সংস্পর্শে উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বড় সন্তান। কারণ, তিনি সর্বপ্রথম হজরত জায়নাব বিনতে মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম সন্তান হলেন হাফসা। এরপর নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর জন্মগ্রহণ করেন হাফসার ভাই আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার পরে জন্মগ্রহণ করেন হজরত আবদুর রহমান ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব দেরি করে ইসলাম গ্রহণ করলেও তার মামা বাড়ির লোকেরা দ্রুত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। তার মামারা হলেন-

১. প্রখ্যাত সাহাবি হজরত উসমান ইবনু মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. হজরত কুদামা ইবনু মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

১ম বিবাহ ও স্বামীর মৃত্যু

উমর ইবনুল খাত্তাবও কন্যা হাফসাকে সুপাত্রে সঁপে দেওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। পেয়েও গেলেন একসময়। দেরি করলেন না এক মুহূর্তও। হাফসাকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন শ্বশুর। হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই স্বামীর নাম ছিল হজরত খুনাইস ইবনু হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু। হজরত খুনাইসের মায়ের নাম ছিল জয়িফা বিনতে জুজাইম। হজরত খুনাইস ইবনু হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ডাকনাম বা উপনাম ছিল 'আবু হুজাফা'।

তিনি ছিলেন সেসব সৌভাগ্যবানের অন্যতম, যারা একেবারে প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশ করার আগেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হজরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী হজরত খুনাইস ইবনু হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিশ্বজয়ী বদরি কাফেলার অন্যতম সদস্য।

বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে খতম করেছিলেন কয়েকজন কাফির সেনাকে। বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ইসলামের প্রথম জয়ে। তবে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা যা হওয়ার তা-ই হলো। হজরত খুনাইস ইবনু হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হলেন মারাত্মকভাবে। এই সৌভাগ্যকে তিনি বরণ করে নিলেন হাসিমুখে। ইসলামের জয়ে হৃদয়টা ভরে গেল তাঁর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে এলেন তিনি। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতে সমর্থ হলেন বটে কিন্তু জান্নাতের হাতছানি পাগল করে তুলল এই বীর মুজাহিদকে।

হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা মন ভরে সেবা করলেন অসুস্থ স্বামীর। ছায়ার মতো পাশে রইলেন সর্বক্ষণ। সান্ত্বনা ও ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে চাইলেন মৃত্যুভয়কে। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা নির্ধারিত। সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না হজরত খুনাইস ইবনু হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু। কয়েকদিন পর পান করলেন শাহাদতের পেয়ালা। রওনা করলেন জান্নাতের ঠিকানায়। স্বামীর বিয়োগ ব্যথায় শোকাতুর হলেন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা। অবশ্য এত ব্যথা-বেদনার পরও তিনি ছিলেন গর্বিতা। কারণ, ঐ সময় শহিদের স্ত্রীকে সৌভাগ্যবতী মনে করা হতো।

[তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সাদ: ৪/১৪৪; উসদুল গাবাহ: ২/১৮৮; সিয়ারু আলামিন নুবাদ ১/১৮৯; আল-ইসাবা: ২/২৯১]

উম্মতের জননী হওয়ার শুভক্ষনে

আয়েশা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা। যাকে বলা যায় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান বিতরণে সুমহান ভূমিকা পালনকারিণী। ছোট্ট জীবনে বড় কাজ করে উদাহরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম সফল রমণী। ইলমি অঙ্গনে আয়েশার তুলনা একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর কেউ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এর পর আগমন ঘটে হজরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহার। আগে যার বিয়ে হয়েছিল বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে শাহাদত বরণকারী নবিজির প্রিয় সাহাবি, প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে অন্যতম হজরত খুনাইস ইবনু হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে। বদরের যুদ্ধে নির্মমভাবে আহত হয়ে তিনি চলে গেলেন পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার একান্ত আদরের কন্যা হাফসার পুনরায় বিবাহ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন।
একজন দায়িত্বশীল পিতা হিসেবে এটিই ছিল তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। বেশ সচেতন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী উমর। কাজ করেন ভেবেচিন্তে। এবারও নিলেন এ রকম উদ্যোগ। ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করবার ইচ্ছা হলো উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর। নবিদুলালী হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা কয়েকদিন আগে ইন্তিকাল করেছেন। তার বিপত্নীক স্বামী হজরত উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিমর্ষ ও শোকাচ্ছন্ন। প্রথমে তার কথাই মনে হলো। আর এই সম্বন্ধ হলে তো ভালোই হয়। আর যাই হোক, মুসলিম সমাজে উসমানের মতো পুরুষ যার তুলনা হয় না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেরি করলেন না, ছুটে গেলেন তার কাছে। বিবাহের কথাটা বললেন বেশ আগ্রহের সঙ্গে। বললেন-

إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ

‘’আপনি যদি চান, তাহলে হাফসাকে আমি আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতে পারি। হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ধীরস্থির স্বভাবের মানুষ। হুটহাট কোনো কিছু বলার অভ্যাস নেই তার। এবারও ব্যতিক্রম হলো না।‘’

তিনি বললেন-

سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي

আমার বিষয়টাকে একটু ভেবে দেখি। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাল ছাড়ার লোক নন। তাছাড়া উসমান রাদিয়াল্লায় আনহুকে পাত্র বেশ পছন্দ তার। তাই কয়েকদিন পর আবার কথাটা তুললেন উসমানের কাছে। এবার উসমান স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন-

مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَة

এখন বিবাহ করার (নারীসঙ্গের) কোনো ইচ্ছা নেই আমার।

বিফল মনোরথ অবস্থায় আরও কয়েকদিন কেটে গেল লৌহমানব হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর। যাহোক, মেয়ে যখন আছে, তখন তো বিয়ে দিতেই হবে। পাত্রের প্রত্যাখ্যান বা অপারগতার কথা চিন্তা করে বসে থাকলে চলবে না। তাই এবার তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। একটু বয়সী মানুষ হলেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার কাছে কাঙ্ক্ষিত পুরুষ। চরিত্র, দায়িত্ববোধ, অনুগ্রহশীলতা-সহ যত সৎগুণ একজন মানুষের থাকতে পারে, সবই আছে তাঁর মাঝে। কেমন যেন তিনি মুসলিম জাতির আশ্রয়স্থল। হজরত উমর তাকে বললেন-

إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ

আপনি যদি চান, তাহলে হাফসাকে আমি আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতে পারি। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হলেন এই সহজ-সরল দয়ালু পুরুষ আবু বকরের রহস্যময় আচরণে। উসমান তো মুখের ওপর না করে দিয়েছিলেন কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি। চুপ রইলেন। এরপর চলে গেলেন অন্যদিকে। মন দিলেন ভিন্ন কোনো কাজে। হজরত আবু বকরের মৌনতার আঘাত হজরত উসমানের প্রত্যাখ্যানের চেয়েও বেশি দুঃখ বয়ে আনল হজরত উমরের জীবনে। বেশ কষ্টেই আছেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবার কাউকে কিছু বলতেও পারছেন না।

মনের কষ্ট মনে চেপে কয়েকদিন পর এলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। তাঁর সুখময় সান্নিধ্যে এসে খুলে বললেন তাঁর দুঃখের কথা। একটু সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য। স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি দিলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। একটু লাজুক ভঙ্গিতে বললেন –

أَلا أَدُلُّكَ عَلَى خَتَنٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ وَأَدلَّ عُثْمَانَ عَلَى خَتَنٍ هُوَ خَيْرُ مِنْكَ الله

''আমি কি তোমাকে উসমানের চেয়ে ভালো জামাতা এবং উসমানকে তোমার চেয়ে ভালো শশুরের সন্ধান দেবো না?''

খুশিতে লাফিয়ে ওঠার জোগাড় হলেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। একট স্বাভাবিক হয়ে বললেন –

بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

হে আল্লাহর প্রত্যাদেশ-প্রচারক! অবশ্যই দান করুন।

এরপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিবাহ করলেন হজরত উমরের কন্যা হাফসাকে। আর তাঁর নিজের কন্যা উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে দিলেন হজরত উসমানের সঙ্গে।

[তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সাদ: ৮/৬৫]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বড় কন্যা হলেন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তার বিয়ে হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে। তাই মহাআনন্দিত খাত্তাব পরিবারের। আর একটু বেশিই খুশি হলেন উমর। নিজ মেয়ের বিয়ে। ওলি হলেন নিজেই।

হজরত হাফসার সঙ্গে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো হিজরতের ৩০ মাস পরে। আল-ফাতহুর রাব্বানি মাআ বুলুগুল আমানি: ২২/১৩০ অর্থাৎ তৃতীয় হিজরির শাবান মাসে। উহুদযুদ্ধের আগে। বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করা হলো চারশ দিরহাম।

[সিরাতু ইবনে হিশাম: ২/৬৪৫]

নববি সংসারে

সংসারজীবনে প্রবেশ করলেন উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা। তার বয়স তখন ২০ বছর।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২২৭; আনসাবুল আশরাফ: ১/৪২২]

এ হচ্ছে আল্লাহর হাবিব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের সংসার, যিনি বলেন-

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

তুমি এ দুনিয়ায় একজন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা পথযাত্রীর মতো থাকো।

[সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪১৬]

তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল? সম্পর্ক বলতে শুধু এতটুকুই, যেমন কোনো পথিক বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করল, তারপর সে আশ্রয়স্থল ছেড়ে চলে গেল। যিনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেন-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ البَارِدِ

''হে আল্লাহ, আপনার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার-পরিজন এবং শীতল পানি থেকেও অধিকতর প্রিয় করে দিন।''

[তিরমিজি, হাদিস: ৩৪৯০]

عِنْدَكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ

''হে আল্লাহ, আমাকে আপনার ভালোবাসা দান করুন এবং ঐ ব্যক্তির ভালোবাসাও দান করুন, যার ভালোবাসা আপনার নিকট আমার উপকারে আসবে।''

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাগাতার এমনভাবে রোজা রাখতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি আর রোজা ছাড়বেন না। উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা উপলব্ধি করলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোভাব ও মনোস্কামনা।

এজন্য বিসর্জন দিলেন পার্থিব চাওয়া-পাওয়াকে। আলাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসায় পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করলেন নিজেকে। প্রায়শই রোজা রাখতেন উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নামাজ পড়তেন রাত জেগে জেগে। তার রূপ, গুণ ও ইবাদতপ্রিয়তার কারণে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন তাকে। তিনিও উপভোগ করেন এ ভালোবাসা। বাড়িয়ে দেন নামাজ ও রোজার এই সুমহান আমল।

তখনই এর স্বীকৃতি নিয়ে হাজির হন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে বলেন-

إِنَّ حَفْصَةَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ

''নিশ্চয় হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা অধিক পরিমাণে রোজা পালনকারিণী এবং নামাজ আদায়কারিণী।''

[তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সাদ: ৮/৬৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২২৮]

পিতার মতো তীক্ষ্ণ ও স্বভাবে উষ্ণতা

পিতার মতো তীক্ষ্ণ ও স্বভাবে উষ্ণতা উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন পিতার মতোই তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন। আবার পিতার মতোই অন্তরে ধারণ করতেন মহান আল্লাহর প্রতি সীমাহীন আনুগত্য ও অক্ষয় বিশ্বাস। আর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি লালন করতেন অগাধ আস্থা ও অফুরন্ত ভালোবাসা। তারপরও তারা ছিলেন মানুষ। আবার ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। তাদেরও ছিল দুনিয়াবি একটি সংসার। তাই মাঝেমধ্যে কথা কাটাকাটি হতো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। কখনো কখনো মান-অভিমান হতো তাদের মাঝে।

জাহিলি যুগে কুরাইশ নারীরা পুরুষের অনুগত ও বাধ্য থাকত। আমরা তাদের বিন্দুমাত্র মূল্য দিতাম না। ইসলাম তাদের মর্যাদা দান করে। তাদের সম্পর্কে নাজিল হয় অনেক আয়াতে কারিমা। এরপর আমরা তাদের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হই। এরপর আমরা মদিনায় এসে দেখলাম, মদিনায় নারীরা পুরুষদের বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছে। ধীরে ধীরে আমাদের নারীরা তাদের কাছে শিক্ষা পেতে থাকে।
আমি একদিন স্ত্রীর ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেলাম। সে-ও ছেড়ে দিলো না, কথার পিঠে কথা শুনিয়ে দিলো আমাকে। তার এমন প্রত্যুত্তর মোটেই ভালো লাগল না আমার কাছে। তখন সে বলল, আমার এমন উত্তর দেওয়া আপনার পছন্দ হয় না। অথচ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও তার কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন। কোনো কোনো স্ত্রী তো আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তার থেকে দূরে আছেন। তাতে এমন হয় যে, নবিজি সারাদিন বিমর্ষ থাকেন।

এমন কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন মেয়ে হাফসার কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন-তোমরা কি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করে থাকো? হ্যাঁ। আমরা এমন করে থাকি। তোমাদের কেউ কি রাত পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকো? হ্যাঁ, এমনও হয়ে থাকে।

এবার ক্ষেপে গেলেন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আর বললেন-

قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنّ

''তোমাদের মধ্যে যে এমন করে, সে (সফল হবে না, কখনোই না) দুর্ভাগা। সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মারাত্মকভাবে।''

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বললেন-

أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

''তোমাদের কেউ কি আল্লাহর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রুদ্ধ হওয়ার পরও আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করছ?''

فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ

''এমন হলে তো তার ধ্বংস অনিবার্য।''
لا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا

''মেয়ে, সাবধান, তুমি আর কখনো প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করবে না। তার কাছে কোনো কিছু আবদার করবে না। তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাইবে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মেনে নেবে তার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে)।

وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ

''তোমার সঙ্গিনী (সতীন) যে তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী এবং প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক প্রিয় সে যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।''

[সহি মুসলিম, হাদিস: ১৪৭৯; হায়াতুস সাহাবা: ৩/৫০২]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কন্যা হাফসাকে লক্ষ করে বললেন-সাবধান! এমন করো না। আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। তুমি তার অহমিকার ফাঁদে পড়ো না, যার সৌন্দর্য প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিমোহিত করেছে।

[সিরাতুন্নাবি, আল্লামা শিবলি নুমানি: ২/৪১০]

স্বামীসঙ্গ ও সোহাগপ্রাপ্তির মধুর প্রতিযোগিতা

স্বামীসঙ্গ ও সোহাগপ্রাপ্তির মধুর প্রতিযোগিতা উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজির পত্নীগণের মধ্যে বেশি ভালোবাসতেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে। দুজনের সম্পর্ক ছিল সখী-সহচরীর মতো, বোনের মতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজোট হতেন তারা। এজন্যই তো হজরত আয়েশা তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, হাফসা বাপের বেটি। তার বাপ যেমন প্রতিটি কথায় দৃঢ়সংকল্প, সে-ও তেমনই। আরও বলেছেন, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের মধ্যে একমাত্র হাফসাই আমার সমকক্ষতার দাবিদার। সম্ভবত এ কথাটি তারা ভুলতেন না যে, তাদের সম্মানিত পিতৃদ্বয় আল্লাহর রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় সহচর ও বন্ধু।

তবে তাদের পরস্পরের ভালোবাসার স্বচ্ছ নীল আকাশে কদাচিৎ কখনো দেখা দিত নারীসুলভ ঈর্ষার ধূসর মেঘ। আবার তা কেটেও যেত তাদের অমলিন অন্তঃকরণের কারণে। স্বামীসঙ্গ ও সোহাগপ্রাপ্তির ব্যাপারে কখনো কখনো ঈর্ষার শিকার হতেন অমলিন অন্তঃকরণের অধিকারিণী উম্মুল মুমিনিনদ্বয়।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে বের হতেন, তখন নিজ স্ত্রীদের ব্যাপারে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আয়েশা ও হাফসার নাম উঠল। উভয়েই তার সঙ্গে বের হলেন। নবিজি যখন রাতে সফর করতেন, তখন তিনি আয়েশার রাঃসঙ্গে আলাপ করে করে চলতেন।

একদিন হজরত হাফসা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, আজ রাত তুমি আমার উটে চড়ো, আর আমি তোমার উটে চড়ি। এরপর তুমি অপেক্ষা করবে আমিও অপেক্ষা করব। অতঃপর হজরত আয়েশা হাফসার উটে আর হজরত হাফসা আয়েশার উটে আরোহণ করলেন। যখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশার উটের কাছে এলেন এবং এতে সওয়ার ছিলেন হজরত হাফসা, তখন তিনি সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে চললেন। অবশেষে মনজিলে গিয়ে অবতরণ করলেন।

এদিকে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না পেয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন হজরত আয়েশা রাঃ। যখন সবাই মনজিলে গিয়ে নামলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার পা ইজখির ঘাসের ওপর রেখে বলতে লাগলেন-

يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي

''হে রব, একটা সাপ বা বিচ্ছু আমার দিকে ধাবিত করে দিন: যেন আমাকে দংশন করে।''

وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

''তিনি তো আপনার রাসুল, এজন্য আমি তাঁকে কিছু বলতেও পারি না।''

[সহি বুখারি, হাদিস: ৫২১১; সহি মুসলিম, হাদিস: ২৪৪৫]

দৃঢ়চেতা রমণী

কোনো মুসলিম যদি কাউকে কালো জাদু করে এবং যাকে কালো জাদু করা হয়েছে, সে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে যে কালো জাদু করেছে, ইসলাম তার কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে

أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فَأَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ فَقَتَلَتْهَا

হাফসা বিনতে উমরকে তার এক দাসী জাদু করল। অতঃপর জাদুর কথা স্বীকার করল এবং তা বের করে আনল। সুতরাং তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন।

[বায়হাকি, হাদিস: ১৬৪৯৯]

অর্থাৎ কালা জাদুতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। তার তাওবা কবুল করা হবে না।

বিশিষ্ট সাহাবিদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসার এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, আবু মুসা আশআরি, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও কায়েস ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

তাবিয়ি ও ইমামগণের মধ্যে এই মতের প্রবক্তা হলেন হজরত উমর ইবনু আবদুল আজিজ, ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ইবনু আনাস, ইমাম শাফিয়ি ইবনু ইদরিস, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ইবনু কুদামা ও ইমাম সাওর রাহিমাহুমুল্লাহ।

[তাফসিরে কুরতুবি, সুরা বাকারা, আয়াত নং ১০২-এর তাফসির : ১/৪৩৮]

একজন শিক্ষানুরাগিনীর গল্প

উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যান্য নারীদের মতোই। ঐ সময় নারীদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তবে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে তিনি পেয়েছিলেন জীবনসঙ্গী হিসেবে। আর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মহান ব্যক্তিকে পেয়েছিলেন পিতার আসনে। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী ও পিতার চেয়ে বড় শিক্ষক কি আর পৃথিবীতে কখনো জন্ম নেবে? এ দুই সুমহান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান এবং উম্মুল মুমিনিনদের সার্বক্ষণিক সঙ্গ তাঁর মাঝে এনে দিয়েছিল ইলমের বহমান এক স্রোতধারা।
এছাড়াও তাঁর মাঝে ছিল ইসলামকে জানার প্রবল আগ্রহ। জ্ঞানার্জনের তীব্র বাসনা। দ্বীনকে বোঝার গভীর অনুসন্ধিৎসা। বিভিন্ন ঘটনা ও মাসআলা থেকে হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার জ্ঞানের গভীরতা ও ইলমি পাণ্ডিত্বের বিষয় অনুধাবন করা যায়। এমন একটি ঘটনা ঘটে সরাসরি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে। ঘটনাটি উম্মে মুবাশশির থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.।

একবার প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন –

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهِ، أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ

আমি আশা করি যে, বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ জাহান্নামে যাবে না। হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলে উঠলেন-

أَلَيْسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

মহান আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন- 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, (জাহান্নাম) পৌঁছবে না।'

[মুসনাদু আহমদ, হাদিস: ২৬৪৪০]

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা তো একখ বলেছেন; কিন্তু তিনি এ কথাও বলে দিয়েছেন-

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

অতঃপর আমি খোদাভীরু লোকদের উদ্ধার করব আর জালিমদের সেখানে নতজান অবস্থায় ছেড়ে দেবো।

[সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৭১-৭২৮১]

হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাঝে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ ছিল। এটা দেখে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় তালিম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। হজরত শিক্ষা বিনতে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি। তিনি ভালো লেখাপড়া জানতেন। নবিজি হজরত হাফসাকে শেখানোর জন্য তাকে ঠিক করে দেন। হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুন্দর লেখা শিখে ফেলেন। হজরত শিফা বিনতে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা-জাহিলি যুগে তিনি নামলা নামক এক প্রকার ক্ষত-রোগের ঝাড়ফুঁক করতেন।

একদিন তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন-জাহিলি যুগে আমি ঝাড়ফুঁক করতাম। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে শোনাতে পারি।

[শরহু মুসলিম লিন-নববি: ১৪/১৮২]

প্রিয়নবি সা. তাঁর মুখ থেকে ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র শুনে বললেন-

أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ

তুমি তাকে (হাফসা) যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেভাবে নামলা (ঝাড়ফুঁক) শিক্ষা দাও না কেন!

[আবু দাউদ, হাদিস: ৩৮শরহু মুসলিম লিন-নববি: ১৪/১৮২]

ঠাট্টা-মশকরা

উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজির অন্য পত্নীদের সঙ্গেও সম্ভাব বজায় রেখে চলতেন সবসময়। তার স্বভাবসুলভ উষ্ণতার কারণে কখনো এর ব্যতিক্রমও ঘটে যেত; কিন্তু সার্বিক অবস্থা ছিল প্রীতিময়, স্নিগ্ধ-সুন্দর।

একবার প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মমিনিন হজরত সাফিয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন যে, তিনি কাঁদছেন। রাসুল সাঃ বললেন –

কাঁদছ কেন? হজরত সাফিয়া বললেন হাফসা আমাকে 'ইহুদির মেয়ে' বলেছে।

তখন নবিজি উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, তুমি কেন তাদের বলে দিলে না-

كيف تكونان خيرا مني

তোমরা কীভাবে আমার চেয়ে মর্যাদাবান হতে পারবে (আমার তো তিনটি মর্যাদার আসন রয়েছে)?-

زوجي محمد আমার স্বামী হলেন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

وأبي هارون হারুন আলাইসি সালাম আমার পিতা (তিনি হজরত সাফিয়ার বংশীয় পূর্বপুরুষ)।

وعمي موسى আর নবি মুসা আলাইহিস সালাম আমার চাচা (পূর্ব পিতৃব্য)।

হাফসা তোমার চেয়ে কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, বলো তো!

এগুলো ছিল সাংসারিক খনশুটি। তাদের অন্তর সর্বাধিক পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তারা ছিলেন মাটির মানুষ। তাই সংসারজীবনে কখনো ঈর্ষা, কখনো রাগ-ক্ষোভ বা কখনো নিতান্তই ঠাট্টা-তামাশা করে ঘটে যেত ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনা। কোনোভাবেই এগুলোকে বর্তমান সময়ের ঝগড়া-কলহের আওতায় ফেলা যায় না।

এগুলো যদি সামান্য পরিমাণ দোষত্রুটির আওতায়ও পড়ত, তাহলে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। প্রয়োজনে এগুলোর প্রতিরোধ ব্যবস্থায় এগিয়ে আসতেন। যেহেতু তিনি এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, তাহলে বোঝা যায়, এগুলোকে অবশ্যই সহজভাবে নিতে হবে।
[উসদুল গাবাহ: ৭/১৬৮]

সখীকে সান্ত্বনা দেয়া

খাইবারযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সঙ্গে নিয়ে এলেন খাইবার রাজকন্যা নও মুসলিমা উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে। মসজিদ সংলগ্ন কোনো হুজরা খালি ছিল না। এজন্যই হয়তো প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত সাফিয়াকে নিয়ে গেলেন সাহাবি হজরত হারিসা ইবনুন নুমানের বাড়িতে। গৃহকর্তা ছিলেন সচ্ছল ও বিত্তবান। তিনি তার বাড়ির সবচেয়ে ভালো কক্ষটি ছেড়ে দিলেন হজরত সাফিয়ার জন্য। এ রকম বিরল খিদমতের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন হজরত হারিসা ইবনুন নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে জানালেন অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। খিদমত করে যেতে লাগলেন মনঃপ্রাণ দিয়ে। বধুবরণ ও দর্শনের জন্য সেখানে হাজির হলেন অনেক মুহাজির-আনসার রমণী। সবার মুখে মুখে এই কথাটি প্রচার হয়ে

গিয়েছিল যে, হুয়াই-দুহিতা সাফিয়া অসামান্য রূপবতী। তাই কৌতূহল নিবারণের জন্য এবং স্বচক্ষে কন্যাদর্শনের জন্য সেখানে ভিড় না জমিয়ে পারলেন না মদিনাবাসিনীরাও।

উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে এলেন হজরত জায়নাব বিনতে জাহাশ, হজরত হাফসা ও হজরত জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না। হজরত আয়েশাও এলেন কিন্তু তিনি এলেন চাদরে মুখ ঢেকে, যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিকই চিনতে পারলেন তাকে। ফেরার সময় পিছু নিলেন তার। মুখের আবরণ সরিয়ে বললেন-

كَيْفَ رَأَيْتِهَا يَا عَائِشَ

হুমায়রা (আয়েশা), সাফিয়াকে কেমন দেখলে? হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—

رَأَيْتُ يَهُوْدِيَّةٌ بَيْنَ يَهُوْدِيَّاتٍ

স্ত্রী আর দেখলাম? দেখলাম, ইহুদিদের মধ্য থেকে এক ইহুদিনীকে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

لا تَقُولِي هَذَا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهَا قَدْ أَسْلَمَتْ فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا

এ রকম বলো না। সে তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। হয়েছে বিশুদ্ধ চিত্ত বিশ্বাসিনী।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবার এলেন সখী-সহচরী হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে। বললেন, সাফিয়ার রূপের কথা। হাফসা নিজেও দেখে এসেছেন এই রাজকন্যার অপরূপ সুন্দর চেহারা। আয়েশা রাঃ বালিকা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না সেভাবে। বিষয়টি বোঝেন সখী-সহচরী হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এবারও বুঝতে পারলেন আয়েশা তার কাছে এসেছেন সান্ত্বনা পেতে। তাই শুনিয়ে দিলেন সান্ত্বনার বাণী। বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন হ্যাঁ, সে রূপবতী বটে; কিন্তু যতটা বলা হচ্ছে ততটা না। আর সে তো আপনার ধারেকাছেও না। আসলে এর দ্বারা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজরত আয়েশা রাঃ ইলম ও নবিজির কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি বুঝিয়েছেন। বাহ, সখীকে সান্ত্বনাও দিলেন। আবার মিথ্যা কথাও বললেন না।

[তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সাদ: ৮/১৪৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৩৭; আল-ইসাবা: ৮/২১১]

হাদিস শাস্ত্রে অবদান

উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার জ্ঞানচর্চার আগ্রহের কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহার মতোই। এজন্যই তাঁদের মাঝে ছিল এত

সখ্য ও সম্প্রীতিবোধ। জ্ঞানচর্চায় তারা একেকজন ছিলেন অপরজনের ঘনিষ্ঠ সহযোহিনী। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ স্বামী মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাতে-কলমে গ্রহণ করেছেন ইলমুল হাদিসের শিক্ষা।
আবার কখনো হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার পিতা হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন মোট ৬০টি হাদিস।

এর মধ্যে মুত্তাফাকুন আলাইহি চারটি। ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন ছয়টি। হাদিসের অন্যান্য কিতাবে সংকলিত হয়েছে ৫০টি।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৪৫]

একদল সাহাবি ও তাবিয়ি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। যারা তার কাছ থেকে হাদিস শুনে প্রচার করেছেন, তাদের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন-

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। হজরত হামজা ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। সাফিয়া বিনতে আবু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহা। হারিসা ইবনু ওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। মুত্তালিব ইবনু আবি ওয়াদাআ। উম্মে মুবাশশার আল আনসারিয়া। আবদুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম। আবদুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া। আল-মুসাইয়িব ইবনু রাফে। শুতাইর ইবনু শাকাল। মাওয়া আল-খুজায়ি। সিওয়ার আল-খুজায়ি। ঈসা ইবনু আবি ঈসা আল-কুফি। আল মাজলাজ। বাকি ইবনু মাখলাদ প্রমুখ।

[আল-ইসাবা: ৮/৮৬]

যে গুনাবলীর জন্য তিনি অনন্য

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার বেশি রোজা রাখা এবং বেশি নামাজ পড়ার সনদ দিয়ে তার প্রশংসা করেছেন। জান্নাতেও তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্য থেকে জানা যায়, 'তিনি ছিলেন তার পিতার মতোই স্পষ্টবাদী ও সাহসিনী।'

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার সংসারজীবন আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয়।

চিরবিদায়

মহাপণ্যবতী উম্মতজননী হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেকে প্রস্তুত করলেন মহাবিদায়ের জন্য। ৪৫ হিজরির শাবান মাস। তাঁর বয়স ৬৩ পূর্ণ হলো। পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন তিনি।

[তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সাদ: ৮/৬০; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২২৯; আনসাবুল আশরাফ: ১/৪২৭]

ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

তখন চলছিল হজরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল। মদিনার প্রশাসক তখন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। জানাজার নামাজ পড়ালেন প্রশাসক। খাটিয়াও বহন করলেন আলে হাজামের বাড়ির কাছ থেকে হজরত মুগিরার বাড়ি পর্যন্ত। সেখান থেকে তার কাঁধ থেকে নিজের কাঁধে খাটিয়া তুলে নেন হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে তাকে কবরে নামালেন ছোটভাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার ছেলে-আসিম, সালিম, আবদুল্লাহ ও হামজা।

[আল-ইসাবা: ৮/৮৬]

জাইনাব বিনতে খুজাইমা হিলালিয়্যা রাঃ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ ছিলেন নির্ভীক এক লড়াকু সৈনিক। তার সামনে দাঁড়ানোর সাহস ছিল না কোনো কাফির কুরাইশের। বদরযুদ্ধে তিনি আপন বীরত্বের প্রমাণ রাখেন। শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন দুঃসাহসী মনোরথে। কিন্তু উহুদের ময়দানে তিনি শহিদ হন। তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

তার স্ত্রী জয়নাব বিনতে খুজাইমা রাদি. ছিলেন একজন সতীসাধ্বী সম্ভ্রান্ত নারী। আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের শাহাদতের পর বীরত্বের নমুনাস্বরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করেন। শ্রেষ্ঠ নারীর কাতারে তুলে আনেন তাকে। উম্মতের মা হিসেবে বরণ করে নিয়ে তাকে সম্মানিত করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবিতাবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনিই একমাত্র স্ত্রী যার জানাজার নামায নবীজি আদায় করেছেন। এমন সৌভাগ্য কেবল তার একার কপালেই জুটেছে।

হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবন ছিল মাত্র ৩০ বছরের। এর মধ্যে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন মাত্র তিনমাস। তারপরও অসফল নন তিনি। কারণ, এরই মধ্যে তিনি অর্জন করেন নবিজির গভীর ভালোবাসা। হন নবিপ্রেয়সী। আরো অধিকার করে নেন 'বিশ্বাসীদের জননী' বা 'উন্মুল মুমিনিন' হবার অক্ষয় মহিমা।

তিনি ছিলেন দুস্থ মানবতার সেবায় নিবেদিতা প্রাণ। পবিত্র ধর্ম ইসলামে প্রবেশ করার পর নিবিষ্ট মনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগি এবং প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবা ও আনুগত্য করার পাশাপাশি তিনি গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন।

এজন্য তার নাম হয়ে যায় 'উম্মুল মাসাকিন' বা 'দীন-দুঃখীদের জননী'। এই নামে তিনি পরিচিত হতে থাকেন বিশ্বময়। আল্লাহ তাআলা তাকে এর বিনিময় দেন। তার অসহায়ত্বের সময় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশে দাঁড়ান এবং তাকে স্ত্রী হিসাবে বরণ করে নেন। উম্মুল মুমিনিন হওয়ার বিরল সম্মানে বিভূষিতা হন তিনি।

নাম ও বংশ

নাম জায়নাব, উপাধি 'উম্মুল মাসাকিন' বা দীন-দুঃখীদের জননী। জাহেলি জুগেও তাকে ডাকা হতো এই নামে। কারণ, তিনি দরিদ্রদের বেশি বেশি খাবার সম করতেন। তার পূর্ণ নাম হলো, জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া।

পিতার নাম খুজাইমা। তার মায়ের নাম হিন্দ। হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা ছিলেন উম্মুল মুমিনিন মাইমুনার বৈপিত্রেয় বোন। উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লায় আনহার জন্মকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তেমনই জানা যায় না তার শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যকাল বিষয়ে। তবে প্রিয়নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিয়ের সময় তার বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। এই হিসেবে তার জন্ম আমুল ফিলের (হস্তীবর্ষ) ২৬ বছর পরে ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে যতটুকু জানা যায় যে, বাল্যকালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত মাইমুনাকেও বিবাহ করেন। তবে এটা তার ইন্তিকালের অনেক পরের ঘটনা। জায়নাব বিনতে খুজাইমাকে হজরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহার পরে বিবাহ করেন।

[আল ইসাবা: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৫৭]

যেদিন হলো শুভবিবাহ

উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লায় আনহার জন্মকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তেমনই জানা যায় না তার শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যকাল বিষয়ে। তবে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিয়ের সময় তার বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। এই হিসেবে তার জন্ম আমূল ফিলের (হস্তীবর্ষ) ২৬ বছর পরে ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে যতটুকু জানা যায় যে, বাল্যকালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিয়ের আগেও জায়নাব বিনতে খুজাইমার বিয়ে হয়েছিল। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মতানুসারে তার স্বামী হজরত আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদযুদ্ধে নির্মমভাবে শহিদ হন। প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে হিংস্র কাফিররা শহিদের লাশকে বিকৃত করে ফেলে। এতে নবিজিসহ সকল সাহাবায়ে কিরাম ভীষণভাবে ব্যথিত হন।

হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যথা ছিল অনেক বেশি। কারণ, শহিদ আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার প্রাণের প্রিয় স্বামী। এদিকে দয়ার সাগর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তার নসিবে। এজন্য উহুদযুদ্ধই জায়নাব বিনতে খুজাইমার কপাল খুলে দেয়।

হিজরতের ৩১ মাসের মাথায় তথা তৃতীয় হিজরির রমজান মাসে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। নবিজি তাকে ১২ উকিয়া স্বর্ণ মোহর হিসেবে দিয়েছিলেন। ইবনু হিশাম বলেন, চারশ দিরহাম মোহরের বিনিময়ে নবিজি তাকে বিবাহ করেন।

[সিরাতু ইবনি হিশাম: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৪৭]

এক বর্ণনায় আছে, জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার চাচা কাবিসাহ ছবনু আমর আল-হিলালি তাকে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিয়ের মোহর ছিল চারশ দিরহাম।

[সিরাতু ইবনি হিশাম। খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৪৭]

অনুপম গুনের অধিকারী

দানশীলতা মহৎ গুণ। দানশীলতা মানুষের মনে শান্তি আনে। দানের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের নানা রকম বালা-মসিবত থেকে হিফাজত করেন। মনে রাখা দরকার, দান করলে ধন বেড়ে যায় কমে না। তাই দানের হাত প্রসারিত করলে আমাদের ও প্রতিবেশী গরিব-দুঃখীসহ অনেকের উপকার হয়।

দানশীলতার উপকারিতা এবং সব রকম দানের প্রতি উৎসাহ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-সাদকা করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে গরিব-মিসকিনদের দান করে দাও, তবে আরও বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। তোমরা যা করো, সে বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত।“

[সুরা বাকারা: ২:২৭১]

উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার দানশীলতা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি আপন গোত্রসহ আশপাশের গোত্রসমূহের নিকট দানশীলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। দানশীলা হিসেবে সবাই তাঁকে সম্মান জানাতে থাকেন।

কোনো দীন-দুঃখী জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট এসে খালি হাতে ফিরে যেত না। তিনি তার হাতে কিছু না কিছু দিয়েই বিদায় করতেন। এজন্য সব সময় তাঁর দরজায় অভাবী মানুষের ভিড় লেগেই থাকত। কখনো তিনি এতে বিরক্ত হতেন না, বরং খুশি হতেন।

জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা গরিব-দুঃখীদের এমনভাবে সেবা করতেন, যেমন আপন মা তার সন্তানকে পরম আদরে সেবা-যত্ন করে খাত বিষয়টি সবার কাছে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এজন্য তাঁকে 'উম্মুল মাসাকিন' বন্ধু দুঃখীদের জননী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

ইসলাম গ্রহণের পর জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে স খয়রাত করার ঐ প্রবণতা অব্যাহত ছিল। বরং এটা আরও শতগুণে বেড়ে গিয়াছিন দরিদ্র-অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। স সময় অসহায় মানুষের কথা ভাবতেন।

এই অনুপম গুণাবলির দ্বারা জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা পৃথিবীয় অমর হয়ে আছেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে ড. আয়েশা আবদুর রহমান বলেন –

ইতিহাস ও সিরাতবিদগণ জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিদ্রি বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। তবে গরিব-দুঃখীদের প্রতি তাঁর দয়া-দাক্ষিণা সহানুভূতি-সহমর্মিতার এই উত্তম বিশেষণের ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেনা

যতগুলো কিতাবে জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সবখানেই তাঁর উপাধি 'উম্মুল মাসাকিন' তথা 'দীন-দুঃখীদের জননী উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে বরিত হওয়ার পরও নবিজির সেবা ও অন্তঃপুরের ব্যস্ততা গরিব-দুঃখীদের সেবা-যত্ন থেকে তাঁকে দূরে সরাতে পারেনি। মৃত্যু পর্যন্ত এই গুণ তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

[তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়তিন নবুওয়াত: ৩১৭, তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়তিন নবুওয়াত: ৩১৮]

সাহচর্যে ধন্য যে জীবন

উহুদযুদ্ধ কপাল খুলে দেয় উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-আনহার। প্রিয় নবী সাঃ -এর মতো সৃষ্টির সেরা মানুষটিকে এনে দেয় তার বাহুডোরে। সময়ের ব্যবধানে তিনি হয়ে ওঠেন শ্রেষ্ঠ রমণীদের মাঝে অন্যতমা।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে বিয়ে করে ঘরে আনেন, তখন তার বয়স ৩০। আর নবিজির বয়স তখন ৫৬ বছর। এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? তিনিসহ মাত্র ১১ জনের অর্জিত হয়েছিল এই মহাসৌভাগ্য। ক্ষণিকের জন্য হলেও এই সৌভাগ্যের তুলনা চলে না পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে।

কমবেশি যাই হোক না কেন, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্যকে তিনি উপভোগ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গভাবে। বিশেষ করে দানশীলতা ও ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত হয়ে সময়কে করে তোলেন স্বর্ণোজ্জ্বল। জীবনকে দামি করে তোলেন অভাবনীয়রূপে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কতদিন অবস্থান করেছিলেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

হাকিম আবু আবদিল্লাহ নাইসাপুরি থেকে বর্ণিত, কাতাদা রহ. বলেন-

ولم تلبث عنده إلا يسيرا

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে তিনি অল্প কিছুদিন অবস্থান করেন।

[মুসতাদরাকে হাকিম, বর্ণনা: ৬৮০৬]

হাফিজ শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি বলেন-

لم تمكث عنده إلا شهرين أو أكثر

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তিনি কেবল দুমাস বা তার চেয়ে কিছু বেশি দিন অবস্থান করেন।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১৮]

সাইয়িদ আবদুল্লাহ জারদানি বলেন-

ولم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة ثم مات

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে তিনি কেবল দুমাস বা তিন মাস অবস্থান করেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করেন।

[আল-ইসতিআব: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪৫৪; ফাতহুল আল্লাম: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৭]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি ও ইবনুল ইমাদ হাম্বলি রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন-

জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে তিন মাস অবস্থান করেন।

[তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়তিন নবুওয়াত: ৩১৬]

মোটকথা, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা অল্পকাল অবস্থান করেন এবং নবিজির জীবদ্দশাতেই ইন্তিকাল করেন। তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১৮]

নবীজির আনুগত্য ও অল্পে তুষ্টি

উম্মুল মুমিনিন হজরত জাইনাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকেই প্রিয়নবি রাসুল সাঃ -এর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অকৃত্রিম ও অতুলনীয়। সব সময় এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যেত দরবারে রিসালাত নির্দেশিত প্রতিটি বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইবাদত-বন্দেগিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করেন। নবিজি কী বললেন, তিনি কী করলেন, কী করলে তিনি খুশি হবেন-এই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এর বাইরে তিনি কিছু ভাবার সময় পেতেন না।

জাইনাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন, এজন্য তার মনে কোনো রকম অহংকার ছিল না; বরং তিনি এটাকে উপভোগ করতেন ইবাদত-বন্দেগি ও নবিজির আনুগত্যে জীবনোৎসর্গ করার মাধ্যমে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সামান্য যা পেতেন, এতেই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতেন। বাড়তি কোনো চাওয়া-পাওয়া ছিল না কিছুতেই। আসলে ছোটবেলা থেকে দীন-দুঃখীদের সেবা-যত্ন করার কারণে কখনোই তাঁর বাড়তি কোনো চাহিদা ছিল না।

অল্পেতুষ্টির এই উত্তম গুণ জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে ছিল সদা অমলিন। কোনো উচ্চাভিলাষ ও বিন্দু পরিমাণ আত্মঅহংকার ছিল না তাঁর মাঝে। অল্পেতুষ্টির এই উত্তম বিশেষণ থেকে কোনো কিছুই বিচ্যুত করতে পারেনি তাঁকে। সরল-সহজ, অনাড়ম্বর ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি।

[তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়তিন নবুওয়াত: ৩১৮]

দান সদাকা

উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন উজ্জ্বল মাসাকিন বা দীন-দুঃখীদের জননী।

একেবারে ছোটবেলা থেকেই তিনি পিতৃ-মাতৃহারা শিশুদের এবং দরিদ্র-মিসকিনদের ভালোবাসতেন। তার পিতা-পিতামহরা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। তাদের কাছ থেকে তিনি হাত খরচের অর্থ হিসেবে যা পেতেন, তা-ই দিয়ে আদর করে ডেকে খাওয়াতেন গরিব-দুঃখীদের। এ কারণে তাকে সবাই ডাকত'উম্মুল মাসাকিন' বা জীন দুঃখীদের জননী' বলে।

ইবন হিশাম বলেছেন, গরিব মিসকিনদের প্রতি তার অতিরিক্ত দয়ামমতা ছিল বলে তাকে বলা হতো 'উম্মুল মাসাকিন' বা 'দীন-দুঃখীদের জননী'।

[সিরাতু ইবনি হিশাম: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৪৭]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, তিনি বিত্তহীনদের আহার জোগাতেন, তাদের দান-খয়রাত করতেন। তাই তার নাম হয়েছিল 'উম্মুল মাসাকিন' বা 'দীন-দুঃখীদের জননী'।

[আল ইসাবা: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৫৭]

অপরদিকে ইবনু আবদিল বার ও বালাজুরি বলেন, জাহিলি যুগেই তাকে এ নামে ডাকা হতো। অনেক সময় এমনও ঘটেছে যে, তিনি খেতে বসেছেন—এমন সময় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ঘরের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। আর তিনি নিজের খাবার তুলে দিয়েছেন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের মুখে।

[আনসাবুল আশরাফ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪২৯]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা নিজের সম্পদ দিনে বা রাতে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই। তাদের কোনো চিন্তাও নেই।"

[সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭৪]

যে কারণে তিনি মহা সৌভাগ্যবতী

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বমোট স্ত্রী ছিলেন এগারো জন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি প্রথম নবিজির জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন, যাকে মক্কার 'জিহুন' নামক স্থানে বর্তমান জান্নাতুল মা'লা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অতঃপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাঁর ইন্তিকাল হয় মদিনায়।।

নবীজি জি সাঃ নিজে এই দুজন উম্মত জননীর কাফন-দাফনের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে তিন দিক থেকে উম্মুল মু'মিমিন জাইনাব রা: অনন্য-

১. এত কম বয়সে পরলোকগমনকারিণী নবিজায়া কেবল তিনিই।

২. কেবল তিনিই পেয়েছেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতশোভিত নামাজে জানাজা।

৩. তিনি ছিলেন সেই ভাগ্যবতী রমণী, যাকে প্রথম 'বাকিউল গারকাদ'-এ দাফন করা হয়।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জানাজা নামাজ পড়ান। তাঁর তিন ভাই তাঁর কবরে নেমেছিলেন।

তাবাকাতে ইবনু সাদ: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৯২; তারাজিম সাইয়িদাতি বায়তিন নবুওয়াত: ৩১৮; জাওজাতুন - নবি: ৬১; ফাতহুল আল্লাম: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৭

জীবন কখনো হয় সংকুচিত। কখনো প্রসারিত। সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। মহাপুণ্যবতী মুমিন জননী হয়ে জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের সংসারে এসেছিলেন। কিন্তু দুনিয়া-আখিরাতের মহাসৌভাগ্যের জ্যোতির্ময়তার কেন্দ্রে তার অবস্থান দীর্ঘতর হলো না। মাত্র তিনমাস পরেই সাড়া দেন পরম প্রেমময় মহান প্রভুর আহ্বানে। একমাত্র তার জানাজা নবীজি সাঃ নিজে পড়ান। এমনই সৌভাগ্যবতী ছিলেন তিনি।

চিরবিদায়

পৃথিবীতে কেউই অমর নয়। মানুষও মরণশীল। সবাইকে একদিন মৃত্যুর আস করতে হয়; কিন্তু এই মৃত্যু কখন, কোথায় হবে তা নিশ্চিত নয়। আল্লাহ তাআলা হুকুমে জন্ম হয়, আবার তাঁর হুকুমেই মৃত্যু হয়। মনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর ইবাদত করে তাদেরও মৃত্যু আসবে। আবার যারা তাঁর নাফরমানি কর তারাও মরবে। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

(হে নবি!) নিশ্চয় আপনার মৃত্যু হবে। আর ওদেরও মৃত্যু হবে।

[সুরা জুমার, আয়াত: ৩০]

প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহ মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাও তাঁর নির্ধারিত সমায়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তবে তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে।

ইবনুল কালবি বলেন-

وماتت في ربيع الآخر سنة أربع

তিনি চতুর্থ হিজরির রবিউল আখির মাসে ইন্তিকাল করেন।

[তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়তিন নবুওয়াত: ৩১৬]

ইবনু সাদ বলেন-

وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهرًا

তিনি হিজরতের ৩৯ মাসের মাথায় রবিউস সানি মাসের শেষে মৃত্যুবরণ করেন।

[তাবাকাতুল কুবরা: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৯১-৯২; জাওজাতুন-নবি: ৬১]

ড. আয়েশা আবদুর রহমান বলেন-

والراجح انها ماتت في الثلاثين من عمرها

অগ্রাধিকারযোগ্য বক্তব্য হলো, তিনি ৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

[তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়তিন নবুওয়াত: ৩১৮]

ইসলামপূর্ব জাহিলিযুগ থেকেই উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন দুস্থ মানবতার সেবায় নিবেদিতা প্রাণ। তাঁর এই বর্ণনাতীত সৎকাজের সুমহান পুরস্কার আল্লাহ তাআলা তাঁকে পার্থিব জীবনে দান করেছেন, উম্মল মুমিনিন হওয়ার বিরল সম্মানে ভূষিতা হন তিনি।

যদিও প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল অতি অল্প সময়ের, কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য হলো নবিজি নিজেই তাঁর জানাজা নামাজ পড়ান।

উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে খুজাইমা আল-হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর সংগ্রামী জীবনে সদা দীন-দুঃখীদের পাশে ছিলেন। তাদের প্রয়োজন পূরণই ছিল তাঁর সতত সাধনা। এই অনুপম গুণই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁর মতো গুণসমূহ অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

জাইনাব বিনতে জাহাশ আসাদিয়্যা রাঃ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন উম্মুল মুমিনিন জিজ্ঞেস করলেন-আপনার পর আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে?

নবিজি বললেন –

"তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ।"

[সহীহ : বুখারী ১৪২০, মুসলিম ২৪৫২]

নবিজির ইন্তিকালের পর উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করলেন হজরত জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা। অন্য সকল উম্মুল মুমিনিনগণ বুঝতে পারলেন, নবিজি দীর্ঘ হাতের কথা বলেছেন উপমাস্বরূপ। তিনি বুঝিয়েছেন-যে অধিক সাদকা করে।

হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা 'উম্মুল মাসাকিন' নামে সবার কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ দান করতেন। নিজের কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখতেন না। নিজে সেলাইকর্ম করে যা পেতেন-সেসবও দান করে দিতেন।

এ মহীয়সী নারীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জগতের এমন অনেক নিয়ম ভেঙেছেন, যেগুলো ছিল মানুষের তৈরি কুসংস্কার। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিনি পেয়েছেন অনেক মর্যাদাও।

নাম, জন্ম ও বংশ

উম্মুল মু'মিনিন যাইনাব বিনতে জাহাশ যার প্রথম নাম ছিল বাররাহ। উম্মুল মুমিনি হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা নবুওয়াতের তেত্রিশ বছর পূর্বে মক্কার উপকণ্ঠে এমন এক পরিবারেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করেন। যে পরিবারের মা, ভাই, বোন, খালা এবং মামাদের প্রায় সকলেই ছিলেন মুমিন, ঈমানদার। সকলেই ধন্য হয়েছেন নবিজির সোহবতে।

মহীয়সী আম্মাজান এমন শ্রেষ্ঠ মানুষদের তত্ত্বাবধানেই বেড়ে ওঠেন। খেলার বয়সে শিখে নেন তির চালনা। মক্কার অলিতে-গলিতে ঘোড়সওয়ারি করেন। দক্ষ হয়ে ওঠেন বাগ্মিতায়। চাল-চলনে চলে আসে শালিনতা। পোক্ত হয়ে ওঠেন শিক্ষাদীক্ষা, আত্মরক্ষা ও কাজকর্মে।

জাহাশ পরিবারের প্রায় সকলেই ছিল ব্যবসায়ী। তারা চামড়া শোধন করতেন। আম্মাজান বাররাহ বিনতে জাহাশও এই কাজে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এছাড়াও তিনি হস্তশিল্পে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন। সুই দিয়ে বিভিন্ন জিনিস ফোঁড়ন করে জীবিকা নির্বাহ করার পদ্ধতি শিখে নেন। এজন্য তার উপাধি হয়ে যায় 'সান্নাউল ইয়াদ'

[উসদুল গাবাহ: ৫/৪৬৪]

আম্মাজান হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহার পিতা ছিলেন জাহাশ ইবনু রিবাআ। তিনি ছিলেন আসাদ ইবনু খুজাইমা গোত্রের অভিবাসী এবং যিনি উমাইয়া বংশের সুরক্ষায় মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি ইসলামের যুগ পাননি ঠিকই, কিন্তু তিনি ছিলেন দানবীর ও পরোপকারী। লোকেরা তার প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। ইসলামপূর্ব যুগে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় আসেন এবং কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে অংশীদারি কারবারে সম্পৃক্ত হন।'

আম্মাজান হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহার মা ছিলেন উমামা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, কুরাইশ গোত্রের হাশিম বংশের সদস্য এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফু। তিনি ছিলেন সৌন্দর্য, আত্মমর্যাদা, বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা, উদারতা, কবিতা, গদ্য ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মর্যাদার অধিকারী। অনেকের মতে তিনি ইসলাগ্রহণ করেন। ঈমান আনেন রবের প্রতি। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারযুদ্ধের গনিমত থেকে তাকে চল্লিশ ওয়াসাক খেজুরও হাদিয়া দেন।'

কে সেই মহীয়সী

আম্মাজান যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ষষ্ঠ অথবা সপ্তম স্ত্রী। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফা জাহাশ ইবনু রিবাআর ঔরসে জন্মানো পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সন্তান বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন দ্বীন, তাকওয়া, বদান্যতা, দানশীলতা ও খ্যাতির আলোকে একজন শ্রেষ্ঠ নারী। তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু, ধৈর্যশীলা, মুহাদ্দিসা, সতীসাধ্বী, অকুতোভয় ও কল্যাণকামিতায় অগ্রগামী একজন পবিত্রতম নারী। তিনি ছিলেন দয়ার্দ্রতা, হামদর্দী, স্নেহপরায়ণ, দুনিয়াবিমুখ, রূপবতী, গুণবতী ও উম্মাহাতুল মুমিনিনদের সম্মানিত মা।

১ম বিবাহের প্রস্তাব

প্রস্তাব বিয়ের বয়সে উপনীত হয়েছেন বাররাহ বিনতে জাহাশ। তাই উপযুক্ত পাত্র খুঁজছে তার পরিবারের লোকজন। বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ এবং হামনা বিনতে জাহাশ এ বিষয়ে বেশ তৎপর ছিলেন। তারা বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনোটাই তাদের মনঃপূত হচ্ছিল না।

একপর্যায়ে হজরত বাররাহ বোন হামনাকে বললেন- তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও। তাঁর কাছে আমার বিষয়টি উপস্থাপন করে একজন ভালো পাত্রের সন্ধান দিতে বলো। হামনা বিনতে জাহাশ বোনের কথা রাখতে একদিন চললেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাক আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। গিয়ে আরজ

করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার বোন জায়নাবের জন্য উপযুক্ত একজন পাত্র প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ, নানান পরিবার থেকে প্রস্তাব আসছে, কিন্তু মনঃপুত হচ্ছে না কোনো পাত্রই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- বাররাহ কি এমন পাত্র পছন্দ করবে, যে তাকে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসুলের সুন্নাত শেখাবে? নবিজি ছিলেন হজরত জায়নাবের ফুফাতো ভাই। এজন্য তাঁর বিয়ে নিয়ে চিন্তা করা নবিজির ওপরও বর্তায়।
তাই তিনি এমন পাত্রের কথা উত্থাপন করলেন, যে দ্বীনদার, দৃঢ় প্রত্যয়ী, ঈমানে মজবুত এবং জ্ঞান-গরিমায় অতুলনীয়। নবিজির প্রশ্ন শুনে হজরত হামনা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন- সে কে ইয়া রাসুলাল্লাহ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- সে আর কেউ নয়, জাইদ ইবনুল হারিসা। নাম শোনামাত্র অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়ে গেলেন হজরত হামনা। মানবীয় ক্ষোভগোপন করতে পারলেন না তিনি। বলে উঠলেন- বাররাহ আপনার ফুফাতো বোন, অথচ আপনার ফুফাতো বোনকে আপনি আপনারই আজাদকৃদ গোলামের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন?

এ কথা শুনে নবিজি কিছু বললেন না। জবাব না পেয়ে চলে গেলেন হজরত হামনা। কে ছিলেন সেই জাইদ? যার নাম শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করে চলে গেলেন হজরত হামনা বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা? নবিজি কেনইবা হঠাৎ তার নাম প্রস্তাব করলেন? চলুন, জেনে নেওয়া যাক তার অন্তর্নিহিত কারণ।

[হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া: ২/৫২]

হজরত জাইদ ইবনু হারিসা

হজরত জাইদ তখন কিশোর। মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান। মা তাকে যারপরনাই ভালোবাসেন। সব সময় চোখে চোখে রাখেন। চোখের আড়াল হলেই বিচলিত হয়ে ওঠেন। এজন্য কোথাও গেলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। এক্ষেত্রে জাইদের বাবা হারিসাও কোনো অংশে কম নন। সন্তানকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন তিনি। কিন্তু কে জানত, তাদের কলিজার টুকরো সন্তান একদিন চিরতরে চোখের আড়াল হয়ে যাবে। তাদের ভালোবাসা ও সমাদর একজন মহামানবের ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণের কাছে ফিকে হয়ে যাবে...

একদিনের ঘটনা। কোনো এক কাফেলার সঙ্গে মা তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন। কাফেলায় স্বগোত্রীয় আরও অনেকেই ছিল। কেউ উটের পিঠে, কেউ পায়ে হেঁটে আপন গন্তব্যে চলেছেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস; তারা আবাসভূমিতে পৌঁছার পূর্বেই তাদের ওপর আক্রমণ করে বসল লুটেরাবাহিনী। লুটেরার দল কাফেলার সদস্যদের সকল অর্থ-সম্পদ, গয়নাগাটি এবং যাবতীয় মালামাল ছিনিয়ে নিল। একমাত্র বাহন উটগুলোও কেড়ে নিয়ে বেশ কজনকে বন্দি করল। আট বছরের ছোট্ট বালক জাইদ ইবনুল হারিসাও বন্দি হলেন

তাদের হাতে। বালক জাইদকে তারা বিক্রির পাঁয়তারা করল। এজন্য তাকে নিয়ে চলল তৎকালের প্রসিদ্ধ উকাজের মেলায়। মেলায় পৌঁছে মাত্র চারশ দিরহামে কুরাইশ বংশের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি হাকিম ইবনু হাজামের কাছে বিক্রি করে দিলো।

হাকিম আরও কজন বালককে কিনে রওনা দিলো মক্কায় পথে। মক্কায় পৌঁছে সে একটু বিশ্রাম নেবে, এমন সময় উপস্থিত হলেন তার ফুফু খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। ফুফু তাকে দেখে শুভেচ্ছা জানালেন। হাকিম তার ফুফুকে লক্ষ করে বলল- ফুফু! আজ আমি উকাজের মেলা থেকে বেশ কজন বালক ক্রয় করে এনেছি। আপনি ওদের দেখুন। আপনার যাকে মনে ধরবে তাকেই আপনার জন্য হাদিয়া। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ গভীরভাবে বালকদের চেহারা পর্যবেক্ষণ করলেন। তন্মধ্যে জাইদের মাঝে বুদ্ধি ও মেধার নিদর্শন দেখে তাকেই মনে ধরল তার। এরপর ভাতিজার কথামতো তাকে নিয়ে ফিরে চললেন নিজগৃহে। এর কিছুদিন পরই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আম্মাজা খাদিজার বিবাহ সম্পাদিত হলো। বিয়ের পর আম্মাজান খাদিজা তাঁর প্রিয়ত স্বামীকে সর্বোৎকৃষ্ট কোনো উপহার দেওয়ার কথা ভাবলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কাছে জাইদের চেয়ে উত্তম কোনো উপহার ছিল না। তাই তিনি জাইদকেই রানীর খিদমতে পেশ করলেন। এভাবেই খুলে গেল কিশোর জাইদের ভাগ্যে। তিনি বেড়ে উঠলেন আল্লাহর রাসুলের স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও তাঁর পরশতুল্য সান্নিধ্যে। তার শরীর ও মনের বিকাশ ঘটতে লাগল নবিজির সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রমাধুরীর সংস্পর্শে।

হঠাৎ একদিন জায়েদের পিতা ও চাচা তার খোঁজ পেয়ে নিতে এলেন রাসূল সাঃ এর বাড়িতে। বালক জাইদ বাপ-চাচাকে দেখে খুশি হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তাদের সঙ্গে চলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তিনি এখানে মায়ের আদরের চেয়েও আম্মাজান খাদিজার কাছে বেশি আদর পাচ্ছেন। বাবার স্নেহের চেয়েও আশ্চর্য এই মানুষটির কাছে অধিক স্নেহ পাচ্ছেন। তাছাড়া এই লোকটির মাঝে সন্নিবেশিত হয়েছে সকল গুণের সমাহার। কখনো তাঁকে ধমক দিতে দেখা যায় না। কখনো মিথ্যা বলতে শোনা যায় না। সবার সঙ্গে নমনীয় আচরণ করেন। সবাইকে আপন করে নেন। সুতরাং

এমন মানুষকে রেখে জাইদ কোথায় যাবেন? এই চরম সত্য কথা তুলে ধরে জাইদ পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- আব্বাজান! আমি এই মহান ব্যক্তির মাঝে অভূতপূর্ব এমন অনেক গুণাবলি দেখেছি, যা ছেড়ে যাওয়া মোটেও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এখানেই থাকছি। এই মহামানবের কাছেই থাকছি।

নবিজি কিশোর জাইদের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। মানসিকতা আঁচ করতে পারলেন ছেলেটার। এজন্য সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে চললেন কাবা চত্বরের দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখলেন বেশকিছু লোকের সমাগম। নবিজি তাদেরকে সাক্ষী রেখে হাজরে আসওয়াদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর জাইদের হাত ধরে সমুচ্চো কণ্ঠে ঘোষণা করলেন- হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা সাক্ষী থেকো, আজ থেকে এই কিশোর আমার সন্তান। সে আমার উত্তরাধিকারী। আমিও তার উত্তরাধিকারী। এই দৃশ্য দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন জাইদের বাপ-চাচা।

উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাদের গহীন মন। মুহর্তেই দূর হয়ে গেল দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। বুঝতে পারলেন-জাইদ ছোট হলেও দয়াপরবশ এমন মহামানবকে চিনতে ভুল করেনি। এজন্য তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই মহান

ব্যক্তির আদলে রেখে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন তারা। তৎপরে ঠিকই সন্তানকে তার নতুন পিতার কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে চললেন। এই ঘটনার পর থেকে জাইদ ইবনুল হারিসাকে জাইদ ইবনু মুহাম্মদ নামে ডাকা শুরু হলো।

[সহিহ মুসলিম, ৭/১১৩, বাবু ফাজায়িলিস সাহাবা। আল মাজমা, হাদিস: ১৫৫০৭। রিজালু ওয়া নিসায়ি হাওলির রাসুল, পৃষ্ঠা: ২৫৭। আল ইসাবা, ১/৫৬৩। সিফাতুস সাফওয়া: ১/১৪৭। সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহারা, প্রথম খণ্ড, জাইদ ইবনু হারিসার জীবনী দ্রষ্টব্য। মাআল মুফাসসিরিন ওয়াল মুসতাশরিকিন, পৃষ্ঠা: ৬১]

বিয়ে ও বিচ্ছেদ

হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা বোন হামনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন। জাইদ যে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, এ ব্যাপারটি তিনি আঁচ করতে পেরেছেন কদিন আগে। এজন্য তার মাথায়ও নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। দেখা যাক, রাসুলুল্লাহ কী বলেন। তিনি হয়তো ভালো কোনো ছেলের প্রস্তাব দেবেন। ইতোমধ্যে এসে পৌঁছলেন বোন হামনা বিনতে জাহাশ। চটজলদি হজরত বাররাহ জানতে চাইলেন –

আল্লাহর রাসুল কী বললেন? হজরত হামনা বিষণ্ণ মনে জবাব দিলেন- নবিজি সরাসরি জাইদের প্রস্তাব দিয়েছেন। এ কথা শুনে হজরত বাররাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন। দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরল তারে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে বোনের মতো তিনিও বেশ ক্ষোভ ঝারলেন। কঠিন সুরে বললেন- এ কী করে সম্ভব?

ওদিকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত জাইদকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে পৌঁছলে তাকে বললেন- জায়নাবের বোন হামনা এসেছিল। তার বোনের জন্য ভালো কোনো পাত্রের সন্ধান চাইল। আমি অবশ্য তোমার নাম প্রস্তাব করেছি। এ কথা শুনে বেজায় খুশি হলেন হজরত জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু এই খুশি দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ, নবিজি তাকে জানিয়ে দিলেন বিয়ের প্রস্তাবকে ঘিরে সৃষ্ট সমস্যা ও জটিলতার কথা। তার বোন যে বিষয়টা পছন্দ করেনি, সেটাও জানালেন জাইদকে। অবশেষে বললেন-

''বাররাহও এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবে বলে মনে হচ্ছে না। সে তো আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন একজন কুরাইশি নারী।''

জাইদ বললেন –

ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এবার নিজে গিয়ে এ বিষয়ে জায়নাবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপনি আমায় কতটা ভালোবাসেন, তুলে ধরতে পারেন সে কথাও।

''রাসূল সাঃ বললেন- তা নাহয় করলাম। কিন্তু তুমিও জেনে রেখো জাইদ, বাররাহ কিন্তু বেশ বাকপটু নারী।''

[সিরিন ওয়াল মুসতাশরিফিন, পৃষ্ঠা: ৬১]

এরপর সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চললেন জাহাশ পরিবারে। তাদের কাছে পৌঁছে স্পষ্ট উচ্চারণে জানিয়ে দিলেন-

"জাইদকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। সুতরাং তোমরা আমার কথামতো জাইদের সঙ্গে জায়নাবের বিয়ের ব্যবস্থা করো। এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।"

[হালাবিইয়্যাহ: ৩/৩২০, উম্মুল মুনিনিন বাররাহ বিনতে জাহাশ, পৃষ্ঠা: ৮৩-৯২]

এ কথা শুনে হজরত বাররাহ দোটানায় পড়ে গেলেন। তার চিন্তার আকাশে ভিড় করল ভারী দুটি বিষয়। একদিকে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনের শাফি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব, যা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না। অপরদিকে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা শ্রেণিবৈষম্যের দেয়াল। যাকে উপেক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণ, এই বিয়েতে সম্মতি দেওয়ার অর্থ হলো আদিকাল থেকে চলে আসা বংশীয় অধিকারকে মিটিয়ে দেয়া।

এজন্য তিনি নবিজির প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে কী বলবেন-ভেবে পেলেন না। একপর্যায়ে সবদিক বিবেচনা করে সমাজের রীতিপ্রথাকে প্রাধান্য দিয়ে বলতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! জাইদের বংশের সঙ্গে আমার বংশের কোনো তুলনা চলে না। আমি তার বংশের চেয়ে উত্তম বংশের মেয়ে। আমি তাঁকে বিয়ে করতে পারছি না। কুরাইশ বংশের একজন কুমারী মেয়ে হয়ে তাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমি তো আবদে শামস গোত্রের মধ্যে সর্বাধিক অভিজাত নারী।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভেবেছিলেন, তা-ই হলো; হজরত বাররাহ বংশের কারণে না করে দিলেন। কিন্তু নবিজি তো এই শ্রেণিবৈষম্য, বংশের অগ্রাধিকার ও সামাজিক রীতিনীতিকে নিঃশেষ করতেই রাসুল হিসেবে এ ধরায় আগমন করেছেন। তিনি কী করে মেনে নেবেন জায়নাবের কথা। এজন্য তিনি হজরত জায়নাবের কথার বিপরীত মত প্রকাশের লক্ষে। একটু কঠিনকার বললেন-

"আমি জাইদকে তোমার পাত্র হিসেবে মনোনীত করছি। সুতরাং তার কাছেই তোমার বিয়ে বসতে হবে।"

এ কথা শুনে তিনি কিছুটা নমনীয় হলেন। নরম সুরে বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে একটু সময় দিন, আমি নিজের সঙ্গে কিছুটা বোঝাপড়া করি। কোনো পোক্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই তাঁদের এই কথোপকথন শেষ হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে চললেন আপন গন্তব্যে।

হজরত বাররাহ যখন নিজের মতামত প্রকাশ করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা সেটা পছন্দ করলেন না। হজরত জায়নাবের বিপরীত মত প্রকাশ তাঁর মনঃপূত হলো না-কারণ, তিনিই তো তাঁর রাসুলকে পাঠিয়েছেন লোকসমাজে প্রচলিত এই বৈষম্য ঘুচিয়ে সব কিছুর ওপর দ্বীনকে অগ্রগণ্য করার দীক্ষা দেওয়ার জন্য। এজন্য তিনি অপেক্ষার এই সময়টাতে কুরআনের আয়াত নাজিল করলেন। পরিষ্কার ঘোষণা দিলেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا .

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, তখন সে বিষয়ে কোনো মুমিন নরনারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছাধিকার থাকতে পারে না। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে, সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহ হবে। **[সুরা আহজাব, আয়াত: ৩৬]**

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত বাররাহ, হজরত হামনা এবং ভাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সকল দ্বিধা ও সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে গেল। মনে আর কোনো সংশয় রইল না। কারণ, তারা সকলেই ছিলেন রবের একনিষ্ঠ বান্দা, রাসুলের সর্বোত্তম সহচর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মমিন। তাই নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন নবিজির প্রস্তাব।

এরপর কাঙ্ক্ষিত সেই আকদ সম্পূর্ণ হলো। বিয়েতে অত্যন্ত খুশি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নিজে অংশগ্রহণ করলেন বিয়ের ব্যয় নির্বাহে। নবদম্পতিকে নগদ দশটি লাল দিনার, ষাটটি সফেদ দিরহাম, একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থালির তৈজসপত্র ও কাপড়চোপড় হাদিয়া দিলেন। এর মধ্যে ছিল একটি ওড়না, একটি কম্বল ও একটি লুঙ্গি। এখানেই শেষ নয়; পাশাপাশি তিনি পঞ্চাশ কেজি খাবার, পঁচিশ সের আটা এবং পাঁচ সের খেজুরও হাদিয়া দিলেন। এমনকি বিয়ের ওলিমার আয়োজন করলেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই। শুধু কি তাই? বিয়ের ওলিমায় তিনি অভাবী ও দুঃস্থদের রুটি ও গোশত দিয়েও আপ্যায়ন করলেন। সুবহানাল্লাহ।

আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ, ৩/৩২০,

আলি ইবনে বুরহান হালাবি অবশেষে হজরত বাররাহ ও জাইদের মধ্যকার বিয়ের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করলেন প্রথাগত বৈষম্যের বাতুলতা।

পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিলেন-

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه

যদি তোমাদের কাছে এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারি ও আখলাক নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার কাছে বিয়ে দিয়ে দিয়ো।

[কিতাবুন নিকাহ, বাবুক আকফা, ইবনে মাজাহ: ১/৬৩২]

তদুপরি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের আরেকটি শ্রেণির সম্মান ফিরিয়ে দিলেন। হজরত বিলাল, সুহাইব এবং সালমান ফারসির মতো ব্যক্তিদেরকে বসালেন মর্যাদার সুউচ্চ আসনে। যে মর্যাদার মানদণ্ড নির্ধারণ করলেন আল্লাহ। ঘোষণা দিলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم

''নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।''

এ ব্যাপারে উসতাদ সাইয়িদ কুতুব শহিদ রাহিমাহুল্লাহ তার রচিত গ্রন্থে লিখেছেন-

জাইদের সঙ্গে বনু হাশিমের সম্ভ্রান্ত সেই নারীকে বিয়ে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করলেন; এমনকি নিজ পরিবার থেকেই সর্বপ্রথম এই শ্রেণিবৈষম্যের বিষয়টি দূর করলেন। কারণ, বাররাহ ছিলেন নবিজির খুব কাছের আত্মীয়া। বস্তুত এই বৈষম্য ছিল খুবই কঠিন ও জটিল। একমাত্র রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তবিক সেই সিদ্ধান্তই তা মিটিয়ে দিতে পেরেছে। যাতে মুসলিম সমাজ বিষয়টিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। মানবসভ্যতা যাতে তাঁরই দেখানো পথে হাঁটতে পারে।

[ফি জিলালিল কুরআনিল কারিম: ৫/২৮১৫]

উভয়ের বিয়ে দিতে পেরে প্রশান্তি অনুভব করলেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আশ্বস্ত হলেন প্রিয় রাসুল। তাঁর এই বিশ্বাস জন্মাল যে, এই বিয়ের মাধ্যমে জাইদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। চিন্তায় ও অনুভূতিতে দাসত্বের যে গ্লানি লেগে ছিল, চিরদিনের জন্য তা মুছে যাবে।

[মাআল মুফাসসিরিন ওয়াল মুসতাশরিকিন, পৃষ্ঠা ৬১]

ভালোই চলতে লাগল তাদের সংসার। হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করে, আবদে শামসের সম্ভ্রান্ত নারী হওয়ার কথা ভুলে, লোকসমাজের রীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন রবের প্রতি। বরণ করে নিলেন জাইদ ইবনুল হারিসাকে। কিন্তু এই সংসার বেশিদিন টিকে থাকলো না। হজরত বাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বুঝে গেলেন-জাইদ এখন আর 'ইবনু মুহাম্ম নেই। তিনি এখন ইবনুল হারিসা। কারণ মহান আল্লাহ ওহী নাযিল করে জানিয়ে দিলেন পালক পুত্রকে নিজ পুত্রের পরিচয় দেয়া যাবে না, তার জন্মদাতা পিতার পরিচয় দিয়েই বড় করতে হবে। আর এই প্রথা ভঙ্গ করার জন্য আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন-

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَ مَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ ، وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، ادْعُوهُمْ لا بَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

"তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি; এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়েই ডাকবে; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ।"

[সুরা আহজাব, আয়াত: ৪-৫]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে হজরত বাররাহ চিন্তা করলেন তার স্বামী এখন বাকি দশজনের মতো সাধারণ গোলাম। হ্যাঁ, তিনি আজাদকৃত গোলাম, কিন্তু 'গোলাম' শব্দটি তো আর তার থেকে বিলপ্ত হয়নি। অর্থাৎ কুরাইশ বংশের অভিজাত নারী জায়নাবের স্বামী একজন আজাদকৃত গোলাম। বিষয়টি মেনে নিতে পারলেন না হজরত বাররাহ।

এখান থেকেই হজরত জাইদ ও জায়নাবের মাঝে শুরু হলো মনোমালিন্য। মানবীর দুর্বলতার কারণে হজরত বাররাহ নিজেকে জাইদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করলেন। হজরত বাররাহ হজরত জাইদ ইবনুল হারিসা রাদিয়াল্লা আনহুকে কথায় কথায় বড়াই করে কষ্ট দিতে লাগলেন। স্বভাবজাত শান্ত-শিষ্ট জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সংসার জীবনটা বিরক্তিকর ঠেকল। তার মনে হলো, এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ এখন বিচ্ছেদ। এজন্য পরামর্শ করার দরকার নবিজির সঙ্গে। কিন্তু কীভাবে যাবেন নবিজির কাছে? কী বলবেন গিয়ে নবিজিকে? তিনি তো সতর্ক করে বলেছনই যে-সাবধান জাইদা বাররাহ কিন্তু বাকপটু নারী।

তাছাড়া বিয়ের জন্য এতকিছু করলেন তিনি, কত মানুষের কাছে গেলেন তার জন্য। এখন কীভাবে গিয়ে বিচ্ছেদের কথা বলবেন? এসব ভাবতে ভাবতেই শেষ হয়ে গেল হিজরি চতুর্থ সন। কিন্তু হজরত জায়নাবের সঙ্গে তার তিক্ততা বেড়েই চলল। এজন্য তিনি বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করলেন নবিজির সম্মুখে যাওয়ার জন্য।

এরপর তিনি দিন-ক্ষণ ঠিক করে চললেন নবিজির দরবারে। এই মুহূর্তে হজরত জাইদ বসে আছেন নবিজির সামনে। কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে যা কিছু বলতে এসেছিলেন, তার কিছুই মাথায় আসছে না। শুধু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বিচ্ছেদের কথা। কিন্তু বলতে দ্বিধা হচ্ছে ভীষণ। পরক্ষণেই ভাবছেন, না বলেও তো উপায় নেই। এভাবে সংসার টিকিয়ে রাখা যায় না। এজন্য তিনি সাহস করে কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলে উঠলেন-

‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! বাররাহ তার কথার বাক্যবাণে আমাকে প্রতিনিয়তই বিদ্ধ করে চলেছে।‘

আমি আর মেনে নিতে পারছি না। এজন্য তাকে তালাক দিতে চাই। উত্তরে নবিজি বললেন- জাইদ! তাকওয়া অবলম্বন করো, আরেকটু সময় নাও, স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও। হজরত জাইদ আর কথা বাড়ালেন না। নবিজি সময় নিতে বলেছেন। ব্যস, আর কোনো কথা নেই। তিনি আরও কিছুদিন দেখবেন।

এই ভেবে তিনি মজলিস থেকে উঠে আপন গন্তব্য চললেন। এভাবে কেটে গেল আরও কিছুদিন। কিন্তু কোনোমতেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। নম্র স্বভাবী মানুষটার কাছে জায়নাবের ব্যক্তিত্বের ভার বড়

দুর্ভার ঠেকল। তিনি আর সইতে পারলেন না। সরাসরি তালাক দিয়ে দিলেন। চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে গেল তাদের মাঝে।

[তাফসিরে সাদি, ৪/১৫৬। মিন কিসাসিন নিসা ফিল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১২৫]

নবীজির প্রস্তাব

চলছে হিজরি পঞ্চম সন। হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্দত পালন করছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ-'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েজ পর্যন্ত-অনুযায়ী হজরত বাররাহ তিন হায়েজ অতিক্রম করলেন। এখন তার কাছে মাহরামগণ বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবেন। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বেই ঠাহর করেছেন যে, জাইদ তার স্ত্রীকে তালাক দেবে। এরপর তিনি আল্লাহর ইশারায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন। তালাকের পর হজরত বাররার ইদ্দত শেষে নবিজি তাই করতে চাইলেন; প্রস্তাব পাঠাতে চাইলেন বাররার কাছে।

কিন্তু লোকদের সমালোচনার ভয়ে মুনাফিকদের তীর্যক কথার আশঙ্কায় তিনি প্রস্তাব পাঠাতে পারছিলেন না। কারণ, তারা ঘটা করে রটিয়ে বেড়াবে দেখো দেখো, মুহাম্মদ কী অপকর্মটাই না করেছে। অবশেষে সন্তানের স্ত্রীকেই নিজের হেরেমে নিয়ে রাখল! যদ্দরুন নবিজি এই পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করতে লাগলেন। ওদিকে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন আল্লাহ তাআলা।
কারণ, যে বিয়েকে তিনি হালাল এবং বৈধ করেছেন, সে বিয়েতে কেন নবিজির দ্বিধা হবে? তিনি তো তাকে পাঠিয়েছেন তাঁর হালালকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁর হারামকে মূলোৎপাটন করতে। কিন্তু কেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা দ্বিধা করবেন? কেনইবা মানুষের সমালোচনার ভয় করবেন? মানুষের তীর্যক কথায় কীইবা এসে যায়? অথচ সব কিছুর নিয়ন্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এজন্য তিনি কিছুটা রেগে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলেন আল্লাহর দূত হজরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম। তিনি এসে নবিজিকে জানালেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন-

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ

আর আপনি লোকদের সমালোচনার ভয়ে এমন বিষয় অন্তরে গোপন করছেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান। অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত।

[সূরা আহজাব, আয়াত: ৩৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লান্ত আলাইওি ওয়া পরামের পরিত্র হৃদয়টা হায় হায় করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তলব করলেন অজরত পাদ ইবনুস হারিসাকে। তিনি উপস্থিত হলে বললেন- বাররার কাছে আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাও।

রাসূল সাঃ এর আদেশ অনুযায়ী পৌঁছে গেলেন হজরত বাররার বাড়ির অলিন্দায়। দূর থেকে লক্ষ করলেন, বাররাহ আটার খামির বানাচ্ছেন। তিনি সরাসরি বাররার কাছে গেলেন। হঠাৎ হজরত জাইদের ওপর আতঙ্ক ভর করল। মুহূর্তই মাথায় এলো একটি বিষয়। তিনি ভাবলেন-বাররার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন নবিজি, এর অর্থ বলো বারবাহ নবিজির স্ত্রী হতে চলেছেন। আর নবিজির স্ত্রীগণ আমাদের মা। এই ভাবনা আসামাত্রই পেছন ফিরে দাঁড়ালেন হজরত জাইদ। কিছুটা পেছনে সরে এসে বললেন-

''বাররাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার কাছে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।''
অকস্মাৎ এমন হৃদয় মূর্ছিত বক্তব্য শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন যেন তিনি। তাৎক্ষণিক কী জবাব দেবেন, ভেবে পেলেন না। কিন্তু তার মনে পড়ে গেল ইসতিখারার কথা: কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করার কথা। এজন্য হ্যাঁ বানা বলার ক্ষেত্রে কল্যাণকর বিষয়টি কামনা করার জন্য আল্লাহর সাহায্য পেতে চাইলেন।

কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে কাজ-কর্মের ব্যাপারে ইসতিখারা করার নিয়ম-পদ্ধতি এতটা গুরুত্বের সঙ্গে শিখিয়েছেন, যতটা গুরুত্বের সঙ্গে তাদের কুরআন মজিদের কোনো সুরা শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন-যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করবে এবং সে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হবে, তখন তার উচিত ইসতিখারা করা।

একথা মনে পড়তেই বাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- ইসতিখারা না করে, আমার রবের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারছি না। এইটুক বলেই তিনি আনন্দের আতিশয্যে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন।

শুভবিবাহ পড়ালেন আল্লাহ তা'আলা

প্রস্তাব শুনে হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা নানা ে গেলেন। বোঝাপড়া আরম্ভ করলেন মহামহিম রবের সঙ্গে। হজরত জাইদ আকে নামাজে রেখেই বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। ছুটে চললেন রাসুলুল্লাহ সাল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। এদিকে ঠিক সে সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতার হলো আল্লাহর ওহি। আল্লাহ তাআলা নবিজির বিয়ের খুতবা ও আকদ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঘোষণা দিলেন-

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

জাইদ তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আমি জায়নাবকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম।
[সুরা আহজাব, আয়াত: ৩৭]

বিয়ে হয়ে গেল নবীজির হজরত বাররার সাথে। কোনো ওলির প্রয়োজন পড়ল না। কোনো সাক্ষীর দরকার হলো না। কোনো মহর নির্ধারণ করতে হলো না। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে পড়ালেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনি কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন নবিজির বিয়ের কথা।

সুতরাং আল্লাহর চাইতে আর কে বেশি সত্যবাদী হতে পারে? আর এ বিষয়টি কেবল প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একার বৈশিষ্ট্য। এই বিয়ের মাধ্যমে মানুষের বানানো দ্বিতীয় প্রথার বিলুপ্তি ঘটল। নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে উন্মুক্ত হলো একটি বদ্ধ দুয়ার। পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার পথ উন্মোচিত হলো। মুসলিম উম্মাহ পেল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি উত্তম আদর্শ।

[জাদুল মাআদ: ১/৪২]

প্রথম প্রবেশ

আয়াত নাজিল হওয়ার পরপরই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চললেন হজরত বাররার বাড়ি। আল্লাহ তাআলা নিজে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পর আসলে আর কোনো লৌকিকতার প্রয়োজন পড়ে না। তাই নবিজি আম্মাজান বাররার বাড়ি পৌঁছে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলেন তার ঘরে। প্রবেশ করে সালাম দিলেন বাররাহ বিনতে জাহাশকে। হজরত বাররার হৃদয় তখন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। খুশিতে একেবারে আটখানা হয়ে গেলেন তিনি।

যে মানুষ পুরো পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ, যে মানুষ পৃথিবীর সকল রাজার রাজা, যে মানুষ আরবের শ্রেষ্ঠ দুলাল, যে মানুষ ছেলেবেলা থেকেই আল-আমিন, যে মানুষ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যে মানুষটির হৃদয় সকলের জন্য প্রতিনিয়ত তড়পায়, যে মানুষ সকলে মুমিন হওয়ার জন্য কাঁদেন, যে মানুষ সকল নবিগণের নবি, যে মানুষের হাতে কিয়ামতের দিন শুকরিয়ার ঝান্ডা থাকবে, যে মানুষ হাশরের মাঠে একাই সুপারিশের অধিকার রাখেন, যে মানুষ কবরে জীবিত থাকবেন, সেই মানুষটি আজ তার ঘরে তাশরিফ রেখেছেন, সেই মানুষটি এখন তার একান্তই আপন।

পঁয়ত্রিশের নারী বাররাহ বিনতে জাহাশ যেন ষোলো বছরের কিশোরী হয়ে গেলেন। আনন্দে কেঁদে ফেললেন তিনি। লজ্জায় লাল হলো তার দুটো গাল। মাথা তুলে তাকালেন প্রিয়তমের দিকে। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই জাইদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর তিক্ততা নিমিষেই দূর হয়ে গেল। ঠোঁটের কোণে খেলে গেল সলজ্জ মুচকি হাসি।

[আত তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১১৩-১৪। আস সিরাতুল হালাবিইয়্যাহ ৩/৩২০। উসদুল গাবাহ: ৭/১২৫]

নাম পরিবর্তন

হজরত বাররাহ বিনতে জাহাশের অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে। খুব করে বলতে ইচ্ছে করছে-নবিজিকে তিনি কতটা ভালোবাসেন, কতটা আপন ভাবেন তাকে। কিন্তু এর আগেই তার কানে মধুবর্ষণ করল প্রিয়তমের কথা। নবিজিকে তিনি বলতে শুনলেন- কী নাম তোমার? হজরত জায়নাব সলজ্জে বলে উঠলেন- বাররাহ। বাররাহ অর্থ পণ্যবতী। বেশ সুন্দর অর্থ।

কিন্তু কারও নাম 'পুণ্যবতী' হয় কী করে মানুষের মধ্যে কে ভালো আর কে মন্দ, তা তো নির্ধারণ করবেন কেবল মনে রাব্বুল আলামিন। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন এ ব্যাপারে। এজন্য প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম পরিবর্তন করার কথা ভাবলেন। বিয়ের দিনেও তিনি দ্বীনের সঠিক বুঝ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ন্যূনতম কার্পণ্য করলেন না। আর তিনি যে কেবল এখন নাম পরিবর্ত করছেন, বিষয়টা এমন নয়; বরং তিনি এর আগেও নাম পরিবর্তন করেছেন। অর্থের বিবেচনায় বা সার্বিক বিবেচনায় কারও নামে অসংগতি মনে হলেই তিনি নাম পরিবর্তন করে দিতেন।

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সার্বিক বিবেচনায় প্রিয়তমা নববধূর নাম পরিবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাই হজরত বাররার দিকে তাকিয়ে বললেন- আজ থেকে তোমার নাম জায়নাব। আনন্দে আত্মহারা আম্মাজান। তখন থেকেই তার নাম হয়ে যায় জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা।

[বুখারি, হাদিস: ৫১৯৩। মুসলিম: ২/১০৪৯]

ওলিমা

ওলিমার আয়োজন করলেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। গোশত রান্না করা হলো মেহমানদের জন্য। কিন্তু মিষ্টি না হলে যেন বিয়ের মূল আমেজতে আসে না। তাই তো উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজির খুশির অংশীদার হতে মিষ্টান্ন তৈরি করলেন। ছেলে আনাস ইবনু মালিককে ডেকে বললেন- আনাস! এদিকে এসো তো বাবা। মায়ের বাধ্য সন্তান আনাস চটজলদি দৌড়ে এলেন মায়ের কাছে। আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন- মা! কিছু বলবেন? উম্মে সুলাইম কাজের ফাঁকে বললেন- জানোই তো আজ আল্লাহর রাসুল বিয়ে করেছেন। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, রাসুলের ঘরে বোধহয় খাবার নেই। ওই থলেটা নিয়ে এসো তো! হজরত আনাস থলে নিয়ে এলেন মায়ের কাছে।
বাড়িয়ে দিয়ে বললেন- নিন মা! তড়িঘড়ি করে উম্মে সুলাইম বললেন- নবিজির জন্য আজওয়া ও ঘি দিয়ে মিষ্টান্ন তৈরি করেছি। আশা করছি এতটুকুতে নবিজি ও তাঁর স্ত্রীর হয়ে যাবে। খাবারটা থলেতে ভরে রাসুলুল্লাহকে দিয়ে এসো। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু খাবারের থলে নিয়ে চললেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। সেখানে পৌঁছে নবিজিকে জানালেন খাবারের কথা।

এরপর নবিজির সামনের একটি দেয়ালের কাছে খাবারের থলেটি রেখে ফিরতে উদ্যত হলেন, এমনই সময় তার কানে এলো নবিজির আহ্বান- আনাস! আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি-সহ আরও কয়েকজন সাহাবিকে দাওয়াত করো। এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন আনাস। তিনি ভেবে পেলেন না, এত অল্প খাবার কীভাবে এতগুলো মানুষ খাবে? খাবারটুকু সর্বোচ্চ দুজন মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে খেতে পারবে। কিন্তু বাকিরা? যাহোক, নবিজির আদেশ মানতেই হবে। পরে কী হবে দেখা যাবে। তাই তিনি সবাইকে দাওয়াত দিয়ে ফিরে এলেন।

দেখো তো মসজিদে কে কে আছে! তাদেরকেও ডাকো। হজরত আনাস মসজিদে গিয়ে দেখলেন, কেউ নামাজ পড়ছে, কেউ ঘুমাচ্ছে। তিনি এলো সবাইকে ডেকে বললেন- আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাদের সবাইকে গুলিমার আসতে দিয়েছেন, আপনারা আসুন। লোকেরা বেজায় খশি হলেন। দ্রুত চললেন নবিজির ঘরের দিকে। আল্লাহর রাসুল বললেন- মসজিদে কি আর কেউ আছে? হজরত আনাস বললেন- জিনা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আর কেউ নেই।

নবিজি বললেন- তাহলে দেখো, পথে-ঘাটে কাউকে পাও কিনা। তাদেরকেও ডেকে আনো। হয়নাত আনাসের অবাক হওয়া শেষই হচ্ছে না। এতটুকু খাবার এতগুলো মানুষ কী করে খাবে? যাহোক, তিনি নবিজির নির্দেশমতো পথঘাটের লোকদের সবাইকে ডেকে আনলেন। নবিজির ঘর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

হজরত আনাস শুধু ভাবছিলেন-নবিজি এতজন মানুষকে কীভাবে খাওয়াবেন? আর নবিজি ভাবছিলেন আর কেউ বাকি আছে কিনা। এজন্য আবারও জিজ্ঞেস করলেন- কেউ কি বাকি রয়ে গেল? আনাস বললেন- জি না ইয়া রাসুলাল্লাহ, আর কেউ বাকি নেই। এ পর্যায়ে তিনি মিষ্টান্নের পাত্রটি মাঝখানে রেখে বললেন-

‘নাও, বিসমিল্লাহ বলে সবাই খাওয়া শুরু করো।‘

হজরত আনাস-সহ সকল সাহাবি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, সাহাবিরা চারপাশ থেকে খাচ্ছে, কিন্তু খাদ্য কমছে না, অদৃশ্য কারও ছোয়ায় মিষ্টান্ন বেড়েই চলেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ওলিমায় সর্বাপেক্ষা বেশি আয়োজন করেছেন। যা অন্যান্য স্ত্রীর বেলায় ঘটেনি।

এজন্যই হজরত আনাস ইবনু নাবিল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়েতে নবিজি ওলিমার যে আয়োজন করেন, তা প্রায় কোনো স্ত্রীর ক্ষেত্রে করেননি। সুতরাং তোমরা একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলিয়া করো।

[মুসলিম: ২/১০৫২। আত তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১০৪-১০৭]

যায়নাব রাঃ এর প্রতি আম্মাজানদের প্রশংসা

উম্মুল মুমিনিন জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। আম্মাজান জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিসের একমাস গত না হতেই এই বিয়ে হয়। আম্মা আয়েশা যখন তাকে দেখতে গেলেন, তখন তার সৌন্দর্য দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং বলতে বাধ্য হলেন-জায়নাবকে আল্লাহ এতটাই সোন্দর্য দান করেছেন যে, তিনি এ নিয়ে গর্ব করতে পারেন।

অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের মন্তব্যও ঠিক এমনই ছিল। তাঁর সৌন্দর্যের পাশাপাশি তিনি প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফাতো বোন ছিলেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা আসমানের ওপর তাঁর বিয়ে পড়িয়েছেন।

শুধু কি তাই, বিয়ে পড়িয়ে আল্লাহ জিবরিল আমিনের মাধ্যমে সে খবরও বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। আর এমনভাবে জানিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হবে।

এজন্যই তো সকল স্ত্রীদের সামনে একদিন গর্ব করে বললেন-

'আপনাদের বিয়ে আপনাদের পরিবার দিয়েছেন। আর আমার বিয়ে মহামহিম আল্লাহ সাত আসমানের ওপর দিয়েছেন।'

[বুখারি, হাদিস: ৭৪২০-৭৪২১ ৩৬ আস সিমতুস সামিন ফি মানাকিবি উম্মাহাতিল মুমিনিন, পৃষ্ঠা: ১০৭]

নবীজির হেরেমে

আম্মাজান জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা এখন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হেরেমে। এতদিন নবিজিকে দূর থেকে দেখেছেন, এখন দেখছেন খুব কাছ থেকে। এতদিন তার হৃদয়ে নবিজির মর্যাদা ভিন্ন রকম ছিল: এখন তার হৃদয়ে নবিজির মর্যাদা ভালোবাসায় মোড়ানো গোলাব পাপড়ির মতো। যদ্দরুন ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে নবিজির ভালোবাসার পাহাড় গড়ে উঠল। নবিজির পাশটিতে বসে দ্বীনি ইলম অর্জন করতে শুরু করলেন। নবিজির সিফাত, তাঁর আদর্শ, তাঁর যাবতীয় গুণ হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নিলেন। নবিজিও তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতে লাগলেন। আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও স্বীকার করলেন এ বিষয়টি।

একদা তিনি বললেন-জায়নাব এই মর্যাদার ক্ষেত্রে আমার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, সে আল্লাহর রাসুলের নিকটতম আত্মীয়। একদিন আম্মাজান জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহর সঙ্গে নারীসুলভ খুনশুটি করার একপর্যায়ে বললেন- আমি আপনার সঙ্গে তিনটি বিষয় নিয়ে গর্ব করতে পারি। আপনার আর কোনো স্ত্রী এগুলো নিয়ে গর্ব করতে পারবে না।

এক. আমার নানা এবং আপনার দাদা একই ব্যক্তি।
দুই, আল্লাহ তাআলা আমাকে আসমান থেকে আপনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।
তিন. আমার বিয়ের দূত ছিলেন জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম। এজন্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীদের মধ্যে আপনার নৈকট্যের সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি আমি। অন্যদের চেয়ে আপনার ওপর আমার হক সবচাইতে বেশি।

[মুসলিম, হাদিস: ২৪৪২। তাফসিরে তাবারি: ১৪/২২। আল খাসায়িসুল কুবরা: ২/২৪৬। ফাতহুল বারি: ১৩/৪২৩]

স্ত্রী হিসেবে প্রিয় নবজির প্রতি যত্নবান

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী জায়নাব বিনতে জাহাশ নবিজির সংস্পর্শে দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন। স্বামীর প্রতি যত্নবান হওয়া, তাকে সহযোগিতার মনোভাব রাখা, স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা, স্বামীর ভালোমন্দের প্রতি খেয়াল করা ইত্যাদি বিষয়গুলো তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেল।

এজন্যই দেখা গেল, নবিজির ছোটখাটো বিষয়েও তিনি বেশ তৎপর। আম্মাজান জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি তামার পাত্র ছিল। জিজ্ঞেস করা হলো- এ দিয়ে আপনি কী করেন?

জবাবে আম্মা জায়নাব বললেন-

''এর সাহায্যে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল পরিপাটি করে দিই।''

এছাড়াও, দ্বীনের কাজে নবিজিকে নানান মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হতো। কতশত মানুষ যে আসতেন তাঁর কাছে, তার ইয়ত্তা নেই। সে সময় যেন নবিজির কোনো কষ্ট না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতেন। কারও কথায় যেন নবিজি মনঃক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি দিতেন। একদিনের ঘটনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের একচিলতে অবসরে আম্মা জায়নাবের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

এমনই সময় ঘরের বাইরে অনুমতির জন্য সালাম দিলেন বনু হাশিমের কজন সাহাবি। নবিজি অনুমতি দিলে ভেতরে প্রবেশ করলেন তারা। তাদের প্রবেশের পূর্বেই আম্মা জায়নাব আড়ালে চলে গেলেন।

নবিজির কাছে তারা আবদার করলেন-

''ইয়া রাসুলাল্লাহ! জাকাত-সাদকার কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করুন।''

কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিষয়টি পছন্দ ছিল না যে, তাঁর বংশের লোকেরা সাদকার সম্পদ ভক্ষণ করবে। আর নবিজিকে যদি কেউ এমন কিছু বিষয়ে জানতে চায় বা আবদার করে, যা তিনি পছন্দ করেন না, তখন তিনি কিছু না বলে চুপ করে থাকেন। এটি তাঁর একটি উত্তম সিফাত ছিল।
এজন্য তাদের আবদারে তিনি কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। আম্মা জায়নাব অনুধাবন করলেন বিষয়টি। তিনি বুঝতে পারলেন, কষ্ট হচ্ছে নবিজির।

প্রিয়তমের এতটুকু কষ্ট তার সহ্য হলো না। এজনা পর্দার আড়াল থেকেই সাহাবিদের এ ব্যাপারে কথা বলতে বারণ করে দিলেন। কী যত্নবান ছিলেন আম্মা জায়নাব। নবিজির প্রতি কত ভালোবাসা পুষে রেখেছিলেন হৃদয়ে। আপনি ধন্য হে মা। আমরা আপনার কহানি সন্তান হতে পেরে গর্ববোধ করি হে উম্মুল মুমিনিন! অবশেষে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবদারের প্রত্যুত্তরে বললেন-

''তোমরা কি জানো না, জাকাত মুহাম্মদের বংশের জন্য নয়?"

[বুখারি হাদিস : ১৪৮৫]

ইবাদত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলেছেন স্ত্রী জায়নাবের বাড়ির দিকে। সঙ্গে আছেন প্রিয় সাহাবি উমর ইবনুল খাত্তাব। চলতে চলতে উভয়ে গিয়ে পৌঁছলেন আম্মা জায়নাবের বাড়ির দোরগোড়ায়। সালাম দিলেন নবিজি। কোনো আওয়াজ না পেয়ে নিজ বাড়ি হেতু ভেতরে প্রবেশ করলেন। ফারুকে আকবার রয়ে গেলেন বাইরে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন চক্ষু শীতলকারী এক দৃশ্য। তিনি দেখলেন-তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী জায়নাব প্রশান্ত চিত্তে নফল নামাজ আদায় করছেন। বিনয় ও নম্রতার এক অপূর্ব প্রকাশ দেখলেন তার নামাজে। কী আকুলতা সেই নামাজে, কী মিনতি সেই সালাতে!

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১৭]

আরেকদিনের ঘটনা –

একদা প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তার নজর কাড়ল-দুই খুঁটির মাঝে টানানো লম্বা রশিটি।

সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন-

‘এই রশি এখানে কেন?’

উম্মুল মুমিনিন জায়নাবের রশি। নামাজে ক্লান্তি চলে এলে তিনি তা ধরে নামাজ আদায় করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুধাবন করলেন তাঁর স্ত্রী জায়নাব ইবাদতে কতবেশি কষ্ট করেন। সুতরাং এ বিষয়টিকে তিনি অনুমোদন দিলে উম্মতের কষ্ট হবে নির্ঘাত। এজন্য বললেন- রশিটা খুলে ফেলো। এমনটা করবে না। তোমরা উদ্যমের সঙ্গেই নামাজ আদায় করবে। তবে ক্লন্তি চলে এলে বসে পড়বে।"

[বুখারি, হাদিস: ১১৫০। মুসলিম, হাদিস: ৭৮৪]

আম্মাজান জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন ইবাদতের প্রতি দুর্বার। ইবাদতের জন্য বিলীন করে দিতেন নিজেকে। এই হাদিস তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বলতা ও অলসতার মুহূর্তে ইবাদত করতে বারণ করে দিলেন। কারণ, তা অধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

দানশীল

হিজরি ১৮ সন। খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তিনি উম্মুল মুমিনিনদের সঙ্গে আম্মাজান জায়নাবের জন্যও বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করলেন, যার পরিমাণ ছিল বারো হাজার দিরহাম। তারপর সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন আম্মাজানের বাড়িতে। খাদিমা আনন্দচিত্তে বললেন –

আম্মাজান, হাদিয়া এসেছে। কোত্থেকে?

খলিফা উমর পাঠিয়েছেন। কী পাঠিয়েছেন? দিরহাম!

ও আমার প্রয়োজন নেই। আমার বোনদের বেশি প্রয়োজন। তারাই এ হাদিয়া পাওয়ার অধিক যোগ্য। তাহলে কি সব দান করে দেবো?

হ্যাঁ দাও, সব দান করে দাও। তবে ওই কাপড়ের ভেতর কিছু রেখে দাও। খাদিমা কাপড়ের ভেতর কিছু রেখে দুহাত ভরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব দান করে দিলেন। যাদের দান করলেন, তাদের কতক ছিলেন মহীয়সী আম্মাজানের আপনজন, কিছু ছিলেন এতিম-মিসকিন।

সবাইকে মুঠো ভরে দান করার পর খাদিমা আম্মাজানের কাছে গিয়ে সবিনয় আবদার জানালেন- আম্মাজান, আমিও তো অসচ্ছল, মিসকিন। আমি কি হাদিয়া পাওয়ার যোগ্য নই? সঙ্গে সঙ্গেই আম্মাজান বললেন- ওই থলের ভেতর যা রেখে দিয়েছিলে তার সবটাই তোমার।

খাদিমা অবাক হয়ে ভাবলেন-আমি তো ভেবেছিলাম, আম্মাজান ওগুলো নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন! কিন্তু এ কী, সব আমাকেই দিয়ে দিচ্ছেন! অথচ তার ঘরেই কে তেমন কিছু নেই। এই ভেবে খাদিমা কাপড়ের ভেতর হাত দিয়ে সব অর্থ বের করলেন। ফিক করে হেসে দিলেন। খাদিমা এখন খুশিমনে বাড়ি ফেরার পালা। ঠিক এমন সময় তিনি দেখলেন- মহীয়সী আম্মাজান রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই বলে দুআ করছেন-

হে রাব্বাল আলামিন, সামনে বছর যেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এই হাদিয়া আমার কাছে না পৌঁছে। এসব ফিতনা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো মাওলা!

রব্বে কারিম আম্মাজানের দুআ কবুলও করে নেন। পরের বছর সেই হাদিয়া পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন মহান রবের তৈরি অনিন্দ্য সুন্দর জান্নাতে।

নবীজির বিদায়ী কথা

দশম হিজরি সন। জিলহজ মাসের নয় তারিখ। অনুষ্ঠিত হলো বিদায়ি হজ। সেই হজের মৌসুমে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার সাহাবির সামনে ঐতিহাসিক এক বক্তব্য পেশ করলেন। সেই বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন নবিজির সকল স্ত্রী। আম্মাজান জায়নাব ছিলেন তাদের অন্যতম। সেদিন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবানে তাঁর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে এই অমিয় বাণী বলতে শুনলেন-

هذه ثم ظهور الخصر يعني : ثمَّ الزمن ظهور الخصر ، ولا تخرجن من البيوت

আজকের পর তোমরা আর ঘর থেকে বের হবে না। ঘরের চাটাইয়ের সঙ্গে লেগে থাকবে।

এই বলে হজব্রত পালন করলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই হজই নবিজির জীবনের একমাত্র হজ; এটিই প্রথম ও শেষ হজ। এর ৮৩ দিন পর ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার, চাশতের নামাজের শেষ সময়, ৬৩ বছর বয়সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের সেই ইহুদি নারীর বিষের প্রভাবে তীব্র রোগযন্ত্রণায় আল্লাহর ইচ্ছায় মদিনায় ইন্তিকাল করলেন।

‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল মাত্র। তাঁর আগেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছে।'

[সুরা আলে-ইমরান : ২: ১৪৪]

প্রিয় নবিজিকে গোসল দেওয়া হলো মঙ্গলবার। গোসল দিলেন আম্মাজান জায়নাবের মামা হজরত আব্বাস, তার মামাতো ভাই ফজল ও সাকাম, হজরত আলি, নবিজির আজাদকৃত ক্রীতদাস সাকরাম, নবিজির নাতি উসামা ইবনু জাইদ ও আউস ইবনু খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। গোসলের পর বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি ইয়ামানি সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়। তৎপরে দশ জন দশ জন করে সাহাবায়ে কিরাম হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে জানাজার নামাজ আদায় করলেন।

জানাজার নামাজের ইমাম হওয়ার সাহস করলেন না কেউ। সর্বপ্রথম বনু হাশিম গোত্রের সাহাবিরা, তারপর মুহাজির, অতঃপর আনসার, তারপর অন্যান্য পুরুষ সাহাবি, অতঃপর মহিলা ও সর্বশেষে শিশুরা জানাজার নামাজ পড়লেন। জানাজার নামাজ পড়তে পড়তে মঙ্গলবার সারাদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সাইয়িদুল আম্বিয়া আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আম্মাজান আয়েশার হুজরায় দাফন করা হলো।

একাকী জীবন

একাকী জীবন নবিজি নেই। নেই প্রিয়তম মানুষটি। যে মানুষটি তাকে শুদ্ধতর করে তুলেছিলেন, যে মানুষটির কারণে তিনি উম্মুল মুমিনিন, যার পরশে তিনি সর্বাপেক্ষা বড়
আবিদা, যার সংস্পর্শে তিনি উম্মুল মাসাকিন, সেই মানুষটি আর নেই। তাঁকে ছাড়াই কাটছে জীবন। কিন্তু তিনি ভুলে যাননি প্রিয়তমের কোনো নির্দেশের কথা।

তিনি বলেছিলেন-

''আজকের পর তোমরা আর ঘর থেকে বের হবে না। ঘরের চাটাইয়ের সঙ্গে লেগে থাকবে।''

তিনি তাই করলেন। অনুসরণ করলেন নবিজির আদেশের। বছর ঘুরে হজব্রত পালনের সময় হয়ে এলো। অন্য স্ত্রীগণ প্রস্তুতি নিলেন হজের। কিন্তু তিনি নিরুত্তাপ বসে রইলেন ঘরে। জিজ্ঞেস করা হলো- আপনি যাবেন না? জবাবে বললেন- না, যাব না। জানতে চাওয়া হলো- কেন? তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যেন কোনো বাহন আমাদের বহন না করে। এই নির্দেশনাই নবিজি আমাদের দিয়েছিলেন। আম্মাজান জায়নাবের সঙ্গ দিলেন নবিজির আরেক স্ত্রী আম্মাজান সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তারা দুজন বেরোলেন না ঘরের বাইরে।

এর থেকে স্পষ্ট যে, আম্মাজান জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আদেশ পালনে কখনো কোনো কার্পণ্য করেননি। যখন যে আদেশ দিয়েছেন নবিজি, তখন সে আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন। ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নবিজির নির্দেশ পালনে।

প্রশ্ন হতে পারে-তাহলে কি অন্য স্ত্রীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করলেন? না, মোটেও না। উম্মাহাতুল মুমিনিনের কেউ নবিজির আদেশ অমান্য করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। বরং যারা নবিজির তিরোধানের পর হজব্রত পালন করতে গেলেন, তারা হাদিসের ব্যাখ্যা করলেন এভাবে-নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই নির্দেশ প্রদানের অর্থ হলো, সর্বাবস্থায় ফিতনামুক্ত থাকা। আর হজ পালনে কোনো ফিতনার আশঙ্কা নেই। তাই তা পালন করতে মক্কায় যাওয়া যায়।

[মুসনাদু ইমাম আহমদ: ৬/৩২৪। মুসনাদু আবি ইয়ালা, হাদিস: ৭১৪৫-৭১৫৮। উসদুল গাবাহ: ৫/৪৬৫। আল মাগাজি: ৩/১১১৫ সহিহ মুসলিম:২/১০২১]

দারস

ঘরের বাইরে বের না হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, আম্মাজান আর কোনো দ্বীনি কাজ করেননি; বরং তিনি ঘরে বসে থেকেই দ্বীনের অনেক খিদমত চালিয়ে গেলেন। তন্মধ্যে অন্যতম ফিকহ এবং হাদিসের দরস। নবিজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি বহু হাদিস শোনার কারণে সাহাবি-তাবিয়ি তার দরসে এসে উপস্থিত হলেন। অর্জন করলেন ইলমে ওহি।

তন্মধ্যে অন্যতম পুরুষ তালিবুল ইলম ছিলেন- কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু জাহাশ, কুলসুম ইবনু মুসতালিক খুজায়ি প্রমুখসহ আরও অনেকেই।
নারী তালিবাতুল ইলমের অন্যতম ছিলেন- জায়নাব বিনতে আবি সালামা, উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান-সহ আরও অনেকেই তার ইলমি কানন থেকে নববি জ্ঞান অর্জন করলেন।

[সহিহ মুসলিম: ২/১০২১]

দানশীল

হিজরি ১৮ সন। খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তিনি উম্মুল মুমিনিনদের সঙ্গে আম্মাজান জায়নাবের জন্যও বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করলেন, যার পরিমাণ ছিল বারো হাজার দিরহাম। তারপর সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন আম্মাজানের বাড়িতে।

খাদিমা আনন্দচিত্তে বললেন-

আম্মাজান, হাদিয়া এসেছে। কোথেকে? খলিফা উমর পাঠিয়েছেন।

কী পাঠিয়েছেন?

দিরহাম!

এসব আমার প্রয়োজন নেই। আমার বোনদের বেশি প্রয়োজন। তারাই এ হাদিয়া পাওয়ার অধিক যোগ্য। তাহলে কি সব দান করে দেবো? হ্যাঁ দাও, সব দান করে দাও। তবে ওই কাপড়ের ভেতর কিছু রেখে দাও। খাদিমা কাপড়ের ভেতর কিছু রেখে দুহাত ভরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব দান করে দিলেন। যাদের দান করলেন, তাদের কতক ছিলেন মহীয়সী আম্মাজানের আপনজন, কিছু ছিলেন এতিম-মিসকিন।

সবাইকে মুঠো ভরে দান করার পর খাদিমা আম্মাজানের কাছে গিয়ে সবিনয় আবদার জানালেন-

আম্মাজান, আমিও তো অসচ্ছল, মিসকিন। আমি কি হাদিয়া পাওয়ার যোগ্য নই? সঙ্গে সঙ্গেই আম্মাজান বললেন'-

ওই থলের ভেতর যা রেখে দিয়েছিলে তার সবটাই তোমার। খাদিমা অবাক হয়ে ভাবলেন-আমি তো ভেবেছিলাম, আম্মাজান ওগুলো নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন! কিন্তু এ কী, সব আমাকেই দিয়ে দিচ্ছেন! অথচ তার ঘরেই কে তেমন কিছু নেই।

এই ভেবে খাদিমা কাপড়ের ভেতর হাত দিয়ে সব অর্থ বের করলেন। ফিক করে হেসে দিলেন খাসিয়া এখন খুশিমনে তার বাড়ি ফেরার পালা। ঠিক এমন সময় তিনি দেখলেন- মহীয়সী আম্মাজান রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই বলে দুআ করছেন-

হে রাব্বাল আলামিন, সামনে বছর যেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এই হাদিয়া আমার কাছে না পৌঁছে।
এসব ফিতনা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো মাওলা! খাদিমা বাড়ির পথে যেতে যেতে অবাক হয়ে ভাবছেন-এত বড় দাতার এত বেশি তাকওয়া! তাকওয়াবানরা বুঝি এমনই দানবীর হন! শুধু কি তাই-রব্বে কারিম আম্মাজানের দুআ কবুলও করে নেন। পরের বছর সেই হাদিয়া পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন মহান রবের তৈরি অনিন্দ্য সুন্দর জান্নাতে।

চিরবিদায়

কে জানত যে, রব্বে কারিম সত্যিই সেই দুআ কবুল করে নেবেন। তাই তো তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে অতি দ্রুত মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে হিজরি বিশ সনে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যাওয়ার বেলায় তিনি ওসিয়ত করলেন-

''যে খাটলিতে করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমাকেও তাতে করে নিয়ে কবর দিয়ো। আমার কবরে বাতি জ্বালিয়ো না।''

নবিজির অন্যান্য স্ত্রীগণ তাকে দেখতে এলেন। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহার তখন মনে পড়ে গেল রাসুলের কথা। তিনি বলেছিলেন, যার হাত দীর্ঘ সে সবার আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আম্মাজান এ কথা শুনে তখন বুঝতে পারেননি যে, নবিজি জায়নাবকে উদ্দেশ্য করেছেন।

এতদিন তিনি এবং অন্যরা হাত মেপে মেপে দেখছিলেন, কার হাত দীর্ঘ। তন্মধ্যে সবার চেয়ে জায়নাবের হাত ছোট ছিল। এজন্য তিনি বাহ্যিক অর্থের প্রতি খেয়াল করার কারণে খেয়ালই করতে পারেননি যে, নবিজি দীর্ঘহাত বলতে 'দানে যার হাত দীর্ঘ' উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আজ এসে তিনি অনুধাবন করলেন, আসলে জায়নাবই সেই মর্যাদার অধিকারিণী। সবার আগে তিনিই মিলিত হতে যাচ্ছেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে।

মৃত্যুর একেবারে কাছে আম্মাজান জায়নাব। একজীবনে অসংখ্য ফুলের সুরভি ছড়িয়ে চলে যাবেন রাসুলের সান্নিধ্যে। স্ত্রীদের ভেতর সর্বপ্রথম তিনিই গিয়ে মিলিত হবেন নবিজির সঙ্গে। সর্বাগ্রে সাক্ষাৎ পাওয়ার পরম সুখের স্নিগ্ধ অনুভূতি হয়তো তাকে বিভোর করে রেখেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! এমন মুহূর্তেও তিনি ভুললেন না সাদকার কথা।

[তারাকাত, ইবনু সাদ: ৮/৮৬-৮৭। হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৬৫। সিফাতুস সা তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১০৯। সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১২]

তিনি পাশের লোকদের বললেন-

''আমি আমার কাফন প্রস্তুত করে রেখেছি। তারপরও যদি হজরত উমর আমার জন্য কোনো কাফন পাঠায়, তাহলে দুটির যেকোনো একটি তোমরা দান করে দিয়ো। আর আমাকে সমাহিত করার পর সম্ভব হলে আমার পরনের কাপড়টাও দান করে দিয়ো।''

ইয়া উম্মুল মু'মিনিন। আপনার জন্য জান কুরবান! আম্মাজান যায়নাবের সারাটা জীবন ছিল বদান্যতার অনন্য উদাহরণ। সেই তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও দানের নির্দেশ দিলেন।

এরপর ইহকাল ত্যাগ করে তেপ্পান্ন বছর বয়সে হিজরি ২০ সনে হজরত উমরের ভাতা আসার পূর্বেই রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন পরপারে। গিয়ে মিলিত হলেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে।
[মুসলিম, হাদিস: ২৪৫২। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২১৭]

জানাজা

আম্মাজান জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন পর্দার প্রতি যারপরনাই সচেতন ও যত্নবান। তার এই সচেতনতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা দিলেন, 'মাহরাম ছাড়া কেউ যেন তার লাশের সঙ্গে বের না হয়।' কিন্তু তা কী করে হয়? উম্মুল মুমিনিনের জানাজায় মাহরাম ছাড়া কেউ বের হবে না কেন? তাহলে কি তার জানাজাও পড়বে না গাইরে মাহরামরা?

এর সমাধানে এগিয়ে এলেন আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা। সবনিয়ে তিনি আবদার জানালেন- অনুমতি হলে সুন্দর একটা পদ্ধতি বলতে পারি; হাবশার লোকেরা তাদের নারীদের লাশ দাফন করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিতে পারি।

হজরত উমর অনুমতি দিলে তিনি আম্মাজান জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার অসিয়ত মোতাবেক নবিজিকে বহন করা সেই খাটিয়ার মধ্যে রাখলেন। তৎপরে সর্বপ্রথম কোনো নারীর পুরো খাটিয়াকে ঢেকে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে।

এই দেখে হজরত উমর বলে উঠলেন-

'মাশাআল্লাহ, দারুণ পদ্ধতি। আসলে নারীর পর্দার বিষয়টা বড়ই চমৎকার।'

এরপর হজরত উমর একজন ঘোষককে ডেকে এই বলে ঘোষণা দিতে বললেন- তোমরা সবাই তোমাদের মায়ের জানাজার জন্য বেরিয়ে পড়ো। এরপর সবার উপস্থিতিতে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাজা পড়ালেন।

[আত তাবাকাতুল কুবরা। ৮/১০৯। আস সিয়াতুল হালাবিইয়্যা ৩/৩২৮]

দাফন

আম্মাজানের কবর খনন করা হয়েছে বেশ আগেই। জান্নাতুল বাকিতে। ইন্তিকালের দিনটিতে বেশ গরম ছিল। আগুন ঢালছিল যেন সূর্য। এমন সময় পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। খলিফা নির্দেশ দিলেন-ওপরে শামিয়ানা টানিয়ে নাও। খননকারীগণ শামিয়ানা টানালেন। ইসলামি ইতিহাসে জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে সর্বপ্রথম সাইয়িদা জয়নাব বিনতে জাহাশের কবরের ওপর তাঁবু টানানো হলো। একটু প্রশান্তি নেমে এলো কবর খননকারীদের ওপর। একপর্যায়ে তারা কবর খনন শেষ করলেন।

ওদিকে খাটলি নিয়ে পৌঁছলেন কজন সাহাবি ও আবু আহমদ ইবনু জাহাশ। তৎক্ষণাৎ উম্মুল মুমিমিনিনদের কাছে লোক পাঠিয়ে হজরত উমর জানতে চাইলেন- আম্মাজান জায়নাবকে কবরে প্রবেশ করাবে কে? তারা জানালেন- তার মাহরাম ছাড়া যেন কেউ তাকে কবরে না নামায়। তাদের পরামর্শ শুনে কবরে কারা নামবেন, নির্ধারিত করে ফেলেন হজরত উমর।
ধীরে ধীরে আম্মাজান জায়নাবকে চির বিদায় জানিয়ে সমাধিত করার সময় হয়ে এলো। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরের কিনারে বসে পড়লেন। তার সঙ্গ দিলেন আবু আহমদ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবি। কবর পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা হলে হজরত উমর জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু জাহাশ, উসামা, আবদুল্লাহ ইবনু আবি আহমদ এবং বোন হামনার ছেলে মুহাম্মদ ইবনু তালহা ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে কবরে নামার অনুমতি দিলেন।

এরা ছাড়া বাকি সবাইকে সরে যাওয়ার আদেশ দিলেন; যেন শেষ মুহূর্তেও উম্মুল মুমিনিনের পর্দা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং কেবল মাহরামরাই তাঁকে দাফন করতে পারে।'

[আল মুজামুল কাবির: ২৪/৫০। আত তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১১০-১১৩]

যেসব কারণে তিনি ছিলেন অনন্য সৌভাগ্যবতী

আম্মাজান জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা তার মৃত্যুর পর দুনিয়াবি কোনো ধনসম্পদ রেখে গেলেন না। না কোনো দিরহাম, না কোনো দিনার রেখে গেলেন। যা রেখে গেলেন, তার পুরোটাই আখিরাতের অর্জন;

বিশ্ববাসীর কাছে তিনি রেখে গেলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদিস এবং মাসআলার সমাধান।

তিনি রেখে গেলেন দান, পরোপকারিতা, বদান্যতা, ইবাদতে একনিষ্ঠতা, অল্পেতুষ্টি, রবের প্রতি সন্তুষ্টি, সতীনের প্রতি নেক ধারণা, স্বামীর প্রতি যত্নবান হওয়াসহ অভূতপূর্ব আরও অনেক গুণাবলির এক অনন্য ইতিহাস।

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া তার একটি ঘর ছিল। অনেক দিন পর ওয়ালিদ ইবনু আবদিল মালিক মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করতে চাইলে আম্মাজান জায়নাবের ঘরটি পঞ্চাশ হাজার দিরহামে ক্রয় করে নিলেন।

[আত তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১১৪]

আম্মাজান জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ইনতিকালে আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাস আনহা বেশ মর্মাহত হলেন, দুঃখিত হলেন সতীনের মৃত্যুতে। পারিবারিক জীবনে তারা পরস্পর বিরোধী ছিলেন ঠিকই, এমনকি তর্কবিতর্কেও লিপ্ত হতেন তারা। এদৎসত্ত্বেও তাদের মাঝে অভিনব একটা সম্পর্ক ছিল। তাই তো তিনি তার মৃত্যুতে কাঁদলেন। তার জন্য রহমতের দুআ করলেন। তিনি বললেন- আল্লাহ তাআলা জায়নাবের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। দুনিয়াতেই তিনি উচ্চমার্গীয় এমন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যে মর্যাদার কাছে অন্য সবার মর্যাদা ফিকে হয়ে যায়।

কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে নবিজির সঙ্গে নিজেই বিয়ে দিয়েছেন; এমনকি সে কথা কুরআনে ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেনও। আখিরাতের পথে সর্বপ্রথম তিনিই নবিজির সঙ্গী হলেন। এছাড়াও তিনি সাধারণ মানুষ ও আমাদের মাঝে ছিলেন সুপ্রশংসিত, ইবাদতগুজার, এতিম-মিসকিন ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল।"

[আল ইসতিআর ফি মারিফাতিল আসহাব: 4/১৮৫১। আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা ৮/১০]

এমনকি আম্মাজান আয়েশা সময়ে সময়ে তার গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করতে ন্যূনতম কার্পণ্য করলেন না। একদা আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো- কোন স্ত্রী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য জবাবে আম্মা আয়েশা বললেন- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জায়নাব ও উম্মে সালামার বিশেষ অবস্থান ছিল। জায়নাব ছিলেন নবিজির সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। আমার মনে হয়, আমার পরেই ছিল তার অবস্থান। "

আরেকদিন আম্মা আয়েশা আম্মা জায়নাবের তাবৎ গুলাবলি উল্লেখ করে হললেন-

"আমি জায়নাব অপেক্ষা বেশি দ্বীনদার, অধিক আল্লাহভীরু, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, সত্যবাদী, দানশীলা, যেই কাজে দান-সাদকার সাওয়াব হয় ও নৈকটা লাভ করা যায় সেই কাজে অধিকতর সাধনাকারিণী আর কাউকে দেখিনি। শুধু যে, তিনি হঠাৎ রেগে যেতেন। তবে হ্যাঁ, তার রাগ পড়েও যেত খুব তাড়াতাড়ি।"

[আত তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১১৪।মুসলিম: ৪/১৮৯২]

শুধু যে আম্মা আয়েশাই তার ব্যাপারে ভালো ও প্রশংসাবাক্য বলেছেন, তা কিন্তু নয়; বরং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীরাও তার সম্পর্কে অত্যন্ত মুগ্ধকর কথা বলেছেন। আম্মাজান উম্মে সালামা একদিন আম্মা জায়নাব সম্পর্কে খুব মূল্যবান একটি সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন-

''আল্লাহর রাসুলকে মুগ্ধ করতেন হজরত জায়নাব। রাসুলুল্লাহ তাঁর কাছে একটু বেশিই যেতেন। কারণ, তিনি ছিলেন পুণ্যবতী নারী। বিনিদ্র রজনিতে নামাজ আদায়কারিনী। লাগাতার রোজা রাখায় তার কোনো জুড়ি ছিল না। হস্তশিল্পী ছিলেন। নিজ হাতে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতেন। এরপর সব বিলিয়ে দিতেন গরিব-দুঃখীর মাঝে।''

[জাওজাতুন নাবি ওয়া আসরারুল হিকমাতি ফি তাআদ্দুদিহিন্না, পৃষ্ঠা: ১১০]

আল্লাহ তাআলা উম্মুল মুমিনিন হজরত জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বর্তমান নারীজীবনের আদর্শ বানিয়ে দিন। আমিন।

উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া মাখজুমিয়্যা রাঃ

পারিবারিক দিক দিয়ে উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তৎকালীন আরবের উঁচু বংশীয় এবং আত্মমর্যাদাশীল রমণী ছিলেন। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাকে দেখে ঈর্ষা করেছেন আম্মাজান আয়েশাও। বহু সদগুণ এবং সুকর্মের অধিকারী ছিলেন আম্মাজান উম্মে সালামা। অত্যধিক বদান্যতার কারণে তাকে 'উম্মুল মাসাকিন' নামেও নামকরণ করা হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পরে আম্মাজান উম্মে সালামা ছিলেন অধিক জ্ঞানসম্পন্না নারী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজনৈতিক জটিল বিষয়েও কখনো তার সঙ্গে আলোচনা করতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এক মহা সঙ্কটকালে নবিজি তার পরামর্শ গ্রহণ করেই সফল হন।

উম্মে সালামা রাদি. ইসলাম গ্রহণ করেছেন স্বামী আবু সালামা রাদি.-এর সঙ্গে ইসলামের সূচনাযুগেই। ইসলামের জন্য প্রথম হিজরত করেছেন সুদূর হাবশায়। তারপর অর্জন করেছেন মদিনায় নারী হিসেবে প্রথম হিজরতকারীর বিরল সম্মান।

জন্ম, বংশ ও পরিবার

মহীয়সী নারী উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার মূল নাম উম্মে সালামা নয়, এ তো আম্মাজানের উপাধি। তার মূল নাম ছিল হিন্দ। তবে উম্মে সালামা নামেই প্রসিদ্ধি পান তিনি।

মুমিন জননী আরবের শ্রেষ্ঠতম বংশ কুরাইশ গোত্রের মাখজুম কবিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন হুজাইফা ইবনু মুগিরা। কেউ কেউ বলেন সুহাইল ইবনু মুগিরা। কুরাইশ গোত্রের নেতা ছিলেন তিনি। বেশ সম্মানিত ছিলেন তাদের মাঝে।

আম্মাজান উম্মে সালামার মা ছিলেন আতিকা বিনতে আমির। তবে আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন আম্মাজানের সৎ মা। যিনি মুসলিম হয়েছিলেন এবং মদিনায়ও হিজরত করেছিলেন। তার উপাধি ছিল বড় সুন্দর; জাদুর রাকিব তথা মুসাফিরদের ত্রাণকর্তা। কারণ, যারাই তার সঙ্গে সফর করত, তাদের সম্পূর্ণ দেখভাল তিনি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিতেন। বিশেষ করে যারা হতদরিদ্র, নিঃস্ব, তাদের সহায়তা করতেন দিলখুলে। এমনকি তাদের যাবতীয় রসদের ব্যবস্থাও করে দিতেন তিনি। এজন্য কোনো মুসাফির তার সঙ্গে সফরকালে কখনো দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হতো না। তারা ভেবে নিত-আমাদের সঙ্গে 'জাদুর রাকিব' আছেন। তবে তিনি 'উমাইয়া' উপাধিতে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর খোলা তরবারি খ্যাত পৃথিবী বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো বোন ছিলেন। আর সকল মুমিনদের মা হজরত খাদিজাতুল কুবরার প্রথম স্বামী

খুওয়াইলিদ ছিলেন হজরত উম্মে সালামার দাদার ভাতিজা। জামহারাতু আনসাবিল আরাব, ইবনু হাজমএ এমটি এখন প্রিয় মুমিন জননী উম্মে সালামা
এই সম্ভ্রান্ত পরিবারেই বেড়ে ওঠেন। যে পরিবার উদারতা ও মহানুভবতায় যেমন প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনই সাহসিকতা ও বীরত্বেও ছিল অতুলনীয়।

১ম বিবাহ

আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন আরবের অনিন্দ্য সুন্দরী পবিত্র নারীদের অন্যতম। এজন্য আরবের নানা সম্ভ্রান্ত কবিলা থেকে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। তার পরিবার সবদিক বিবেচনা করে আম্মাজানের চাচাতে ভাই হজরত আবু সালামা ইবনু আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়। এরপর পরিবারের নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের উপস্থিতিতে বড় আয়োজনের সঙ্গে উভয়ের মাঝে বিয়ে হয়।

ঈমানের পরশ

আবু সালামা ছিলেন সত্যান্বেষী, পবিত্র এবং সুস্থ বোধসম্পন্ন একজন ব্যাক্তি ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা ছিল তার জীবনের একমাত্র পথ। এজন্য যখন প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের ঘোষণা করলেন এবং সেইলর সৌভাগ্যবান মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছাতে শুরু করলেন, যাদের সঙ্গে নবিজির পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে পূর্ব থেকে একটা সুসম্পর্ক ছিল, আবু সালামাও সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যখন তার কাছেও এক ইলাহের দাওয়াত পৌঁছল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে মুহূর্তেই সেই আহ্বানে সাড়া দেন। ইসলামের সত্য ও মনকাড়া বাণী হৃদয় ও মনের গহীনে স্থান করে নেয় এবং তার জীবনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে যায়।

আম্মাজান উম্মে সালামা ও আবু সালামার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রীতি ছিল একেবারে অনুকরণীয়। তারা উভয়ে সেই ছেলেবেলা থেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরলতা, সততা, বিশ্বস্ততা, সর্বোত্তম আচার-ব্যবহার এবং মহৎ আত্মা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই উম্মে সালামারও ইসলামের এই ঈমানি আন্দোলনকে সমর্থন করতে কোনো বাঁধা পেতে হলো না। তারা উভয়ে একসঙ্গে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতম পছন্দনীয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।"

[নিসাত আহলিল বাইত, পৃষ্ঠা: ২২৭]

পুত্র সালামার শুভ আগমন

সুদুর আবিসিনিয়ার নতুন সংসারে নতুন জীবন পার করছেন হজরত উম্মে সালামা ও স্বামী হজরত আবু সালামা। নবপরিণীতার মতোই ভালোবাসেন স্ত্রীকে। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন তিনি নিজের ভেতর আরেকটি সত্তার প্রাণস্পন্দন ও পেলেন। অন্তঃসত্ত্বার অনুভবে পুলকিত হলেন তিনি। সুসংবাদ জানালেন স্বামীকে। হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন এ সংবাদ শুনে। অনাগত সন্তানের প্রতীক্ষায় কাটতে লাগল দুজনের মন্থর সময়। কত স্বপ্ন-আশার জাল বুনলেন দুজনে মিলে।
এভাবে দিন-সপ্তাহ-মাস পেরিয়ে প্রসব বেদনা উঠল একদিন। ছুটে এলেন হজরত রুকাইয়া, লায়লা, সাহলা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সেদিন স্নিগ্ধ রাত। বাড়ির অলিন্দায় একফালি চাঁদ আলো দিচ্ছে। মৃদুমন্দ হাওয়া স্পাইছে। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন আবু সালামা। চিন্তিত চেহারা। উম্মে সালামার কষ্ট হচ্ছে না তো? সন্তান জন্মের সময় সব মায়েরই কষ্ট হয়। কিন্তু আল্লাহ! উম্মে সালামার কষ্ট যেন একটু কম হয়। এই দুআ করতে করতেই সংবাদ এলো পুত্রসন্তান জন্মের।

পৃথিবীর আলো দেখলেন তাদের প্রথম সন্তান। খুশিতে সিজদায় পড়ে গেলেন হজরাত আবু সালামা। নবজাতক ছেলেকে অসীম ভালোবাসায় কোলে নিয়ে কানে 'আল্লাহ' নামের ধ্বনি শোনালেন। তারপর ছেলের নাম রাখলেন 'সালামা'। আর এই নামের সূত্র ধরেই মানুষ তাঁদেরকে আবু সালামা ও উম্মে সালামা বলে ডাকতে লাগল। আসল নাম চলে গেল ইতিহাসের নেপথ্য অধ্যায়ে।"

বেদনাময় হিজরত

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইসলাম প্রচারের শুরুতে তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেন। পরে যখন তিনি প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেন, তখন তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েন। এরই প্রেক্ষিতে নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের একটি অংশকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরামর্শ দেন।

রাসুল সাঃ এর পরামর্শ অনুযায়ী মক্কা থেকে গোপনে বেরিয়ে গেল একটি ছোট্ট কাফেলা। কাফেলায় আছেন আবু সালামা, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাদের শিশুপুত্র সালামা ও একটি উট। এই এক উট ছাড়া আবু সালামার আর কোনো বাহন ছিল না। তাই উটের পিঠেই বোঝাই করেছেন মাল-সামানা। হাওদায় বসিয়ে দিয়েছেন স্ত্রী-পুত্রকে। আর তিনি নিজে উটের রশি ধরে এগিয়ে চলেছেন বালুকাময় মরুপথ মাড়িয়ে।

সাফা পাহাড়ের পাদদেশ আবতাহ নামক স্থানে এসে দেখা পেলেন উম্মে সালামার কবিলা বনু মুগিরার কিছু লোকের। তারা আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূর থেকে দেখেই চিনে ফেলল। বুঝে নিল যে তারা মক্কা থেকে চলে যাচ্ছেন। তাই তারা তাদের গতিরোধ করে দাঁড়াল। আবু সালামাকে বলল –

এমন পরিস্থিতিতে তুমি আমাদের কন্যাকে নিয়ে এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়াবে, তা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না। আবু সালামার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিল তারা। উম্মে সালামাকে হাওদা থেকে টেনে নামাল।

আড়াল করল লোকবল দিয়ে। এরইমধ্যে আবু সালামার গোত্র বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও এলো। তারা বনু মুগিরাকে জানিয়ে দিলো –

তোমরা তোমাদের কন্যাকে স্বামীর সঙ্গে যেতে না দিলে আমরাও আমাদের শিশুকে তোমাদের কন্যার সঙ্গে যেতে দেবো না। উম্মে সালামা তার পুত্রকে প্রাণপণে আগলে রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা প্রচণ্ড টানাহেঁচড়া করল। একপর্যায়ে ভেঙে গেল সালামার হাত। সালামা ভীষণ চিৎকার দিয়ে উঠল। ব্যথায় কান্না জুড়ে দিলো ছোট্ট শিশুটা। উম্মে সালামা ছেড়ে দিলেন পুত্রকে। তিনি যে বাধ্য! এরপর আবার আহত পুত্রকে নেওয়ার জন্য অনেক কাকুতি মিনতিও করলেন। কিন্তু তারা তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আর্তনাদ শুনল না। চলে গেল সালামাকে নিয়ে। আর উম্মে সালামাকে বনু মুগিরার লোকেরা নিয়ে গেল তাদের কবিলায়। আর হিজরতের হুকুম পালনার্থে, রাসুল সাঃ এর আদেশ মানতে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু চললেন মদিনার পথে। বুকে তার বিরহ ব্যথা, মনে তার দুঃষহ যন্ত্রণা! কিন্তু নবিজির আদেশ, হিজরত করতে হবে।

সেদিন থেকেই উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবস্থা পাগলের মতো। স্বামী, সন্তানকে হারিয়ে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তার কিছুই ভালো লাগে না। পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের কোলে হেলান দিয়ে বসে থাকেন তিনি। চোখে তার অনন্ত শূন্যতা, অপেক্ষার ব্যাকুলতা। অসহ্য রকমের অপেক্ষায় প্রহর কাটে তার। তার এ অবস্থা দেখে বনু মুগিরার এক লোকের দয়া হলো। তিনি বনু মুগিরার সকলকে একত্রিত করে বললেন- আপনারা কেন এই অসহায় নারীকে ছেড়ে দিচ্ছেন না? কেন যে আপনারা তাকে স্বামী, সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন! তার এই কথাগুলো বেশ কাজে দিলো। তাদের পাষাণ হৃদয়ে আঘাত করল লোকটির বক্তব্য। যে কারণে তাদের দয়া হলো।

তারা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলল- তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারো। আমাদের পক্ষ থেকে আর কোনো বাধা দেওয়া হবে না। বনু মুগিরার দয়াপরবশ হওয়া দেখে বনু আবদুল আসাদও সালামাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলো। সন্তানকে ফিরে পেয়ে উম্মে সালামা আর দেরি করলেন না। একটি উট জোগাড় করে একাই রওনা হয়ে গেলেন মদিনার পথে। বালুকাময় মরুভূমির বিপজ্জনক পথ আর দস্যুর ভয় উপেক্ষা করে আল্লাহর নামে সফর শুরু করলেন। উম্মে সালামা তানইম নামক স্থানে পৌঁছে দেখা পেলেন উসমান ইবনু তালহার। যিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন। তাই উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন (ভয় পাওয়ার কারণও ছিল। কারণ, উসমান ছিলেন কাবার মূল পরিচারক। তাকে মক্কার নেতাদের মধ্যে বিবেচনা করা হতো। তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের চরম শত্রু ছিলেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নিপীড়ন ও কষ্ট দিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতেন। এমনকি তার চাচাতো ভাই মুসআব ইবনু উমাইর যখন ইসলামকে তার জীবনের লক্ষ্য ও মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা দেন, তখন তিনি তাকে চরমভাবে নির্যাতন করেন। অথচ তিনি আজ উম্মে সালামার রক্ষক হলেন। তদুপরি হজরত উম্মে সালামার সঙ্গে উসমান ইবনু তালহার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল না।

উসমান ইবনু তালহার এই সাহায্য এবং তার ভেতরকার এই লুকানো মহানুভবতা তাকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার মাধ্যম হয়ে ওঠে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে হজরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে হিজরত করেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে দীক্ষিত হন। কিন্তু তিনি তো আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বের হয়েছেন, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেনই। এজন্য আল্লাহ উসমান ইবনু তালহাকেই বানিয়ে দিলেন তার প্রহরী।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা পরবর্তীকালে যখন সে সময়কার কথা স্মৃতিচারণ করেন, তখন বলেন-আল্লাহর কসম, আরবে তার চেয়ে সম্মানিত ও অধিকতর সম্ভ্রান্ত দ্বিতীয় কোনো পুরুষ আমি দেখিনি। তিনি সজ্জন, উদার এবং ভদ্র এক ব্যক্তিত্ব।

চলার পথে আমরা যখন কোথাও যাত্রাবিরতি করতাম, তিনি রশি ধরে উটকে বসিয়ে আড়ালে সরে দাঁড়াতেন। দূরত্ব বজায় রেখে কোনো মরুবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিতেন। আবার যখন যাত্রা শুরু করার সময় হতো, তখন উট প্রস্তুত করে আমাকে আরোহণ করতে বলে দূরে চলে যেতেন। আরোহণের পর আবার কাছে এসে উটের লাগাম ধরে পথ চলতে থাকতেন। অবশেষে দুঃখ, কষ্ট ও দুশ্চিন্তার উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে হজরত উম্মে সালামা তার প্রিয় স্বামীর কাছে মদিনায় পৌঁছলেন।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬৯। সিরাতু ইবনি হিশাম: খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা: ৭৫-৭৬]

মদিনায় সালামা পরিবার

মদিনায় মদিনায় উম্মে সালামা ইসলামি সূর্যের আলোকরশ্মিতে আলোকিত হয়ে উঠতে থাকা মদিনার এই জনপদ দ্বীনপ্রেমীদের জন্য শান্তি ও প্রশান্তির এক মনোরম ভূমি হিসেবে প্রমাণিত হলো। কুফর ও শিরকের পরিবেশে যাদের হৃদয়-প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল, তাদের জন্য এই ঈমান-প্রেমী পরিবেশ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিক স্লোগানে পরিপূর্ণ তাকবির, প্রশান্তিদায়ক হিসেবে প্রমাণিত হলো।

আর এই স্বস্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেল তখন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছলেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার মদিনার দিনগুলো খুবই সুখে কাটছিল। দারুণ নিশ্চিন্তের একজীবন শুরু হলো তার। মদিনার মুহাজির পল্লিতে স্বামী-সন্তানকে নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগলেন। ইসলাম পালনেও কোনো বাধা রইল না।

আবু সালামার মৃত্যু

আবু সালামার মৃত্যু চতুর্থ হিজরির মুহাররাম মাস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয় দুধভাইকে কাতান অভিযানে পাঠালেন। সেখানে অবস্থান করলেন ২৯ দিন। সেই দীর্ঘ অভিযান শেষে ফিরে আসেন রাসুলের শহর মদিনায়। মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর তার পুরোনো ক্ষতস্থানটি আবার তাজা হয়ে উঠল। আবার চিকিৎসা

করা হলো সুস্থতার আশায়। কিন্তু নিরাময়ের আর দেখা পাওয়া গেল না কোনোমতেই। এর কিছুদিন পরই তিনি স্ত্রী-সন্তানদের রেখে আল্লাহর ইচ্ছায় ইন্তিকাল করলেন।

হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু চতুর্থ হিজরির সফর মাসে মদিনায় আসেন, আর লোকান্তরিত হন জমাদিউস সানি মাসের নয় তারিখে। মদিনাবাসীর সুখ-দুঃখের সাথি ও একমাত্র অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহর রাসুল। শোকসংবাদ তাঁকেই জানাতে হবে আগে। উম্মে সালামা অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে করতে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন। প্রিয়তমকে হারিয়ে শোকে পাগলপারা তিনি। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানালেন স্বামীর চির বিদায়ের খবর।

তারপর ফিরে গেলেন স্বগৃহে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবু সালামার মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হলেন। তার এক পুরোনো সঙ্গী ও ভাইকে হারিয়ে শোকে মুষড়ে পড়লেন যেন। একটু পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত হলেন উম্মে সালামার বাড়িতে। বিষাদভরা পরিবেশে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে পেলেন, শোকাকুল উম্মে সালামা মাঝে মাঝে বিলাপধ্বনি উচ্চারণ করে বলছেন- হায়! এ কী হলো! বিদেশ-বিভুঁইয়ে এ তার কেমনতর চলে যাওয়া!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন। বললেন –

''তুমি তার মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে থাকো। বলতে থাকো-হে আল্লাহ! আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন!''

সঙ্গে সঙ্গেই উম্মে সালামার মনে পড়ে গেল সেই দুআটির কথা। প্রিয়তম স্বামী নবিজির দরবার থেকে যা শুনে এসে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন। মনে পড়ে গেল, দোয়াটি তিনি নিজেও মুখস্থ করে নিয়েছিলেন, যাতে প্রয়োজনের সময় পড়তে পারেন। নবিজির বলাতে মনে পড়ে গেল তার দুআটির কথা। অশ্রুসজল নয়নে তিনি দোআটি পাঠ করলেন।

[জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ: ৩/২৪৩ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন!' এর পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন-আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে?]

বিবাহের প্রস্তাব

হজরত উম্মে সালামার শোকপালন পর্ব শেষ হলো। তার ইদ্দত ছিল বাচ্চাপ্রসব করা পর্যন্ত। কারণ, আবু সালামার ইন্তিকালের সময় তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সুতরাং তার কোলে এলো নতুন অতিথি। নাম রাখলেন তার বারবাহ। এখন বিবাহের প্রস্তাব আসতে আর কোনো বাধা নেই।

প্রথম প্রস্তাব এলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাল্যবন্ধু, হিজরতের সঙ্গী, বিশেষ মর্যাদাবান সাহাবি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে। তাঁর অসহায়ত্ব, চরম অর্থকষ্ট ও অভিভাবকত্বহীনতা বিবেচনা করেই মূলত তিনি এই প্রস্তাব দিলেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত সুন্দরীও ছিলেন। আবার ছিলেন শানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। পুণ্যবতী তো ছিলেনই। নারীদের মধ্যে ছিলেন প্রথম হিজরতকারিণী। কিন্তু তিনি হজরত আবু বকরের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এরপরে প্রস্তাব এলো সমগ্র আরবের খ্যাতিমান বীর পুরুষ, অন্যতম মর্যাদান সাহাবি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে। এই প্রস্তাবেও তিনি রাজি হলেন না। সবাই তার সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে ভাবলেন-উম্মে সালামা আসলে কী চাচ্ছেন? কিন্তু এই ব্যাপারটি উম্মে সালামার জন্য কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করল। কেননা, হজরত আবু বকর ও উমরের মতো ব্যক্তির প্রস্তাব যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে আর কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিতে সাহসী হলেন না। ফলে উম্মে সালামার সংসারে প্রায় অচল অবস্থা দেখা দিলো।".

[আল ইসাবা ফি তাময়িজিজ সাহাবা: ৩/২২৪]

নবীজির প্রস্তাবে শুভ বিবাহ

নবীজির প্রস্তাবে এই অনাথ মহিলার এবং তার পিতৃহীন সন্তান-সন্ততিদের দুঃখ-ক্লেশ লাঘব করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাই একদিন তিনি হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে উম্মে সালামার নিকটপ্রেরণ করলেন। তিনি তার নিকট উপস্থিত হয়ে হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন। এই প্রস্তাব শুনে হজরত উম্মে সালামার হৃদয় আনন্দে উথলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে পারলেন, আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুআর সেই কাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বয়ং প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার চেয়ে উত্তম পুরুষ এই দুনিয়ার বুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত উত্তম প্রস্তাব! এ তো আর ফিরিয়ে দেওয়ার নয়।

কিন্তু ধৈর্যশীলা ও বুদ্ধিমতী মহিলা তার আনন্দিত হওয়ার বিষয়টি বাহিরে প্রকাশ করলেন না। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ তার মনে বেশকিছু ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি করল। একে তো তার বয়সের সূর্য এখন মধ্যআকাশে। অথচ নবিজির রয়েছেন কমারী ও কমবয়সি আরও স্ত্রী। তাদের কারণে তার মর্যাদা খাটো করে দেখা হতে পারে। তার ওপর পূর্বের স্বামী আবু সালামার ঘরের ছয় সন্তানও তার সঙ্গে। সবমিলিয়ে তিনি দ্বিধাবোধ করছিলেন। এজন্য তিনি হজরত হাতিব ইবনু আবি বালতাআকে বললেন –

এটি আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এবং উত্তম প্রস্তাব বটে। কিন্তু আমার দুইটি কথা আছে। আমি কিছুটা আত্মসচেতন মহিলা বই কি! তদপুরি আমার সন্তান-সন্ততিও আছে। তারপর আমার বয়সও একটু বেশি! বলাবাহুল্য, হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে উম্মে সালামার কথাগুলো শুনে উল্লেখিত সমস্যাসমূহ নিজের ওপর বরণ করে নিলেন।

তিনি বললেন –

আমি দুআ করব, আল্লাহ তার আত্মমর্যাদাবোধের প্রখরতা কমিয়ে দিবেন। আর তার বয়স বেশি, আমিও তো বয়স্ক। বাকি রইল তার সন্তানের বিষয়টি। অথচ সন্তান আমারও আছে। তাদের সঙ্গে তার সন্তানদের দেখাশোনা আমিই করব। এরপর আসলে আর কিছু বলার থাকে না। হজরত হাতিব ইবনু আবি বালতাআ উম্মে সালামাকে তা জানিয়ে দিলেন। বুদ্ধিমতী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা আর কিছু বললেন না। তিনি সানন্দে সম্মতি জানালেন।

অতঃপর একদিন হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার দ্বিতীয় পুত্র উমরকে বললেন- চলো বাবা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমার বিয়ে পড়িয়ে দেবে।তিনি আরও বললেন- আল্লাহ তাআলা সেই দুআর বদলে আমাকে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ মানুষ উপহার দিয়েছেন। এবং তাঁর বাহুডোরে বাকি জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

[মুসলিম, হাদিস: ৯১৮। সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২০৪। তাবাকাত: ৮/৯৮। উসদুল গাবাহ। ৫/৫৮৯। আল ইসাবাহ: ১৩/২২৩। হায়াতুস সাহাবা: ২/৬৫৬]

প্রথম রাতে নবীজির প্রিয় খাবার

পয়লা রাতে নবিজির প্রিয় খাবার রহমাতুল্লিল আলামিনের সঙ্গে বিবাহের পর সাইয়িদা উম্মে সালামাও উম্মুল মমিনিনের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। পূর্ব থেকেই তিনি ছিলেন একটি উচ্চ ও সম্মানিত পরিবারের সদস্য। আবার এখন তিনি সকল মুমিনের মা হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন। এছাড়াও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যদের অন্যতম হওয়ার সোভাগ্য তার ছিল। এমনকি তিনিই সেই নারী, যিনি সর্বপ্রথম মদিনায় হিজরত করার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা এখন উম্মুল মাসাকিন সাইয়িদা জায়নাব বিনতে খুজাইমার ঘরে। তিনি ঘরের দিকে চোখ বোলালেন। খুঁটিয়ে দেখলেন সব কিছু। ঘরের এক কোনায় তার চোখ আটকে গেল। দেখলেন, একটি ইয়ামানি চাদর, একটি যাঁতাকল, একটি পাথুরে কুদাল এবং একটি মাটির পাত্র পড়ে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেলেন উম্মে সালামা। মাটির হাঁড়িতে কিছু ঘি পেলেন। তারপরে তিনি ঘি দিয়ে তরকারি রান্না করলেন। জাঁতাকল দিয়ে রুটি বানালেন।

এর একটু পরেই ঘরে তাশরিফ আনেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উম্মে সালামা সঙ্গে সঙ্গেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে খাবার পরিবেশন করলেন, যা ছিল নবিজির অত্যন্ত প্রিয় খাবার।" সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাইয়িদা উম্মে সালামার ওপর রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তিনি রাতের প্রথম ভাগে কনে হওয়ার পরপরই খাবার রান্না করে নবিজির সামনে পেশ করেছিলেন।

[তাবাকাত ইবনু সাদ: ৮/৭৩]

লাজুকতা

হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনূঢ়া ছিলেন না। তিনি হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সুদীর্ঘ সময় সংসার করেছেন। ছয় সন্তানের মা-ও হয়েছেন। তা ছাড়া বয়সও হয়েছে বেশ। তাই স্বাভাবিক নিয়মে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার কথা। সবকিছু সহজ হওয়ার কথা। কারণ, সাধারণত বয়স বেড়ে গেলে দীর্ঘ সময় সংসার করলে নারীদের অভ্যন্তরীণ কিছু লজ্জা কমে যায়। এটা পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু জননী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে উল্টোটা ঘটল। এমনিতে তিনি পূর্ব থেকেই ছিলেন লজ্জাশীল, তবে নবিজিকে এখন দেখলেই যেন তার লজ্জা অনেক বেড়ে যায়। লজ্জায় অধোবদন হয়ে যান তিনি। তিনি সামনে এলেই ছুটে গিয়ে নিয়ে আসেন মেয়েকে। কোলে বসিয়ে রাখেন। যেন ও কোলে থাকলেই স্বাভাবিক থাকতে পারবেন।

প্রিয়তমা স্ত্রীর কাণ্ড দেখে রাসুলের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। তাঁর প্রতি আরও বেশি ভালোবাসা জন্মায়। নবিজি নিজেও তো লজ্জাশীল। তার এ অবস্থা দেখে তিনি প্রথম রাতে হালকা আলাপ সেরে ফিরে গেলেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার দুধভাই আম্মার ইবনু ইয়াসার এই ঘটনা শুনে বললেন, 'আরে তুমি তো নবিজিকে তার অধিকার থেকে বাধাগ্রস্ত করছ।' এই বলে তিনি কোলের সন্তানকে নিয়ে গেলেন বাইরে।

[নাসায়ি: ৬/৮১-৮২। মুসনাদু ইমাম আহমাদ: ৬/৩১৪। মুসনাদু আবু ইয়ালা, হাদিস: ৬৯০৭, ৬৯০৮]

আদুরে ডাক

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক চরিত্র ও তার চিন্তাফিকির এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে, তিনি উম্মে সালামার খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। সুবিধা-অসুবিধা জেনে নিচ্ছিলেন। এমনকি প্রতিটি সন্তানের জন্য নবিজি ছিলেন চিন্তিত। দ্বিতীয় দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে চোখ বোলালেন চারদিকে। দেখলেন, বাচ্চারা সবাই সুস্থ আছে কিনা, সবাই ঘরে আছি কিনা।

কিন্তু একজনকে নবিজির অনুপস্থিত মনে হলো। নবিজি তড়িৎ জিজ্ঞেস করলেন- উম্মে সালামা! জানাবকে দেখছি না যে? সে কোথায় গেল? ইয়া রাসুলাল্লাহ! নবিজি বাচ্চাগুলোর শুধু নামই মনে রাখেননি, বরং তিনি বাচ্চাগুলোকে আদর করে ডাকার জন্য নামগুলোকে ছোট্ট করে নিয়েছেন। যার খবর তিনি নিচ্ছিলেন, তার নাম ছিলো জায়নাব। নবিজি তাকে আদর করে 'জানাব' বলে সম্বোধন করলেন।

উম্মে সালামা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার দুধভাই আম্মার ইবনু ইয়াসার এসেছিলেন। তিনি তাকে কোলে নিয়ে বাইরে গিয়েছেন। যেমন স্বামী, তেমন তাঁর স্ত্রী। স্ত্রী প্রথম রাতেই পছন্দনীয় খাবার রেধে খাওয়ালেন, আর স্বামী দ্বিতীয় দিনেই বাচ্চাদের নাম মুখস্থ করে তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে চিন্তিত ২৯ হলেন।

[নাসায়ি: ৬/৮১-৮২। মুসনাদু ইমাম আহমাদ: ৬/৩১৪। মুসনাদু আবু ইয়ালা, হাদিস: ৬৯০৭, ৬৯০৮]

নবীপ্রেম

হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা যেদিন কালিমা পড়ে মুসলিম হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান-মাল, স্বামী-সন্তানসহ সমগ্র পৃথিবীর চাইতে বেশি ভালোবেসেছেন। সেই রাসুলই আজ তার স্বামী, জীবনসঙ্গী। স্বভাবতই সেই ভালোবাসা আকাশ ছোঁয়ার কথা। অসীম থেকে সীমাহীন হওয়ার কথা। ঠিক তা-ই হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার ভালোবাসা অতলস্পর্শী। নিজেকে নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই, মাথাব্যথা নেই। তার চিন্তার একমাত্র বিষয়ই হলো, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসুলের আরাম-আয়েশের দিকে তার সার্বক্ষণিক সতর্ক দৃষ্টি। রাসুলের পছন্দ-অপছন্দই তার পছন্দ-অপছন্দ। রাসুলের হাসি-কান্নাই তার হাসি-কান্না। রাসুলের সুখ-দুঃখই তার সুখ-দুঃখ। তার জীবনটাই রাসুলময় হয়ে উঠেছে। তার ধ্যান-ধারণা কেবল রাসুলকে নিয়েই। তাকে কীভাবে ভালো রাখা যায়, স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা যায়, আরামে রাখা যায় তা নিয়েই তার ফিকির। এজন্য তাঁর সেবা-যত্নেসামান্যতম ত্রুটিও রাখলেন না। নিজে তো আছেনই। তার ওপর আবার 'মিহরান' নামের এক গোলামকে আজীবন রাসুলের খিদমত করার শর্তে মুক্ত করে দিলেন। যিনি পরবর্তী সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে দেওয়া 'সাফিনা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জননীর মাকাম

উম্মে সালামা যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতেন, সম্মান করতেন, সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতেন, তেমনই নবিজিও উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ভালোবাসতেন এবং মর্যাদা দিতেন। মিয়াবিবির এই মর্যাদার আদান-প্রদান পৃথিবীর তাবৎ মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন আসরের নামাজের পর এক এক করে সকল স্ত্রীর ঘরে তাশরিফ নিতেন। তাদের খোঁজখবর নিতেন।

সর্বপ্রথম তিনি হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে যেতেন। কারণ, সকলের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন তিনি। আর সর্বশেষে তাশরিফ নিতেন আম্মাজান আয়েশার ঘরে। এছাড়াও নবিজির ঘরেই উম্মে সালামার

সন্তানেরা লালিতপালিত হতেন। নবিজি তাদের দেখভাল করতেন। বিভিন্ন সময় তাদের হাদিয়া দিতেন। এ ব্যাপারে উম্মে সালামার সন্তান হজরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মা হজরত উম্মে সালামাকে বিয়ে করার কিছুদিন পর বললেন- আমি নাজাশিকে উপহার হিসেবে একটি চাদর এবং কয়েক আউন্স কস্তুরি পাঠিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, নাজাশি ইন্তিকাল করেছেন। যে কারণে সম্ভবত আমি যে উপহার পাঠিয়েছি তা ফেরত পাঠানো হবে। যদি এমনটাই হয়, তাহলে তা তোমাদের জন্য হাদিয়া।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন বলেছিলেন, তেমনটাই ঘটল। উপহারটি ফেরৎ এলো। নবিজি এক আউন্স মেশক অন্য সকল স্ত্রীদের মাঝে বণ্টন করে বাকি মেশক এবং চাদর আমাদের পরিবারকে হাদিয়া দিলেন।"

[সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস: ৫১১৪]

পরামর্শ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের প্রত্যেকেই ছিলেন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ। তন্মধ্যে আম্মাজান আয়েশা ছিলেন সবার সম্রাজ্ঞী। তার পরবর্তী স্থান ছিল আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার। নবিজির বাহুডোরে আসার আগেও তিনি জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন, বাহুডোরে আসার পরও তিনি যাপিত জীবনের নানান সমস্যার খুব সহজ সমাধান দিয়েছেন। যে কারণে ইতিহাস তাকে রাষ্ট্র প্রধানের রাজনৈতিক উপদেষ্টার মর্যাদায় স্মরণ করে থাকে।

ষষ্ঠ হিজরির কথা। বছরের শেষ দিক। জিলকদ মাস। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওনা দিলেন। সঙ্গে নিলেন চৌদ্দশ সাহাবির বিরাট এক কাফেলা। সঙ্গে আছে কুরবানির পশুও। যাতে মুশরিকরা বুঝতে পারে-মুসলিমরা যুদ্ধাভিযানে নয়; বরং উমরা পালনের উদ্দেশ্যেই আসছে।

কিন্তু কাফেলা যখন মক্কার অনতিদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছল, তখন কুরাইশরা পথ রোধ করে দাঁড়াল। বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিলো তারা। সাফ জানিয়ে দিলো-এ বছর কিছুতেই মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না: এমনকি উমরা পালনের উদ্দেশ্যেও তাদের মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।

একপর্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক ইশারার মাধ্যমে অনুধাবন করলেন, এই সন্ধির মাঝে লুকিয়ে আছে মুসলিমদের অপরিমিত কল্যাণ। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন, এ সন্ধির পেছনেই আছে ভবিষ্যৎ ইসলামের বিজয়ের রূপরেখা। বাস্তবিক অর্থে তাই ছিল। পরবর্তীতে এই সন্ধিই মক্কা বিজয়ের পথ খুলে দেয়। তারা উত্তেজিত হলেও কিছু করতে পারলেন না। কারণ, নবিজি যেখানে স্বাক্ষর করেছেন, তা সঠিক হবেই। তাই তাদের মন তাৎক্ষণিকভাবে না মানলেও তারা অবচক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন।

একপর্যায়ে চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর সম্পন্ন হলো। অসীম কষ্ট সত্ত্বেও তারা মেনে নিলেন-এ বছর হচ্ছে না উমরা পালন। তাই সঙ্গে নিয়ে আসা পশু এখানেই কুরবানি করতে হবে, মুণ্ডাতে হবে মাথা। ফলে সঙ্গত কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ করলেন-

''তোমরা কুরবানির পশু জবাই করো। মাথার চুল ছেঁটে ফেলো। ইহরাম খুলে স্বাভাবিক হয়ে যাও। একে একে নবিজি তিন বার দিলেন এই ঘোষণা।''

কিন্তু কী আশ্চর্য! কেউ তার কথায় কর্ণপাত করছে না। যারা নিজের জান বাজি রেখে তাঁর নির্দেশে প্রাণ দিতে হুদাইবিয়া প্রান্তর পর্যন্ত এসেছে, তারা এখন আদেশ পালনে তৎপর হচ্ছে না! সকলেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে, সন্ধি না করার পক্ষে অটল আছে! সকলেই চুপচাপ, বিমর্ষ মনে বসে আছে নিজেদের তাঁবুতে! এই সংকট সমাধানে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে নবিজির দরবারে হাজির হলেন হজরত উম্মে সালামা। সম্মুখে বসলেন আদব ও বিনয়ের সঙ্গে। বিনীত কণ্ঠে বললেন-

ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাহাবিদের আপনি ক্ষমা করে দিন। তাদের আচরণে কষ্ট পাবেন না। বাইতুল্লাহর প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং উমরার মতো পুণ্যকাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছে না। আপনি বরং বাইরে গিয়ে কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলে কুরবানির পশু জবাই করে দিন এবং মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। দেখবেন, আপনাকে দেখে তারা আর বসে থাকতে পারবে না। আপনার দেখাদেখি তারাও পশু জবাই এবং মাথা মুণ্ডন করে ফেলবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামার এমন বদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তে বিস্মিত হলেন। যেখানে কোনো সাহাবি তার কাছে যাওয়ার সাহস করছিলেন না, সেখানে তিনি গিয়ে এমন পরামর্শ দিলেন, যা শুনে স্বয়ং রাসুলও অবাক হলেন।

হ্যাঁ, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা এমনই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে যার কোনো তুলনা হয় না। এজন্য মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সবসময় সঙ্গে রাখতেন। সংকটপূর্ণ সময়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। নবিজি উম্মে সালামার পরামর্শের যথার্থতা অনুধাবন করে বুঝতে পারলেন, আসলেই এর চেয়ে উত্তম পরামর্শ আর হয় না। তাই তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে এলেন। কারও সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। যেন অভিমান করেছেন প্রিয় সঙ্গীদের সঙ্গে। নীরবেই পশু কুরবানি দিয়ে মাথা মুণ্ডন করলেন।

সাহাবায়ে কিরাম দেখলেন প্রিয় রাসুলের অভিমানী চেহারা। শিহরে উঠলেন তারা। আল্লাহর ইশারা ছাড়া যিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেন না, তাঁর মতের বাইরে আমরা কী করে অবস্থান নিতে পারি? এজন্য প্রত্যেকেই তৎক্ষণাত নিজেদের পশু কুরবানি করলেন এবং একজন আরেকজনের মাথা মুণ্ডন শুরু করলেন। এতক্ষণ তারা ভাবছিলেন যে, মুশরিকদের সঙ্গে দৃশ্যত অবমাননাকর চুক্তি হয়তো পুনর্বিবেচনা হবে, নবিজি হয়তো তাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন, তাই তারা আদেশ পালনে গরিমসি করছিলেন। কিন্তু যখন প্রমাণিত হলো যে, নবিজি তাঁর সিদ্ধান্ত ও আদেশের ব্যাপারে অবিচল, তখন তারা সেই আদেশ পালনে হুমড়িখেয়ে পড়লেন। আর একমুহূর্ত দেরি করলেন না।

প্রিয় সাহাবিদের আনুগত্য দেখে দারুণ খুশি হলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অভিমানের ছায়া মুছে গেল চেহারা থেকে। উম্মে সালামার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন তিনি। কারণ, সাহাবিদের দ্বিধান্বিত মনের একটা সুন্দর সমাধান বের করেছেন তিনি। বস্তুত জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে উম্মে সালমার এই বিচক্ষণতা ও ভূমিকা মুসলিম মহিলাদের জন্য সমাজ ও জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

[বুখারি, হাদিস: ২৭৩১-২৭৩২। ফাতহুল বারি ৫/৩৪৭। সুলহুল হুদাইবিয়া ওয়া আসারুহু ফি নাশরিদ দাওয়া, পৃষ্ঠা: ১১৬। উম্মু সালামা আল আকিলা আল আলিমা উম্মুল মুমিনিন, আমিনা ওমর আল খাররাত, পৃষ্ঠা : ৪২-৪৬। উম্মু সালামা, পৃষ্ঠা: ৮৮-৯২]

আনুগত্য

আনুগত্য এলোমেলো হয়ে আছে চুলগুলো। বেণি করে রাখা দরকার। এজন্য ডাকলেন খাদিমা বাররাহকে। তিনি এলে বললেন- চুলগুলো বেণী করে দাও তো!এই বলে তিনি বসে পড়লেন বিছানায়। খাদিমা গিয়ে বসল পিছনে। কথামতো চল বেণি করা শুরু করল। এমন সময় আম্মাজানের কানে আওয়াজ এলো নবিজির ভরাট গলার। তিনি কেবল 'লোকসকল' বলে সম্বোধন করেছেন। অমনি খাদিমাকে বললেন-

চুল বেঁধে দাও!

খাদিমা অবাক হয়ে বলল- সবে তো শুরু করেছি, এত তাড়া কীসের?

আম্মাজান তড়িৎ জবাব দিলেন-
নবিজি 'লোকসকল' বলে সম্বোধন করেছেন!

খাদিমা বলল- কেবল 'লোকসকল' বলেছেন।

আম্মাজান তড়িঘড়ি করে উঠতে উঠতে বললেন- আমরা কি 'লোকসকল'-এর অন্তর্ভুক্ত নই?

এই বলে তিনি চুল বাঁধতে বাঁধতে দ্রুত চলে গেলেন মসজিদে নববির সঙ্গে লাগোয়া দরজার কাছে। দরজার কপাটে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে শুনলেন পুরো বয়ান।

এই হাদিস থেকে অনুধাবন করা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার আনুগত্য ও ইলম অর্জনের প্রতি আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার কতটা আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল। এজন্যই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফকিহা। আম্মাজান আয়েশার পরেই ছিল তার অবস্থান। অনেক সাহাবি ও তাবিয়ি তার থেকে দরস নিতেন।

[মুসনাদু আহমাদ: ৬/৬৯৭]

নবীজির বিদায়বেলা

এগারো হিজরির আঠাশ সফর। বুধবার রাত। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বাকিয়ে গারকাদ' কবরস্থান জিয়ারতে গেলেন এবং কবরবাসীদের জন্য দুআ করলেন। জিয়ারত শেষে ফেরার পথে নবিজির মাথাব্যথা শুরু হলো। এরপর প্রচণ্ড জ্বর এলো শরীরে। ভীষণ অসুস্থ হলেন নবিজি। তবে অসুস্থতার এ সময়ে তিনি প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদের ঘরে যাতায়াত করলেন। তাশরিফ নিলেন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরেও। তবে অসুস্থতা যখন বেড়ে গেল, তখন উম্মে সালামাসহ অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে এভাবে অনুমতি নিলেন-

'অসুস্থতার দিনগুলো আমি আয়েশার ঘরে থাকতে চাই।'

কেউ না করলেন না। সবাই অনুমতি দিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুখ ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং একপর্যায়ে মসজিদে যাওয়াও তাঁর জন্য ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়ল। সে সময় তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দিককে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন।
ঘটনাক্রমে একদিন আবু বকর ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আনসার সাহাবিদের এক বৈঠকের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা দেখলেন-উপস্থিত সবাই কাঁদছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জানালেন, 'আমরা নবিজির দরসের কথা মনে করে কাঁদছি।' হজরত আব্বাস তাদের এই অবস্থার কথা জানালেন নবিজিকে। এ কথা শুনে তিনি হজরত আলি ও হজরত ফজল ইবনু আব্বাসের কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বেরোলেন। নবিজি মিম্বারে উঠতে চাইলেও অসুস্থতার কারণে উঠতে পারলেন না। ফলে প্রথম সিঁড়িতেই বসে পড়লেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সাহাবিদের সামনে দিলেন এক অলংকারপূর্ণ ভাষণ।

তিনি বললেন, 'হে লোকসকল! আমি জানতে পারলাম, তোমরা তোমাদের নবির মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় করছ। তোমাদের জানা থাকা চাই, আমার আগে কি কোনো নবি চিরকাল থেকেছেন? তাহলে আমি থাকব কেন? হ্যাঁ, আমি আমার মহান রবের সঙ্গে শিগগিরই মিলিত হতে যাচ্ছি এবং তোমরাও আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তবে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলনের স্থান হচ্ছে হাউজে কাউসার।

অতএব, এ বিষয়টি যে পছন্দ করে, কিয়ামতের দিন সে হাউজে কাউসার দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, সে যেন আপন হাত ও মুখকে অনর্থক কাজ ও অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত রাখে। আমি তোমাদের মুহাজির ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং মুহাজিররা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা ও সদাচরণের অসিয়ত করছি।'

নবিজি আরও বললেন, 'মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে। আর যখন তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করে।'

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা পূর্বের মতো ঘরের কপাটে দাঁড়িয়ে নবিজির শেষ ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। হারানোর যন্ত্রণা কমানোর জন্য খুঁজতে লাগলেন নানান অজুহাত। কিন্তু শত অজুহাত সত্ত্বেও চোখ কোনো বাধা মানল না। অঝোরে বারি বর্ষণ করতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান আয়েশার ঘরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর আম্মাজান উম্মে সালামা উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করতে লাগলেন। অস্থির হয়ে রইলেন সব সময়। নবিজিকে দেখার জন্য বারবার মনটা আনচান করতে লাগল। এজন্য তিনি একটু পরপর নবিজিকে দেখতে আম্মাজান আয়েশার ঘরে যেতে লাগলেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা অত্যন্ত অবনতির দিকে চলে গেল। আম্মাজান উম্মে সালামা ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। চিৎকার দিয়ে উঠলেন সজোরে। নবিজি তার এই অবস্থা দেখে বললেন-

‘উম্মে সালামা! এরূপ করতে নেই, এটা মুসলিমদের রীতি নয়। ধৈর্য ধরো।‘

১২ই রবিউল আউয়াল। রোজ সোমবার। সেদিন হজরত আবু বকরের ইমামতিতে লোকেরা ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশার ঘরের পর্দা সরিয়ে লোকদের নামাজ পড়তে দেখে মুচকি হাসলেন। হজরত আবু বকর বিষয়টি টের পেয়ে পূর্বের মতো পেছনে সরে আসতে উদ্যত হলেন। তখন আনন্দের আতিশয্যে সাহাবিদের মনও নামাজের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের ইশারায় নামাজ চালিয়ে যেতে বললেন।
এরপর তিনি পর্দা ফেলে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। এ ঘটনার পর আর কখনো নবিজি বাইরে বের হননি। সেদিন জোহরের নামাজ শেষে বিদায় হজের তেরাশি দিন পর ৬৩ বছর বয়সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রফিকে আ'লার ডাকে সাড়া দিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

[সিবাতু ইবনি হিশাম, মিরকাত, শরহে মিশকাতা সিরাতু মুহাম্মাদিয়া। ফ্যাতহুল বারি। আর রাহিকুল মাখুন, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস।]

ইবাদতে মশগুল

ইবাদত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আম্মাজান উচ্ছে সালামা বাদিয়াল্লাহু আনহা যস্তি পেতেন কেবল রবের ইবাদত এবং প্রিয়তনের স্মৃতি রোমন্থনে। তিনি শান্তি পেতেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা করা হাদিসগুলো সাহাবি এবং তাবিয়িদের শোনাতে পেরে। তার ভালো লাগত আবু হুরাইরার মতো বিদ্যান সাহাবিরাও যখন তার থেকে হাদিসের দরস নিতেন।

নবিজির জীবনের আলোকে শরয়ি মাসায়েলের সমাধান দিতে তার ভালো লাগত। ঠিক হুবগু নবিজির পঠনরীতির মতো কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন সাহাবি-তাবিয়িদের। এসব করেই দিন কাটত তার। স্মৃতি রোমন্থন

করতেন প্রিয় নবিজির। তার একাকী জীবনে এখানেই স্বস্তি খুঁজে পেতেন। তাই তিনি নবিজির ইন্তিকালের পর কোনো যুদ্ধে শরিক হননি। তবে নবিজির দরসলব্ধ বিদ্যার আলোকে পরামর্শ দিতেণ যে কারণে সাহাবি এবং তাবিয়িদের বিরাট একটি দল তার বাড়িতে একরূপ স্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলেন।

[মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩০০, ৩০২, ৩১৩, ৩১৭]

আম্মাজান উম্মে সালামা বিভিন্ন যুদ্ধের পরামর্শ যেমন দিয়েছেন, তেমনই বিভিন্ন মাসআলার সমাধানও তিনি দিয়েছেন। ইলমুল হাদিসে আম্মাজান উম্মে সালামার গভীর দখল ছিল। তিনি সর্বমোট ৩৭০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বুখারি ও মুসলিমে যৌথভাবে ১৩টি এবং এককভাবে বুখারি ৩টি ও মুসলিমে ১৩টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য সাহাবা-তাবিয়িন তার থেকে হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন। তদুপরি তিনি ছিলেন পুরো বিশ্বের অন্যতম মুফতিয়া। এমনকি আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও তার থেকে ফাতওয়া নিয়েছেন।

ইলমি মাকাম

আম্মাজান উম্মে সালামা ফকিহা যেমন ছিলেন, তেমনই মুফতিয়া ও মুহাদ্দিসাও ছিলেন। হাদিস বর্ণনায় আম্মাজান আয়েশার পরেই তার অবস্থান হলেও অনেক মাসআলা কেবল তার দিকেই রুজু করা হতো। অর্থাৎ তিনি ছাড়া সে ব্যাপারে কেউ উপযুক্ত মত দিতে পারেননি। বিশেষত নারী ঘটিত মাসআলা তার থেকেই সমাধান নেওয়া হতো। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মুহাদ্দিস সাহাবিও তার থেকে মাসআলার সমাধান নিতেন। এমনকি নবিজির জামানায় যাদের ফাতওয়া গ্রহণ করা হতো, আম্মাজান উম্মে সালামা ছিলেন তাদের অন্যতম।

তার অনেক তালিব-তালিবা ছিলেন। তন্মধ্যে সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন –

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু সাইদ খুদরি, আবদুর রহমান ইবনু আউফ এবং উমর ইবনু আবি সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সাহাবিয়াদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আম্মাজান আয়েশা, জায়নাব বিনতে আবি সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাবিয়ি-তাবিয়াদের মধ্য অন্যতম ছিলেন সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, আতা ইবনু রাবাহ, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, উরওয়া ইবনু জুবাইর এবং হিন্দ বিনতে হারিস রাহিমাহুমুল্লাহ। তারা ছাড়াও আরও অনেক সাহাবি-তাবিয়ি আম্মাজান উম্মে সালামা থেকে হাদিস বর্ণনা করার মর্যাদা লাভ করেন। আর তিনি নিজে সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু সালামা এবং সাইয়িদা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদিস বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

[তাহজিবুত তাহজিব: ১২/৪৫৬। নিসাউম মিন আসরিত তাবিয়িন: ১/১৫৯-১৬৭]

কেনো তিনি অনন্য

উম্মে সালামা যেহেতু বাইআতে রিদওয়ানে শরিক ছিলেন, এজন্য তিনি জান্নাতিদের দলভুক্ত। আর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-'আল্লাহ তাআলা আমাকে কেবল জান্নাতি নারীদের বিয়ে করার আদেশ দিয়েছেন।'

ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

''মুমিনদের মা-জননী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা নারী সাহাবিদের অন্যতম ফকিহাদের একজন ছিলেন।''

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

''আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মদিনায় হিজরতকারী প্রথম নারী সাহাবি।''

ঐতিহাসিকগণদের মতে –

''আমাদের মা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহ আনহা আল্লাহর পথে তিনবার হিজরত করার সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন।''

চিরবিদায়

হিজরি ৬১ সন। বছরের শেষের দিক। আম্মাজান উম্মে সালামার বয়স তখন চুরাশি। বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছে শরীর। তবে ঈমানের তেজ কমেনি একটুও। কিন্তু ধরণীর নীতি অনুযায়ী এখন তার চলে যাওয়ার পালা।

অন্ধকার এ পৃথিবীকে আলোয় ভাসাতে ৮৪ বছর আগে নেমে এসেছিলেন এক নক্ষত্র। নিজের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন যথাযথভাবে। পার করেছেন গৌরবোজ্জ্বল এক বর্ণিল জীবন। এখন চলে যাচ্ছেন তার আসল ঠিকানায়।
বিশ্বস্রষ্টার চিরস্থায়ী জান্নাতের পথে রওনা দিচ্ছেন উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহ আনহা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইন্তিকালের সময় আম্মাজানের কাছে উপস্থিত ছিলেন তার দুই পুত্র সালামা ও উমর এবং তার দুই ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া এবং আবদুল্লাহ ইবনু জামআ। ইন্তিকালের বেশকিছু আগে তিনি অসিয়ত করেছিলেন, হজরত সাইদ ইবনু জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেন তার জানাজার নামাজ পড়ান। কিন্তু তার আগেই ইন্তিকাল করেছিলেন হজরত সাইদ ইবনু জাইদ। এজন্য বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন রাসুলের সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে তার জানাজার নামাজ পড়ান।

তারপর তাকে যথাযোগ্য সম্মানে জান্নাতুল বাকির মাটিতে সাইয়িদা ফাতিমার কবরের পাশে দাফন করা হয়। ফুলে ফুলে ছেয়ে রইল আম্মাজানের কবর-ঘর। জান্নাতি সুবাসে সুবাসিত হলো তার চিরনিদ্রার প্রাসাদ।

এর কিছুদিন পরের কথা। কজন লোক জান্নাতুল বাকি পরিদর্শনে গেল। সেখানে তারা খুঁজে পেল একটি পাথর। তাতে খোদাই করে লেখা ছিল-'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামার কবর।' এরপর পরিচিত হয়ে গেল তার কবরের জায়গাটি এবং প্রসিদ্ধ হয়ে রইল আজও লোকমুখে।

[মুসলিম, হাদিস: ২১৪০। আজওয়াজুন নাবি, পৃষ্ঠা: ৬৪। তারিখুল মাদিনা: ১/১২০। জাদুল মাআদ: ১/৪১। নিহায়াতুল আরব: ১৮/১৭৯]

জুয়াইরিয়্যা বিনতে হারিস মুসতালাকিয়্যা রাঃ

উম্মুল মুমিনিন আম্মাজান জুওয়াইরিয়া ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার। ইবাদতের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আম্মাজান জুওয়াইরিয়া অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারিণী ছিলেন।

وكانت حلوة ملاحة لا يراها أحد الا الا أن إلا أخذت بنفسه

তিনি এতই কমনীয় মিষ্টভাষিণী ছিলেন যে, তাকে যে দেখত সেই তাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে পারত না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অন্যান্য স্ত্রীর মতো হজরত জুওয়াইরিয়ার ওপরও পর্দা পালনের বিধান আরোপ করেন এবং অন্যদের মতো তার জন্যও সম্পদের অংশ নির্ধারণ করেন। নবিজি সাঃ খাইবারযুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের সম্পদ থেকে ৮০ ওসাক খেজুর ও ২০ ওসাক যব বা গম প্রদান করেন।

আম্মাজান জুওয়াইরিয়া থেকে সাতটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি সহিহ বুখারিতে এবং দুইটি সহিহ মুসলিমে উল্লিখিত আছে। আম্মাজান জুওয়াইরিয়ার গর্ভে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি নবিজির ইন্তিকালের পর অনেকদিন জীবিত ছিলেন।

জন্ম ও বংশ ও পরিবার

জন্ম ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ। হিজরি সনের চৌদ্দ বছর আগের কথা। ইয়াসরিবের মুরাইসি এলাকায় তখন বসবাস করছে আরব কবিলা খুজাআ। তার একটি অন্যতম শাখার নাম বন্ মস্তালিক। সেই মস্তালিক গোত্রের সর্দার হারিস ইবনু আবি জিরার। তার কানে এসে পৌঁছল-মক্কায় এক নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে; যার নাম ইসলাম, যারা সেই ধর্ম গ্রহণ করে, সেই ধর্মের প্রবক্তা কুরাইশ বংশের মুত্তালিব পরিবারে জন্ম মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি; যে কিনা নিজেকে আল্লাহর দূত বলে দাবি করছে। এ কথা শুনেই হিংসার অনলে দগ্ধ হলো সর্দার হারিস।

ঠিক সে সময় ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু হারিস ইবনু জিরাবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেন এক ফুটফুটে সন্তান। হারিস ও তার পরিবারের লোকজন আদর করে তার নাম রাখল 'বাররাহ'। কী মর্মসমৃদ্ধ সেই নাম, কত সুন্দর তার অর্থ-পূতপবিত্র। কিন্তু কে জানত যে, নামের অর্থের মতো তার জীবনও হবে সর্বাধিক পবিত্র, তিনি হবেন সকল মুমিনের মা!

বেড়ে উঠা

হজরত বাররাহ ইয়াসরিব শহরের অনতিদূরে মুরাইসি এলাকায় বেড়ে উঠতে লাগলেন। তার শৈশব অতিবাহিত হতে লাগল মুশরিকদের রীতিনীতির আদলে।

[আল হাকিম নিশাপুরি, আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন, তাহকিক: মুস্তফা আবদুল কাদির আতা, বৈরুত। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ/১৪১১হিজরি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮-২১]

১ম বিবাহ

হজরত বাররাহ এখন পূর্ণ যুবতি। বিয়ের বয়সে উপনীত হয়েছেন। হারিস ইবনু দিরার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। মেয়ে তার সুন্দরী-রুপবতি। যেকেউ একবার দেখলেই সৌন্দর্যের সমুজ্জ্বল আলোকে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য-এমনই সুন্দর ছিলের হজরত বাররাহ। তার সৌন্দর্যের কথা শুনে নানান পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। কিন্তু কোনো প্রস্তাবেই রাজি হতে পারলেন না তার বাবা হারিস ইবনু দিরার। কাউকেই নিজের মেয়ের জন্য উপযুক্ত মনে হলো না। এজন্য বহু প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

কিন্তু মেয়ে তো বড় হয়েছে, বিয়ে দিতেই হবে। নয়তো লোকেরা বলবে কী? এসব চিন্তা হারিসের মাথায় আসতেই তার মনে পড়ে গেল ভাতিজার কথা, ছেলেটা দেখতে শুনতে খারাপ না, আমার মেয়ের সঙ্গে মানাবে ভালো, তা ছাড়া বেশ ভালো যোদ্ধাও বটে।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, বিয়ে দেবে তার ভাতিজা মুসাফি ইবনু সাফওয়ানের সঙ্গেই। একদিন সে প্রস্তাব নিয়ে গেল ভাই সাফওয়ানের কাছে। আপন ভাই সাফওয়াম প্রস্তাব শুনে তো মহাখুশি। আসলে সে কল্পনাই করতে পারেনি যে, বড় ভাই-যিনি কিনা এই গোত্রের সর্দার, তিনি আসবেন প্রস্তাব নিয়ে; এমনকি নিজের মেয়ের প্রস্তাব নিয়ে! এ তো অকল্পনীয় ব্যাপার। এজন্য কালবিলম্ব না করে সেই মজলিস্টে বিয়ের দিন-ক্ষণ নির্ধারণ হয়ে গেল। মদিনার মুশরিকদের রেওয়াজ অনুযায়ী বিয়ের আয়োজন করা হলো। লোকবল জয়ে হলো বিয়েতে। বিয়ে পড়ালেন পিতা হারিস ইবনু দিরার। তৎপরে সকলের সন্তুষ্টিচিত্তে বিয়ে সম্পন্ন হলো।

[ইবনে ইসহাক (১৯৫৫) ৩৮০-৩৮৮ হাফিজ শামসুদ্দিন আজ জাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬২, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫ হিজরি মুতাবেক ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ। আত তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২]

যুদ্ধ বন্দির ঘটনা

জাইনাব বিনতু জাহাশকে বিবাহের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বহু বড় বড় ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। হিজরী ৫ম বছরের অধিকাংশ সময় কেটে যায় এসব ঘটনায় ব্যস্ত থেকে। শাওয়ালের শেষ দিকে এবং যুলকা'দাহ মাসের

প্রথমে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন হাযার মুসলিম সৈন্য নিয়ে খন্দকের অপর প্রান্তে থেকে ইহুদী ও মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীর ১০ হাযার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বনু কিনানাহ, তাহামাহ অধিবাসী, গাত্বফান গোত্র ও নজদবাসীও ঐ দলে শামিল ছিল। এ সম্মিলিত বাহিনী চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করে। মদীনার ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে। যেসব মুনাফিক কেবল গনীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যোগদান করেছিল, তারা সম্ভাব্য আক্রমণের তীব্রতা অনুমান করে দলত্যাগ করে বাড়ী ফিরে যায়। ২৭ দিন মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে।

অতঃপর আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করেন। তারা বিজয়ী বেশে বাড়ী এসে অস্ত্র খুলে রাখার পূর্বেই নির্দেশ আসে ইহুদী বনু কুরাইযা গোত্র আক্রমণের। যুলকা'দার শেষে ও যুলহিজ্জার প্রথমে ২৫ দিন মুসলিম বাহিনী ঐ গোত্র অবরোধ করে রাখেন। এরপর বনু লিহয়ান, যী কারদ, প্রভৃতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অতঃপর মুসলমানরা মদীনায় ফিরে আসার পরে এক মাসও অতিক্রান্ত হয়নি, এমতাবস্থায় খবর আসল যে, খুযা'আহ গোত্রের একটি কবীলা বনু মুছতালিক আল-হারিছ ইবনু আবী যিরারের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরাইদা আল-আসলামীকে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে সংবাদ দিলেন যে, বনু মুছতালিক অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করে রাসূলের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তৈরি হয়েছে এবং তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়েছে। রাসূল সাঃ এ খবর পেয়ে যায়েদ বিন হারিছাকে মদীনার দেখা-শুনার জন্য ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিযুক্ত করে।

৪র্থ মতান্তরে ৫ম হিজরীর ২রা শা'বান সোমবার ৭০০ জন মুজাহিদ নিয়ে বনু মুছতালিককে প্রতিহত করতে বের হন। মদীনা থেকে ৯ মাইল দূরে বনু মুছতালিকের 'মুরাইসী' নামক কুয়ার কাছে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ অবস্থান নেন। সেখানে রাসূল সাঃ-এর জন্য একটি চামড়ার তাবু টানানো হয়। এ সফরে তাঁর সাথে আয়েশা ও উম্মু সালমা রাঃ ছিলেন। মুজাহিদগণ কুয়ার নিকটে সমবেত হ'লেন, তারা যুদ্ধের জন্য হ'লেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। মুহাজিরদের পতাকা আবু বকর রাঃ বা আম্মার ইবনু ইয়াসার-এর নিকট এবং আনছারদের পতাকা সা'দ ইবনু উবাদাহর নিকট অর্পণ করলেন। বনু মুছতালিকের পতাকাবাহী ছিল ছাফওয়ান ইবনু যীশ শুফরাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর রাঃ-কে নির্দেশ দিলেন, একথা প্রচারের জন্য যে, 'তোমরা বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমাদের জান-মাল নিরাপদে থাকবে'। ওমর রাঃ ঘোষণা করলে বনু মুছতালিকের লোকেরা এই স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে যুদ্ধ শুরু হ'ল। এ যুদ্ধে একজন মুজাহিদ শহীদ হন। পক্ষান্তরে বনু মুছতালিকের ১০জন নিহত হয় এবং বাকী সবাই বন্দী হয়। এই বন্দীদের মধ্যে জুওয়াইরিয়া রাঃও ছিলেন।

[ড. আয়েশা আব্দুর রহমান বিনতুশ শাত্বী, তারাজিমু সাইয়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত (বৈরুত :দারুর রাইয়্যান লিত তুরাছ, তা.বি.), পৃঃ ৩৫৬-৫৭। আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী, দালাইলুন নবুওয়াত, তাহক্বীক : ড. আব্দুল মু'তী কালা'জী, ৪র্থ খন্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫খ্রীঃ/১৪০৫হিঃ), পৃঃ ৪৭। দালাইলুন নবুওয়াত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৪-৪৭। তারাজিমু সাইয়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩৫৭]

গণিমতের মাল ও বন্দিশালা

বনু মুস্তালিক যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক মুশরিককে যদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করলেন। মদিনায় আগমনের পর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য রেখে বাকি গনিমত বণ্টন করে দিলেন জিহাদে যাওয়া মসলিমদের মধ্যে। তারা আল্লাহর এই নেয়ামতে শুকরিয়া আদায় করলেন। সচ্ছলতা ফিরে এলো অনেক পরিবারে।

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে ছিলেন বনু মুস্তালিকের গোত্রপতি হারিস ইবনু আবি দিরারের কন্যা হজরত বাররাহ। তিনি পড়লেন সাবিত ইবনু কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগে। হজরত বাররাহ বন্দি হওয়ার পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কেবল সেই স্বপ্নের কথাই ভাবছিলেন। কাউকে বলেননি সেই স্বপ্নটির কথা। যুদ্ধে যখন তিনি নবিজিকে দেখলেন, তখনও তিনি জানতেন না যে তিনি আল্লাহর রাসুল। তার চাচাতো বোন তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল-ওই দেখো, মদিনার নায়ক, পুরো বিশ্বের মুসলিমদের নেতা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এরপর থেকে শুধু তাঁর কথাই ভাবছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন, স্বপ্নে দেখা সেই চাঁদ তিনিই হবেন, আল্লাহর রাসুলই হবেন সেই আলোকজ্জল চাঁদ। কিন্তু তার ভাবনা যেন মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে, তিনি তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাগে পড়েননি; বরং সাধারণ এক সাহাবির ভাগে পড়েছেন। তাহলে কি সেই? বিষন্নতা পেয়ে বসল তাকে। অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল তার ভেতর। পূর্বের সেই অস্থিরতা আবার জেঁকে বসল তাকে।

[আসাহহুস সিয়ার, পৃষ্ঠা: ১৭২। ২০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/১৫৯। মুসতাদরাকে হাকিম: ৪/২৭। হায়াতুস সাহাবা ২/৬৬৫]

মুক্তির আশা

হজরত বাররাহ ছিলেন গোত্রনেতার মেয়ে। তদুপরি ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী। আহ্লাসিও ছিলেন বটে। কোমল স্বভাব, আত্মসম্মান ও স্বাধীনচেতা স্বভাব ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। কিন্তু বন্দি হয়ে বিপাকে পড়ে গেলেন। মেনে নিতে পারলেন না দাসত্বের জীবন। তাছাড়া সেই স্বপ্ন তাকে বারবার পীড়া দিচ্ছিল। এজন্য কালবিলম্ব না করে সাবিত ইবনু কায়েসকে বললেন-

আমি মুক্তি পেতে চাই। সাবিত ইবনু কায়েস বললেন- তাহলে মুকাতাবা চুক্তি করুন!
অর্থাৎ, দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে মনিবের সঙ্গে - মুক্তিপণ পরিশোধের চুক্তি করা হলো মুকাতাবা।

হজরত বাররাহ জিজ্ঞেস করলেন- ঠিকাছে, মুক্ত হতে হলে কী করতে হবে? সাবিত বললেন-নয় উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে, ইরশাদ করেছেন-

وَ الَّذِينَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَّآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِي أَتٰكُمْ

আর তোমাদের এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীর মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চাইলে তাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তোমরা ওদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও এবং আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা হতে তোমরা ওদের দান করবে।

[সুরা নুর, আয়াত: ৩২]

হজরত বাররাহ এই চুক্তিতে রাজি হলেন। কিন্তু যখনই মনে পড়ল-নয় উকিয়া স্বর্ণ চুক্তির কথা তখন চিন্তা করলেন, নয় উকিয়া স্বর্ণও তো তার কাছে নেই। তিনি এখন কোনো গোত্রপতির মেয়ে নন, তার বাবা পলাতক, তিনি এখানে বন্দি হয়ে এসেছেন, কীভাবে এতগুলো স্বর্ণের বন্দোবস্ত করবেন? আবার না করে তো উপায়ও নেই, তিনি আর একমুহূর্ত বন্দিজীবনে থাকতে চান না। কিন্তু উপায়? এজন্য চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন হজরত বাররাহ।

একপর্যায়ে তার মনে পড়ল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। তিনি শুনেছেন, রাসুল অত্যন্ত দয়াবান, কারও ওপর কখনো জুলুম করেন না, সবার মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি আল আমিন, তিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন। এগুলো মনে পড়তেই তিনি চললেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের দিকে। মনে তার আশা, দাসত্বজীবন থেকে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তার আশা কি পূরণ করবেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? ২৬

আল মাওসুআতুল ফিকহিল মুআসসাহ ফি ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, পৃষ্ঠা: ২৩৭।

চোখ ফেরানো দায়

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বসে আছেন নিজ ঘরে। পাশেই বসে আছেন প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন হজরত বাররাহ বিনতুল হারিস। আম্মাজান জিজ্ঞেস করলেন- কেন এসেছেন?

জবাবে বললেন- নবিজির কাছে এসেছি আমার মুক্তির অর্থের জন্য। এমতাবস্থায় হজরত বাররাহ প্রবেশ করলেন এবং ক্ষীণ আওয়াজে পায়ে হেঁটে তাঁর সামনে গিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসুল। যুদ্ধবন্দি কোনো নারীর মুখে অকস্মাৎ একত্ববাদের স্বীকৃতি শুনে খুশি হয়ে উঠলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবিজি কিছু বলার আগেই হজরত বাররাহ আরও বললেন-

يا رسول الله، أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك،
فوقعت في سهم ثابت بن قيس لم فكاتبته على نفسي ... ثم جئتك أستعينك على أمري

ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি জানেন, আমি আমার গোত্রপতি হারিস ইবনু দিরারের কন্যা। আমি মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে এসেছি এবং সাবিত ইবনু কায়েসের ভাগে পড়েছি। সাবিত আমার সঙ্গে 'মুকাতাবা করেছেন, অর্থ নিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু আমি অর্থ পরিশোধ করতে পারছি না। আমি আপনার নিকট এই প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি আমার চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন। বললেন- "তুমি কি এরচেয়ে আরও ভালো কিছু আশা করো না?" হজরত বাররাহ ভেবে পেলেন না, এরচেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? নবিজি ও তাকে বিনা অর্থে মুক্ত করে কথা বলছেন? কিন্তু আসলেই নবিজি তাই চাচ্ছেন, নাকি ভিন্ন কিছু? নাকি স্বপ্নের সেই চাঁদ... আর অব্যা পারলেন না তিনি। এজন্য চটজলদি জিজ্ঞেস করলেন- সেটা কী ইয়া রাসুলাল্লাহ? প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- "আমি তোমার চুক্তিকৃত সকল অর্থ পরিশোধ করে দিই এবং তোমাকে বিয়ে করি।" অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব।

অবাক হয়ে গেলেন হজরত জুওয়াইরিয়া। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ কী শুনলেন তিনি? নবিজি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন? তা-ও আবার নিজেই প্রস্তাব দিলেন বিয়ের? সেই স্বপ্নে তাহলে বাস্তব সত্তা ছিল! সেই চাঁদ সত্যিই মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ.! সুবহানাল্লাহ। অত্যন্ত আনন্দিত হলেন হজরত বাররাহ। তার সুন্দর মুখমণ্ডল সীমাহীন খুশির বন্যায় চমৎকৃত হয়ে উঠল। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, এমন প্রস্তাব পাবেনা। এজন্য রাসুলের মন পরিবর্তন হওয়ার আগেই তড়িঘড়ি করে বললেন- আমি রাজি ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত বাররাহর হৃদয় থেকে কী যেন নেমে গেল। মনে হলো ভারী কোনো বস্তু তার শরীর থেকে দূরে কোথাও পালাল। অপবিত্র এক অপচ্ছায়া থেকে যেন মুক্ত হলেন তিনি। নিজেকে খুব হালকা মনে হলো তার।
একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে। কী মায়াবী তাঁর চেহারা, কী ভদ্রতা তাঁর কথায়, কী শালীনতা তাঁর আচরণে! ভালোবাসা বুনতে লাগলেন হৃদয় গহীনে। প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলেন তনমনে। কৃতজ্ঞ হলেন রবের প্রতি।

তাবাকাত ৮/১১৬। সিরাত ইবনি হিশাম ২/২৯৪। আল ইসাবা ৪/২৬৫

নবীজির বাহুডোরে

নবিজির বাহুডোরে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন হজরত বাররাহ বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা। কখন যাবেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে। এমন সময় নবীজি সাঃ ডেকে পাঠালেন শাবীতে ইবন কায়েসকে। নবিজির ডাক শুনে চটজলদি উপস্থিত হলেন কায়েস রাঃ। নিজের অর্থ থেকে চক্তিকৃত নয় উকিয়া স্বর্ণ তাকে দিয়ে দিলেন নবীজি সাঃ। আর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিলেন আম্মাজান জুওয়ারিয়া বিতুল হারিস রাঃ- কে তারপর তাকে বিয়ে করে স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদা দান করলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হজরত বাররাহর স্বপ্ন পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলো। তিনি হয়ে গেলেন সকল মুমিনের মা জুওয়াইরিয়া রাঃ। এরপর তিনি একদিন সবার সম্মুখে বললেন –

رَأَيْتُ قَبْلَ قَدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ كَأَنَّ الْقَمَرَ أَقْبَلَ يَسِيرُ مَنْ يَثْرِبَ حَتَّى وَقَعَ فِي حِجْرِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْبَرَ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سُبِينَا رَجَوْتُ الرُّؤْيَا، فَلَمَّا أَعْتَقَنِي وَتَزَوَّجَنِي وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ فِي قَوْمِي حَتَّى كَانَ الْمُسْلِمُونَ هُمُ الَّذِينَ أَرْسَلُوهُمْ وَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِجَارِيَةٍ مِنْ بَنَاتِ عَنِّي تُخْبِرَنِي الْخَبَرَ، فَحَمِدْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, ইয়াসরিবের দিক থেকে চাঁদ ছুটে এসে আমার কোলে পড়ল। কোনো মানুষকে এ কথা বলা আমি ভালো মনে করলাম না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিয়ে পৌঁছলেন। যখন আমি বন্দি হলাম, তখন আমার দেখা স্বপ্নের বাস্তব রূপ লাভের আশা করলাম। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমায় মুক্ত করে বিয়ে করলেন। আমি এ স্বপ্নের কথা আমার গোত্রের কাউকে বলিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে আগমন ঘটেছে, সে কথা আমার এক চাচাতো বোন আমাকে না বলা পর্যন্ত আমার কিছুই জানা ছিল না। অতঃপর আমি আল্লাহ তাআলার হামদ জ্ঞাপন করলাম। নবীজি সাঃ আম্মাজান জুওয়াইরিয়াকে পূর্ণরূপে মর্যাদা দিলেন। অন্য স্ত্রীদের মতো তার জন্যও কার্যকর করলেন পর্দার বিধান। নির্ধারণ করে দিলেন তার জন্যও। এক হাদিসে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে

.ال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ الحِجَات وَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুওয়াইরিয়ার ওপর পর্দার বিধান দিলেন এবং তার জন্যও দিন বরাদ্দ করলেন-যেভাবে অন্য স্ত্রীদের জন্য দিন নির্ধারণ করেছিলেন।

[আবু দাউদ, কিতাবুল ইতাক, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/২৬৩। তাবাকাত, ৮/১১৮-১১৬। সিরাতু ইবনি হিশাম: ২/২৯৪। আল ইসাবা: ৪/২৬৫। তাবাকাত, ইবনু সাআদ, হাদিস: ১৯৮২]

মোহরানা আদায়

আম্মাজান জুওয়ায়ইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বিয়েতে মোহরস্বরূপ কী পেলেন?

উম্মুল মুমিনিন হজরত জওায়ইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে চারশ দিরহাম মহরস্বরূপ পেলেন। শুধু কি তাই? এই বিয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল পুরো মদিনায়। যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের প্রায়জনের কাছে বনু মুস্তালিকের লোকেরা দাস হিসেবে ছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এক অবস্মরণীয় ভালোবাসার প্রকাশ ঘটালেন। যখনই তারা শুনলেন, নবীজি সাঃ বনু মুস্তালিকের গোত্রনেতার মেয়ে হজরত

বাররাহকে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখনই তারা নিজেদের মালিকানায় থাকা বনু মুস্তালিকের সকল নারীপুরুষকে মুক্ত করে দিলেন।

এই দেখে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলে উঠলেন –

فَلَقَدْ أُعْتِقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا

"তাকে বিয়ে করার কারণেই বনু মুস্তালিকের একশ বাড়ি মুক্ত হয়ে গেল। আমি কোনো নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য বাররাহ থেকে অধিক কল্যাণময়ী দেখিনি।"

ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে তার মুক্তির জন্য উকিয়া পরিশোধ করলেন। তারপর নিজে বিয়ে করলেন। তৎপর মোহর আদায় করলেন। এমনকি তাকে বিয়ের কারণে পুরো বনু মুস্তালিক গোত্র মুক্ত হয়ে গেল। আর এটাই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হজরত বাররাহ বিনতুল হারিসের মূল মোহর।“

ইবনু সাদ হজরত বারারাহর দেনমোহর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেন-

“বনু মুস্তালিকের প্রতিটি বন্দির মুক্তি তার মোহর হিসেবে ধার্য হয়।“

[মুনান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হাদিস: ১৩১১৮]

নাম পরিবর্তন

নাম পরিবর্তন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের মতো হজরত বাররাহর জন্যও স্বতন্ত্র ঘর নির্ধারণ করে দিলেন। এরপর নবিজি প্রবেশ করলেন সেই ঘরে। সালাম বিনিময় হলো তাঁদের মাঝে। এরপর নবিজি জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা নাম কী? আম্মাজান আনত নয়নে জবাব দিলেন- বাররাহ। নবিজি বললেন- আজ থেকে তোমার নাম জুওয়াইরিয়া। আম্মাজান এ নাম শুনে খুশি হয়ে গেলেন। সানন্দে গ্রহণ করে নিলেন এই নাম। বাপ-দাদার রাখা নামকে তিনি মুহূর্তেই মুছে ফেললেন পুরো বিশ বছরের জীবন থেকে। এখান থেকেই শুরু হলো তার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের প্রকাশ।

উম্মুল মুমিনিনের পূর্বনাম ছিল বাররাহ; পুণ্যবতী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম পাল্টে রাখলেন জুওয়াইরিয়া; জান্নাতি নারী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমগ্র জীবনজুড়ে বহুমুখী

শুদ্ধির যে সৌরভ ছড়িয়ে রেখেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো নাম পরিবর্তন। বিভিন্ন সময়ে সাহাবি ও সাহাবিয়াদের নাম পরিবর্তন করে তিনি জানিয়েছেন, ইসলামের নির্মলতার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় দিক। আল্লাহ প্রেরিত একজন সংস্কারক হিসেবে তিনি কারও নামের মধ্যে জাহিলিয়্যাতের গন্ধ পেলে কিংবা শাব্দিক ও অর্থের বিবেচনায় তা সঙ্গত না হলে তার নাম পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখতেন। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে নবিজির এই অভ্যস্ততার কথা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আম্মাজানের ঘরে

হজরত জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা এখন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ নারীদের একজন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রীদের সঙ্গে উঠাবসা তার। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন। গালগল্প করেন। দ্বীনি ইলম শেখেন। আর অপেক্ষায় থাকেন-কখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাড়িতে তাশরিফ নেবেন, কখন তার প্রিয়তম স্বামী তার ঘরে পদধূলি দিয়ে তাকে ধন্য করবেন।

একদিন সকল বেলা। সূর্য উঠেছে বেশিক্ষণ হয়নি। কেবলই শেষ হলো ফজরের নামাজ। এমনই সময় ইবাদতে মশগুল উম্মুল মুমিনিন হজরত জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা। রবের তাসবিহ-তাহলিলে আত্মনিমগ্ন হয়ে আছেন আম্মাজান। কোনোদিকে কোনো খেয়াল নেই। বিভোর হয়ে আছেন রবের আরাধনায়।

এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ নিলেন তার ঘরে। প্রবেশ করে দেখলেন, ইবাদতে মশগুল জওয়াইরিয়া। তাই কিছু না বলে চলে গেলেন নবীজি সাঃ।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপর। গনগনে রোদ-মাথায় আবার তাশরিফ নিলেন নবিজি সাঃ আম্মা জুওয়াইরিয়ার ঘরে। এবারও প্রবেশ করে দেখলেন, তাসবিহ-তাহলিলে মশগুল জুওয়াইরিয়া। নবিজি ঠাহর করলেন, ইবাদতে এগিয়ে থাকতে চাইছে জুওয়াইরিয়া। কিন্তু এত বেশি সময় ধরে ইবাদত করলে যে কষ্ট হয়ে যাবে তার, অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। তা ছাড়া ইবাদতে অনীহা চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গেলেন প্রিয়তমার দিকে। মায়াভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- জুওয়াইরিয়া! তুমি এখনো ইবাদত করছ? আম্মাজান খুব ছোট্ট করে জবাব দিলেন- জ্বী ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বুঝতে পারলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বলবেন। এজন্য কথা দীর্ঘ করলেন না এবং নবিজির কথা শোনার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতির সুরে বললেন- আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবো, যা তুমি এই দীর্ঘক্ষণ ধরে ইবাদত করার সঙ্গে তুলনা করতে পারবে? আম্মাজান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রিয়তমের দিকে। নবিজি সাঃ তার থেকে অনুমতি চাইছেন? তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন আম্মাজান জওয়াইরিয়া। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিম্নের দুআটি শেখালেন

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

"পবিত্রতা আল্লাহ্‌র এবং প্রশংসা তাঁরই, তাঁর সৃষ্টির সমসংখ্যক, তাঁর নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ অগণিত অসংখ্য"

উম্মুল মুমিনীন জুআইরিয়্যা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) ফজরের সালাতের পরে তাকে তার সালাতের স্থানে যিক্‌র-রত অবস্থায় দেখে বেরিয়ে যান। এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও সে অবস্থায় তাসবিহ তাহলীলে রত রয়েছেন। তিনি বলেন: "তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই যিক্‌রে রত রয়েছ?" তিনি বললেন: "হ্যা।" তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বললেন: "আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (উপরের বাক্যগুলো)। তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত কিছু বলেছো সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এ বাক্যগুলোর সাওয়াব একই পরিমাণ হবে।

[মুসলিমঃ ২৭২৬ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি বাক্য তিন বার করে পড়তে বললেন।]

নবীজির শেষ বিদায় ভাষণ

হিজরি নবম সনেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ডান বাহু এবং পায়ে ব্যথা পেলেন। হজ ফরজ হলো এ বছরই। হজরত আবু বকরকে হজের আমির বানিয়ে তিনশ সাহাবিকে হজে পাঠালেন তিনি। দশম হিজরিতে ৯ ও ১০ জিলহজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার ময়দানে বিদায় হজের ভাষণ দিলেন। বিদায় হজের এই ভাষণে নবিজির স্ত্রী আম্মাজান জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস-সহ সকল নবিপত্নী ও লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত হলেন।

এই ভাষণে নবিজি ইসলামের মূলনীতিগুলো খুব সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করলেন। সুস্পষ্ট করলেন ইসলাম-অনৈসলাম এবং হক-বাতিলের পার্থক্য। একপর্যায়ে নারীদের অধিকার সম্পর্কে বললেন- হে মুসলিম জনতা, নারীদের ব্যাপারে আমার অসিয়ত গ্রহণ করো। ওদের সর্বপ্রকার কল্যাণ করো। তারা তোমাদের নিকট শুধু অবস্থান করবে, এছাড়া তাদের আর কিছুর মালিক তোমরা নও। তবে হ্যাঁ, তারা যদি প্রকাশ্যে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। সামান্য প্রহার করো, যাতে শরীরের চামড়া না ফাটে। তাতে যদি তারা আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, তাহলে আর বাড়াবাড়ি করো না।
ভালোভাবে জেনে রেখো, স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন হক রয়েছে, স্ত্রীদেরও রয়েছে তোমাদের ওপর হক। স্ত্রীদের ওপর তোমাদের হক হলো, তোমাদের অপছন্দের কাউকে তোমাদের বিছানায় বসতে দেবে না, তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তোমাদের ওপর তাদের হক হলো, যথাসাধ্য তাদের উত্তম ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে এমন এক সারগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা দিলেন, ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই।

লক্ষণীয় বিষয় দাম্পত্যজীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও সংহতি সৃষ্টির লক্ষ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত চমৎকার নির্দেশনা দিয়েছেন। নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। উভয়ে যদি সমমর্যাদা ও সমক্ষমতার অধিকারী হতো, তাহলে দাম্পত্যজীবনে নির্ঘাত বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভাষণের পর ইসলামে দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেল। আম্মাজান জুওয়াইরিয়া-সহ অন্য সকল উম্মুল মুমিনিন নবিজির সঙ্গে হজব্রত পূর্ণ করলেন। এরপর ফিরে চললেন মদিনায়। উম্মতকে নবিজির আল-বিদা বলার সময় ঘনিয়ে এলো। কারণ, আরাফার ময়দানে বিদায় হজের ভাষণের শুরুতেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –

"হে লোক সকল ভবিষ্যতে হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না"

এরপর সফর মাসের মধ্যভাগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সাহাবিগণ অশ্রু ভেজা চোখে এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে নবিজির অসুস্থতার পরিণতি সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর ঘরের চারপাশে সমবেত হতে লাগলেন। এরপর এলেন নবিজির পবিত্র পত্নীগণ। কথা হলো আম্মা জুওয়াইররিয়া-সহ সকলের সঙ্গে। কেঁদে উঠলেন তারা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে খণ্ডানোর নয়। এরপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ৮৩ দিন পর ৬৩ বছর বয়সে এগারো হিজরির রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ সোমবার দ্বিপ্রহরে আম্মা আয়েশার কোলে মাথা রেখে রবের ডাকে দুনিয়া ছেড়ে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

[সহিহ বুখারি, সহিহুল মুসলিম, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আত তাবাকাতুল কুবরা।]

হাদিসের শিক্ষা

হাদিসের দরস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের কথা মনে পড়ে উম্মুল মুমিনিন জুওয়াইরিয়ার। তিনি সেই সুখ স্মৃতিগুলো আজীবন রেখে দিতে চান। এজন্য তিনিও অন্য স্ত্রীদের মতো নবিজির সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর পাঠদানে অগ্রসর হলেন। একদা তিনি তার দরসে বললেন

أن النبي كان يكره أن يأكل الطعام حتى يذهب فورة دخانه

"নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবার খেতে অপছন্দ করতেন, যতক্ষণ না তার ধোঁয়া চলে যায়। কারণ, ধোঁয়া আগুনের মতোই। আর আগুন জাহান্নামিদের জন্য। তাতে কোনো ফায়দা নেই।"

এ ব্যাপারে নবিজি বলেন

.أبردوا بالطعام، فإن الحار لا بركة فيه

"তোমরা খাবার ঠান্ডা করে খাও। কারণ, আগুনে কোনো বারাকা নেই।"

[বায়হারি, হাদিস: ১৯র। আদ বাইহা, ১/৭৬৮]

আম্মাজান জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করলেন; রোজা রাখার বিষয়ে হাদিস: রোজা রাখার জন্য শুক্রবার এককভাবে না করা, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা সংক্রান্ত হাদিস এবং সাদকার সম্পদ থেকে নবিজিকে উপহার দেওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত হাদিস, দাসমুক্তির হাদিস।

তার দরসে উপস্থিত ছিলেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সাহাবিগণ। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, উবাইদ ইবনু সাব্বাক, তুফাইল, আবু আইয়ুব আতাকি, মুজাহিদ, কুরাইব মাওলা ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনিল হাদ এবং আম্মাজানের ভাতিজা তফাইল ও চাচা কুলসুম ইবন আমরসহ আরও অনেকেই। তাদের প্রত্যেকেই আম্মাজানের মুখনিসৃত রাসুলের স্মৃতিগুলো সংরক্ষণ করলেন। তন্মধ্যে কেবল সাতটি হাদিস আমাদের কাছে পৌঁছছে। সেখান থেকে ইমাম বুখারি একটি ও মসলিম দুইটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এভাবেই সাতটি মহৎ হাদিস দিয়ে বিশ্বাসীদের মা জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস বাদিয়াল্লাহু আনহা ইতিহাসে এবং মুসলিমদের হৃদয় জগতে তার নাম ও নবিজি সাঃ এর স্মৃতি চিরভাস্মর করে রাখলেন। তিনি জাতিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে অবহিত করলেন।

[মারিফাতুস সাহাবা, আবু নুআইম, ৬/৩২২৯। তালকিহুল ফাহুম, ইবনুল জাওজি, পৃষ্ঠা হাওয়ামিউস সিরাহ, ইবনে হাজাম, পৃষ্ঠা: ১৪৩]

চিরবিদায়

ইন্তেকাল দিন, মাস আর বছর পেরিয়ে ঘনিয়ে এলো মৃত্যুক্ষণ। তখন হিজরি ৫৬ সন। খিলাফতের মসনদে সমাসীন মুআবিয়া ইবন আবি সফিয়ান। মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবনু আবিল হাকাম ইবনু আবিল আস ইবন উমাইয়া। এই মহীয়সী আম্মাজান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের চল্লিশ বছর পর ৬৫ বছর বয়সে রবিউল আওয়াল মাসে মদিনায় ইন্তিকাল করলেন। যে রবিউল আওয়ালেই ইন্তিকাল করেছিলেন আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উম্মুল মুনিনিন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহার জানাজা পড়ালেন গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তার জীবনের সর্বশেষ নীড় নির্ধারিত হলো জান্নাতুল বাকি। আল্লাহ তাআলা তার বর্ণীল জীবনী থেকে আমাদের প্রত্যেককে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

[মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা, হাদিস: ৩২৮৬৬। হায়াতু উমর ইবনুল খাত্তাব মুখতাসারা]

আম্মজান জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্দারকন্যা হলেও তিনি ছিলেন অতীব বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লজ্জাশীলা এক পবিত্র নারী। তার আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রবল। কিন্তু কোনো গর্ব-অহংকার তার মাঝে ছিল না। কোনো দোষত্রুটি তার নির্মল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। তিনি তার অবসরে ইবাদতেই মশগুল থাকতেন। রাসুলের সকল আদেশকে শিরোধার্য করে তার যথাসাধ্য অনুসরণ করতেন। এককথায় তিনি ছিলেন রাসুলের জন্য একান্ত নিবেদিতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মহীয়সীর জীবনী থেকে ইবরাত হাসিল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফইয়ান উমাবিয়্যা রাঃ

অতীব নিষ্কলুষ ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী অতি সুদর্শনা উম্মু হাবীবা (রাঃ)ও ছিলেন ইসলামী আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক মহিয়সী মহিলা। মক্কার কুরাইশ বংশের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা আবু সুফিয়ানের বিত্ত-বৈভব ও সামাজিক উচ্চ মর্যাদা, প্রতিপত্তি উম্মু হাবীবাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। বরং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে দ্বীন-ঈমান রক্ষার খাতিরে দেশ ত্যাগের সীমাহীন কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন তিনি। বিদেশ-বিভূঁইয়ে গিয়ে জীবনের সর্বাধিক প্রিয় মানুষ, জীবনের একমাত্র অবলম্বন প্রথম স্বামী দ্বীন ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে গেলেও উম্মু হাবীবা (রাঃ) ছিলেন ইসলামের উপর অটল ও অবিচল। জীবনের এই কঠিনতম মুহূর্তেও তিনি আদর্শচ্যুত হননি, বিচ্যুত হননি ইসলামের আলোকময় পথ থেকে। তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি পার্থিব কোন আকর্ষণ, কোন মায়াজাল।

নাম ও বংশ পরিচয়

উম্মু হাবীবা রাঃ এর প্রকৃত নাম রামলাহ মতান্তরে হিন্দ। তবে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতে তাঁর নাম রামলাহ। কুনিয়াত বা উপনাম উম্মু হাবীবা। পূর্ণ বংশ পরিচিতি হচ্ছে রামলাহ বিনতু আবী সুফিয়ান ছাখার ইবনে হারব ইবনে উমাইয়াহ ইবনে আব্দে শাম্স ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই। তাঁর মাতার নাম সাফিয়া বিনতু আবীল 'আছ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে আব্দে শাম্স। যিনি ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর ফুফু ছিলেন। কারো মতে উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর মাতার নাম আমিনা বিনতু আব্দিল উযযা ইবনে হিরবান ইবনে আওফ ইবনে ওবায়দ ইবনে 'আবীজ ইবনে আদী ইবনে কা'ব।

জন্ম ও শৈশব

উম্মু হাবীবা (রাঃ) নবুওয়াতের ১৭ বছর পূর্বে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
আমুল ফিলের বছর ত্রিশেক পরের কথা। উমাইয়াদের নেতৃত্বের কাছে হাশিমিরা তখন কোণঠাসা অবস্থায়। মক্কার নেতা হারব ইবনু উমাইয়ার ছেলে আবু সুফিয়ান সাখার তখন যুবনেতা। অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে সবাইকে ছাড়িয়ে একক প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন মক্কাজুড়ে। তিনি বিয়ে করেছিলেন চাচাতো বোন সাফিয়া বিনতে আবিল আস ইবনু উমাইয়াকে। সাফিয়া প্রচণ্ড স্বামীভক্ত রমণী। ভালোবাসায় পূর্ণ দিয়েছেন স্বামীর হৃদয় জগৎকে। বিশাল পৃথিবীর মাঝে গড়ে তুলেছেন প্রেমময় আরেক পৃথিবী। বিশ্বজগৎকে আলোকিত করেছেন প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে। আবু সুফিয়ান সাখার ইবনুল হারব।

একদিন খবর পেলেন একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছে তার স্ত্রী সাফিয়া। তৎকালীন আরবে কন্যসন্তানের কোনো মূল্য ছিল না। তাই খুশি হতে পারলেন না একটুও। তারপরও যেতে হবে কন্যার মুখ দর্শনে। না হলে ইজ্জত থাকবে না। এরা আরবের লোক। এদের কাছে মানবতার চেয়ে লৌকিকতাই বেশি মূল্যবান। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব তাদেরই একজন, যারা লৌকিকতার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। তাই মনের কষ্ট মনে চেপে কন্যা

দর্শনে ঘরে পৌঁছল যুবনেতা আবু সুফিয়ান। ঘরে কয়েকজন নারী। সোজা ভেতরে গেলেন আবু সুফিয়ান, যেখানে তার স্ত্রী সাফিয়া নবজাতক কন্যা নিয়ে বসা।

ভেতরে প্রবেশ করেই ভাবনা পালটে গেল তার। অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন নবজাতক কন্যাসন্তানের প্রতি। বেদনা ছেড়ে ডুবে রইলেন আনন্দে।

স্বামীর চেহারায় খুশির আভা প্রত্যক্ষ করে আনন্দে নেচে উঠল বিবি সাফিয়া। আবু সুফিয়ান বলল-আমার মন বলছে, আমাদের নবজাতক আত্মজা অনেক বরকতময় হবে। বিবি সাফিয়া উত্তর দিলেন হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। আবু সুফিয়ান খুব গভীরভাবে খেয়াল করে দেখলেন, তার চেহারায় চমকাচ্ছে আশ্চর্য রকমের আলো। সে বুঝতে পারল, এ বাচ্চা হবে পুরো বংশের জন্য রহমত। বাবা আবু সুফিয়ান এই কন্যার নাম রাখল রামলা। এই কন্যাই হয়ে উঠল বাবা-মায়ের চোখের তারা। তাঁর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

[উম্মাহাতুল মুমিনিন: ২৪৪ সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৫০১ আসিয়া বিনতে মজাহিম ইবন উবাইদ ইবন রাইয়ান ইবন ওয়ালিদ। [তারিখে তাবারি: ১/৩৮৬। আত-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সাদ: ৮/৭৬: মসতাদরাকে হাকিম: ৪/২২]

সৌন্দর্যের মাধুর্য

রামলা বিনতে আবি সুফিয়ান ছিল অপরূপা সুদর্শনা। প্রভাবশালী পিতা স্বীয় কন্যার রূপ নিয়ে গর্ব করে বেড়াতেন। তিনি মানুষের কাছে বলতেন

عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ

"আমার নিকট আরবের সবচেয়ে উত্তম ও সর্বাধিক সুন্দরী রমণী আছে। সে হলো উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান।"

উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবি সুফিয়ান যেমন ছিলেন সুশ্রী, তেমন ছিলেন নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং খুব নম্র-ভদ্র স্বভাবের মহিলা। সরলতা ও কোমলতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ ছিল তার মাঝে সব সময়।

‘

১ম বিবাহ ও ইসলাম গ্রহণ

রূপযৌবনে অনন্য রামলা দিন দিন বড় হচ্ছে। মক্কায় তার অনুরাগীর অভাব নেই। যে যেখানে দেখে, সবাই মুগ্ধ হয়ে যায় তার রূপের ঝলক দেখে। আকর্ষিত হয় তার গুণের কথা শুনে। এছাড়া বংশীয় মর্যাদা, পিতার প্রভাব ও ভাইদের ক্ষমতার দাপট তো আছেই। সবমিলিয়ে রামলা হয়ে ওঠে আরবের শ্রেষ্ঠ যুবতিদের একজন।

পবিত্র স্বভাবের রামলা এসবের প্রতি চোখ দেওয়ার সময় নেই তার। সবসময় ভাবেন অন্যকিছু। জাহিলি আরবের অপবিত্র অনেক বিষয় পছন্দ নয় তার। বিশেষ করে মাটির তৈরি দেবদেবীর পূজার প্রতি বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ নেই তার। আবু সুফিয়ানের চিন্তা বেড়ে যায়। কারণ, অপরূপা সুন্দরী কন্যা রামলা দিন দিন বড় হচ্ছে। বিয়ে দিতে হবে তাকে।

তৎকালীন আরবে হাতেগোনা কয়েকজন লোককে প্রভাবশালী মনে করা হতো। উরওয়া ইবনু মাসউদ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ব্যক্তিত্ববান লোক ছিলেন বলে ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি কুরাইশের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে প্রেরিত হন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উরওয়া ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে বলেন, হজরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত –

নবিজি বলেন –

عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود

“একদা আমার নিকট নবিগণকে পেশ করা হলো। ঈসা ইবনু মারইয়ামকে দেখলাম, আমার দেখার মধ্যে সাদৃশ্যে তার সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিল উরওয়া ইবনু মাসউদ।“

[সহি বুখারি: ১৬৭]

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর তিনি কুরাইশের কাছে কাছে ফিরে গিয়ে এই অনুভূতি পেশ করেন

مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنِّي قَدْ جِئْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ، وَقَيْصَرَ فِي مُلْكِهِ، وَالنَّجَاشِيَّ فِي لكِهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا فِي قَوْمٍ قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا، فَرَوْا رَأْيَكُمْ .

হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি অনেক রাজা-বাদশাহর কাছে প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছি। কিসরার দেশে গিয়েছি। কায়সারের দেশে গিয়েছি। গিয়েছি নাজাশির কাছেও। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সঙ্গীরা যেভাবে ভক্তি করে সেভাবে আমি আর কাউকে তাদের বাদশাহকে ভক্তি করতে দেখিনি।

[সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩১৩]

তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রের নেতা উরওয়া ইবনু মাসউদের ছেলে উবাইদুল্লাহ এর সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে পারায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করত আবু সুফিয়ান। এ নিয়ে তার তার গর্বের শেষ ছিল না। উবাইদুল্লাহ ছিলেন প্রিয় নবী সাঃ এর ফুফু উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহাশ ছিলেন হারব ইবনু উমাইয়ার মিত্র। বিবাহের পর ইসলামের প্রাথমিক দিকে উম্মে হাবিবা ও উবাইদুল্লাহ দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

[উসদল গাবাহহ: ৪/৩০]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। ফুফু উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ, আবু আহমদ ও উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহাশ তিন ভাইয়ের মধ্যে আবদুল্লাহ ও আবু আহমদ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। আর উবাইদুল্লাহ সত্যদ্বীন তালাশ করতে গিয়ে ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছিলেন খ্রিষ্টধর্ম। তবে এখন দোদুল্যমান অবস্থায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

একদা প্রিয় নবী সাঃ বসা ছিলেন সাহাবিদের মজলিসে উবাইদুল্লাহ ও রামলা যুগলকে আসতে দেখে নুরানি আভা ভেসে উঠল তাঁদের চেহারায়। রাস্তা করে দিলেন সবাই। উভয়ে গিয়ে বসলেন নবিজির পায়ের কাছে। তিনি বললেন - কেন এসেছ? হে আল্লাহর রাসুল! আপনার দ্বীনে দীক্ষিত করলে কৃতজ্ঞ হব। কার কন্যা তুমি? আমি আবু সুফিয়ানের কন্যা। তাহলে... আপনার নবুওয়াতের কথা শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

অতঃপর স্বামী-স্ত্রী পড়ে নিলেন বিশ্বাসের কালিমা। কালিমায়ে শাহাদত পড়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলেন তারা। তখন খুশির অন্ত ছিল না উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লায় তাআলা আনহুমের।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন।"

[সূরা আলে-ইমরান: ৩:১৯]

হিজরত ও প্রথম স্বামীর ইন্তেকাল

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে চরমে পৌঁছে গেল সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার ও অবর্ণনীয় নির্যাতন। তখন মক্কায় অবস্থান করা অনেকটা অসম্ভব হয়ে উঠল মুসলিমদের জন্য। সেই সংকটময় ও অন্ধকার সময়ে নাজিল হলো পবিত্র কুরআনের সুরা কাহাফ। এতে মুমিনদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আসহাবে কাহাফের ঘটনায় রয়েছে সুস্পষ্ট শিক্ষা-

দ্বীন ও ঈমান যখন আশঙ্কার সম্মুখীন হয় তখন কুফরি ও জুলুম-অত্যাচারের কেন্দ্র থেকে হিজরত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا

"তোমরা যখন ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যান ইবাদত করে তাদের কাছ থেকে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো, তোমাদে প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।"

[সূরা কাহাফ: ১৮:১৬]

মক্কার সার যমীনে যখন মুসলমানদের বসবাস কঠিন হয়ে পড়ে তখন উম্মু হাবীবা ও তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ অন্যান্য মুসলমানদের সাথে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে সুদূর হাবাশায় (আবিসিনিয়ায়) বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। কিন্তু এ হিজরত উম্মু হাবীবা রাঃ-এর জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। দ্বীনের খাতিরে স্বজন ও জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে তাঁর জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। হিজরত তাঁর জন্য বয়ে নিয়ে আসল দুঃখ-বেদনার অথৈ সাগর। হিজরতের ফলে আবু জাহলের নির্মম অত্যাচার থেকে মুক্তি পেলেও দাম্পত্য জীবনে নেমে এল এক অসহনীয় বিপর্যয়।

দুর্বল চিত্তের লোক স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ দ্বীনের জন্য এত তাকলীফ স্বীকার করতে অপ্রস্তুত হয়ে খৃষ্টান ধর্মে ফিরে যেতে উদ্ধত হন। যেজন জীবনের সবচেয়ে আপন, সার্বক্ষণিক সঙ্গী সে স্বামী দ্বীন-ধর্ম ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়। উম্মু হাবীবা রাঃ বলেন –

"একদা স্বপ্নে আমি আমার স্বামী ওবায়দুল্লাহকে বিকৃত চেহারায় বিভৎস অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে গেলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সকালে সে আমাকে বলল, আমি বিভিন্ন ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম পাইনি। আমি ঐ ধর্মে ছিলাম। অতঃপর মুহাম্মাদের ধর্মে প্রবেশ করি। আমি পুনরায় পূর্বের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করছি।"

উম্মু হাবীবা রাঃ তখন তার স্বপ্নের কথা স্বামীকে বললেন। তিনি স্বামীকে বুঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে শুনল না। মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে মদ্যপান করতে লাগল। ওবায়দুল্লাহ ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্ত্রী উম্মু হাবীবাকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য চাপ দিতে থাকে।

কিন্তু উম্মু হাবীবার পর্বতসম ঈমানের কাছে তার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। আল্লাহর পথে দ্বীনে হক্কের উপরে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকেন উম্মু হাবিবা। স্ত্রীর কাছে নিজের আদর্শিক ব্যর্থতা ও পরাজয়ের আঘাত ওবায়দুল্লাহর মনে বিশেষভাবে নাড়া দিচ্ছিল। সে কল্পনাও করেনি যে বিদেশ বিভূঁইয়ে একজন সাধারণ মহিলা স্বামীর আদেশ উপেক্ষা করতে সাহস করবে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাগলপরা ও দ্বীনে হক্কের জন্য নিবেদিতা উম্মু হাবীবা (রাঃ) সে সাহস প্রদর্শন করলেন। স্বামীর জন্য ইসলামের শাশ্বত আদর্শ ত্যাগ করতে রাজি হ'লেন না। ওবায়দুল্লাহ এর প্রতিশোধ হিসাবে স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে সরে গেলেন। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা উম্মু হাবীবা (রাঃ) অনুভব করলেও ভেঙে পড়লেন না।

আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও দ্বীনে হক্কের প্রতি অবিচলতা, ইসলামের শাশ্বত আদর্শের জন্য নিবেদিতা উম্মু হাবীবা রাঃ তাই স্বামীর প্রেম-ভালবাসা উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ভালবাসা তাকে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ থেকে, সত্যপথ থেকে একটুও সরাতে পারেনি, টলাতে পারেনি। উম্মু হাবীবা (রাঃ) কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, প্রয়োজন বোধে দ্বীনে হক্কের জন্য স্বামীর ভালবাসা ও স্বজনের সুতীব্র আকর্ষণও কুরবানী দিতে হয়। উম্মু হাবীবার ১ম স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ আবিসিনিয়ায় খৃষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

নবীজির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

উম্মু হাবীবা (রাঃ) ৬ষ্ঠ মতান্তরে ৭ম হিজরীতে আবিসিনিয়ায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের মৃত্যুর পর একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক আগন্তুক এসে আমাকে বলছে, হে উম্মুল মুমিনীন! এতে আমি শঙ্কিত হ'লাম। আর আমি মনে মনে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে বিবাহ করবেন।

অতঃপর আমার ইদ্দতকাল সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি দেখলাম, বাদশাহ নাজ্জাশীর দূত আমার দরজায় দন্ডায়মান। সে আমার গৃহে প্রবেশের জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছে। দূত হিসাবে আবরাহা নাম্নী এক দাসী স্বীয় পরিচ্ছদে আমার নিকটে এসেছে। সে আমাকে বলল, বাদশাহ আমাকে একথা বলে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ আপনাকে বিবাহ করার জন্য পত্র পাঠিয়েছেন। অন্য বর্ণনায়আছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমর ইবনু উমাইয়াকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠান উম্মু হাবীবাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে।

তখন আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে উত্তম জিনিস দ্বারা সুসংবাদ দান করুন। আবরাহা বলল, বাদশাহ আপনাকে বিবাহের অলী (অভিভাবক) নিযুক্ত করে পাঠাতে বলেছেন। তখন আমি খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনিল আছকে অলী নিযুক্ত করে পাঠালাম। এই সুসংবাদ প্রদানের জন্য তিনি বাদী আবরাহাকে রুপার দু'টি চুরি এবং একটি আংটি উপহার দেন।

উল্লেখ্য, খালিদ ইবনু সাঈদ ছিলেন উম্মু হাবীবার পিতা আবু সুফিয়ানের চাচাত ভাই। সন্ধ্যায় বাদশাহ নাজ্জাশী জা'ফর ইবনু আবী তালেব ও অন্যান্য মুসলমানদের ডেকে রাসূল সাঃ-এর সাথে উম্মু হাবীবা রাঃ-এর বিবাহ পড়িয়ে দেন। তিনি রাসূলে করীম সাঃ - এর পক্ষ থেকে উম্মু হাবীবাকে ৪০০ দীনার মতান্তরে ৪ হাযার দেরহাম মহর প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে ওলীমার দাওয়াত দেন এবং খাদ্য খাওয়ান। উম্মু হাবীবার নিকট মহরের সম্পদ আসলে তা থেকে ৫০ মিছকাল তিনি আবরাহা বাদীকে প্রদান করেন, যে তাঁকে বিবাহের সুসংবাদ প্রদান করেছিল। বাদী তা নিতে অস্বীকার করলে উম্মু হাবীবা রাঃ বলেন, আমার কাছে কোন সম্পদ নেই, আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তুমি এটা গ্রহণ করো।

তখন আবরাহা বলল, বাদশাহ এ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। আর আমি তাঁর অন্ন-বস্ত্রে জীবন যাপন করছি। তাছাড়া আমি মুহাম্মাদ সাঃ-এর দ্বীনের অনুসরণ করছি এবং আমি আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। সুতরাং আপনার নিকট আমার অনুরোধ আপনি রাসূলের নিকট পৌঁছে আমার সালাম

দিবেন এবং তাঁকে অবহিত করবেন যে, আমি তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করছি। এ কথা বলে সে ঐ মাল ফেরৎ দিল।

অতঃপর সে আমার প্রতি আরো বন্ধুভাবাপন্ন হ’ল। সে-ই আমাকে সফরের জন্য প্রস্ত্তত করে দিল। এরপর সে যখনই আমার নিকট আসতো, তখন বলতো, আপনার নিকট আমার প্রয়োজন ভুলে যাবেন না। উম্মু হাবীবা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নিকটে এসে আবরাহার কথা বললে তিনি মুচকি হাসলেন এবং সালামের উত্তরে বললেন, ‘ওয়া আলাইহাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’। বাদশাহ নাজ্জাশী বিবাহের পর উম্মু হাবীবাকে প্রস্তুত করার জন্য স্বীয় স্ত্রীদের নির্দেশ দেন। তারা কনের প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জা, সুগন্ধি ও অনেক মাখন নিয়ে আসে। উম্মু হাবীবা সেসব রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর জন্য মদীনায় নিয়ে আসেন।[১৪] বাদশাহ নাজ্জাশী নিজেই উম্মু হাবীবা (রাঃ)-কে মদীনায় প্রেরণের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন এবং তাঁকে শুরাহবিল ইবনু হাসনার সাথে প্রেরণ করেন।

উম্মু হাবীবা (রাঃ) যখন মদীনায় আসেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছরের কিছু বেশী। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাঃ -এর চাচাত বোন। রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাসূলের বংশের অতি নিকটবর্তী। রাসূল সাঃ -এর স্ত্রীদের মধ্য উম্মু হাবীবা রা)-কে সর্বাধিক মহর প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁকে রাসূল বিবাহ করেছেন যখন তিনি রাসূলের নিকট থেকে অনেক দূরে ছিলেন। আবিসিনিয়ায় উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর স্বামী ধর্মান্তরিত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করলে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন।

তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান মক্কার প্রভাবশালী কুরাইশ নেতা এবং সে তখন কাফির। সে ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কঠিনতম শত্রু। আর উম্মু হাবীবা রাঃ মুসলিম। এমতাবস্থায় মক্কায় তাঁর পরিবারের নিকটে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। আবার ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের চেয়ে ভাল ও উম্মু হাবীবার জন্য উপযুক্ত কাউকে না পাওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাঃ তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান ও বিবাহ করেন।

ইবাদত বন্দেগী ও সুন্নতের অনুসরণ

উম্মু হাবীবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর বাণী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং সাধ্যানুযায়ী নিজের জীবনে সেগুলো পালন করতেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার ইন্তিকালের তিন দিন পরে উম্মু হাবীবা রাঃ খশবু চেয়ে নিয়ে লাগালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর নির্দেশ মুমিন মহিলার জন্য তিন দিনের বেশী কারো জন্য শোক পালন করা জায়েয নয়। শুধু স্বামীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন উম্মু হাবীবা রাঃ অতি ইবাদতগুযার ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন –

‘যে ব্যক্তি প্রতি দিন ১২ রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হবে’। উম্মু হাবীবা এক থা শুনেছিলেন। এরপর সারাজীবন নিয়মিত প্রতিদিন তিনি ১২ রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করতেন।

[সহি বুখারি: ৫৩৪৫]

ইলমি খেদমত

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইলমি খিদমত এবং তার থেকে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদিস প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথা উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা বাদিয়াল্লাহু আনহা আত্মস্থ করতেন। বিবরণ দিতেন তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তির। এভাবে গড়ে উঠত ইসলামি শরিয়তচর্চার এক আলোকিত পৃথিবী। তিনি এক্ষেত্রে ছিলেন নিরলস প্রতিযোগিনী। ইলমে হাদিসে উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মুল মুমিনিন জায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করেন। তার সনদে হাদিস বর্ণনাকারীদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের মধ্যে সাহাবি ও সাহাবিয়া যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন অনেক প্রথিতযশা তাবিয়িনও। তার নিকট থেকে স্বীয় কন্যা হাবিবা, ভাই মুআবিয়া, উতবা, ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু আবি সুফিয়ান, ভাগ্নে আবু সুফিয়ান ইবনু সাইদ ইবনুল মুগিরা ইবনুল আখনাস আস-সাকাফি, তাঁর গোলাম সালিম ইবনু শাওয়াল, ইবনুল জাররাহ, সাফিয়া বিনতু শাইবা, জায়নাব বিনতে উম্মে সালমা, উরওয়া ইবনুজ জুবাইর, আবু সালিহ আস-সিমান, শুতাইর ইবনু শাকাল, আবুল মালিহ আমির আল-হুজালি প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করেন।

উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস সংখ্যা মোট ৬৫টি। এর মধ্যে মুত্তাফাকুন আলাইহি দুটি। ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন একটি হাদিস। আর বাকি ৬২টি হাদিস হাদিসের অন্যান্য কিতাবে স্থান পেয়েছে।

[আল-ইসাবা: ৪/৮৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১৯ সিয়ারু আলামিন নবালা: ২/২১৯]

হজরত উম্মে হাবিবা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি প্রিয়নবি সা.কে বলতে শুনেছি –

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّ لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ قَالَتْ أَمْ حَبِيبَةً: فَمَا بَرِحْتُ أَصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرُو مَا بَرِحْتُ أَصَلِّيهِنَّ بَعْدُ، وَقَالَ النَّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

"যেকোনো মুসলিম বান্দা আল্লাহ তাআলার জন্য দৈনিক ফরজ ব্যতীত **১২** রাকাত নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন (অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন) জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে। হজরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর থেকে আমি এই নামাজ নিয়মিত আদায় করে আসছি। বর্ণনাকারী আমর রহ. বলেন, এরপর থেকে আমিও এই নামাজ নিয়মিত আদায় করে আসছি। নুমান রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন।"

সহি বুখারি : ৭২৮

চিরবিদায়

উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহাতে অপেক্ষা করতে হয় সুদীর্ঘকাল। ৭৩ বছর বয়সে বুঝতে পারলেন, মহামিলনের সময় সন্নিকটবর্তী। পেছনে দৃষ্টিপাত করলেন ক্ষণকালের জন্য। একদিন বাক্ষে সমর্পিত হয়েছিলেন মহাসৃষ্টির সুন্দরতম পুরুষের। মহাবিদায়ের পূর্ব মুহর্তে উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা ডেকে পাঠালেন হজরত আয়েশা বিনতে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহাকে।

তাঁকে বললেন –

إنه قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك.

"আমাদের মাঝে সতীনের সম্পর্ক ছিল। আমাদের কোনো ভুলত্রুটি হলে আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে (আমাদের সবাইকে) ক্ষমা করে দিন। অর্থাৎ আপনিও আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

তখন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন-

غفر الله ذلك كله، وتجاوز عنه، وحللك منه.

"আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, ওসব মুছে দিয়েছেন এবং আপনাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।"

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তরে বললেন-

سرتني، سترك الله.

"আপনি আমাকে খুশি করেছেন। আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন"

এরপর উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা উম্মুল মমিনিন হজরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহ আনহার নিকটও অনুরূপ বার্তা পাঠান। উম্মে সালামাও এমন অভিন্ন কথা বলেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ভাই হজরত মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ৪২ মতান্তরে ৪৪ হিজরিতে ৭৩ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। চলে গেলেন শেষ উম্মতের মমতাময়ী মা জননী। গোসল শেষে জানাজা প্রস্তুত করা হলো। জানাজার নামাজ পড়ালেন মদিনার প্রশাসক মারওয়ান। তাঁকে কবরে নামালেন তাঁর ভাই ও বোনের ছেলেরা।

[সিয়ারু আলামিন নবালা: ২/২২৩: আনসাবল আশরাফ: ১/৪৪০]

পৃথিবী যতদিন স্থির থাকবে, ততদিন কিছু নামও ইতিহাসের সোনালি আকাশে ভেলে বেড়াবে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে। উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন এদেরই অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

ইতিহাসের আকাশে অন্তহীন আলো ছড়ানো এক নাম। ধৈর্যের উপমা। উত্তম গুণাবলি ধারণকারী সার্থক ও সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারিণী।

উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা বিনতে রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মুসলিম কন্যা-জায়া জননীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবিচলতার অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন, তা সকলের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়।

এই মহিয়সী মহিলার জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের মাতা-ভগ্নিগণ নিজেদেরকে আদর্শ রমনী হিসাবে তৈরী করলে সমাজে দেড় হাযার বছর পূর্বের সেই সোনালী যুগের শান্তি-সুখ ফিরে আসবে। আমাদের উচিত উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার
সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন। আমিন।

সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই নাজিরিয়্যা রাঃ

উম্মুল মুমিনিন সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান সাফিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন –

তোমার বংশীয় পিতা হারুন আলাইহিস সালাম একজন নবি, তোমার চাচা মুসা আলাইহিস সালাম একজন নবি; এমনকি তোমার স্বামী শেষ-নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন নবি। তাহলে কীসে তারা (অন্যান্য পত্নীগণ) তোমার চেয়ে সেরা?

[তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৪. মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ১২৪১৫. সুনানে কবরা, বায়হাকি, হাদিস: ৮৯১৯]

উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনিনের অন্যতম একজন। তিনি বাল্যাবধি অত্যন্ত ধীরস্থির প্রকৃতির নারী ছিলেন। শৈশব ও কৈশোরে সমবয়সীদের সঙ্গে অত্যন্ত মধুর আচরণ করতেন। প্রভাবশালী সর্দার দুহিতা বলে তিনি দাসদাসীর সঙ্গে কঠোর আচরণ তো দূরের কথা, সামান্য কোনো কর্কশ কথা পর্যন্ত বলতেন না।

আম্মাজান সাফিয়া রাঃ দীর্ঘকায় ছিলেন না, আবার একেবারে বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ছিলেন পরম সুন্দরী একজন নারী। এজন্যই তার সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেল মদিনার নারীরা। লোকমুখে চর্চা হতে থাকল তার নানা গুণকীর্তন। এমনকি অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনও হজরত সাফিয়াকে দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না। উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বহুগুণের অধিকারী একজন নারী ছিলেন। তার নানাবিধ গুণের মধ্যে উত্তম রান্না ছিল অন্যতম।

জন্ম ও বংশ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবে মাত্র নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন। মাত্র দুবছর হলো একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। ইসলামগ্রহণ করেছেন হজরত খাদিজা রাঃ। ইহুদি রাহেব ওয়ারাকা ইবনে নওফেল নবিজি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। হজরত আবু বকর, হজরত আলি ও হজরত জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম দীক্ষিত হয়েছেন ইসলামে। আরও কিছু সম্ভ্রান্ত কুরাইশ প্রবেশ করেছেন ইসলামের সশীতল ছায়ায়।

ঠিক এমন সময় মদিনার বনু নাজিরের গোত্রপ্রধান হুওয়াই ইবন আখতাবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেন ফুটফুটে এক সন্তান। মা াররা বিনতে সামওয়ালের কোল আলোকিত করলেন মদিনার দহিতা। আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল সকলের মাঝে। মা-বাবা খুশি হয়ে নাম রাখলেন জয়নাব: সুগন্ধি ফুল। সেই থেকে তিনি সুগন্ধার মতো ঘ্রাণ ছড়াতে লাগলেন পুরো পরিবারে। বেড়ে উঠতে লাগলেন ইহুদি জাতির রীতিনীতিতে।

হজরত জয়নাবের পিতা ও মাতৃবংশ যথাক্রমে বনু নাজির ও বনু কুরাইজা প্রাচীনকাল থেকেই আরবের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা। যে কারণে তারা অন্যান্য আরবীয় ইহুদি বংশের চেয়ে অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তার পিতা হুওয়াই ইবনু আখতাব গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং সর্বজন সম্মানিত ও মান্যবর। অপরদিকে তার নানা সামওয়ালও সমগ্র আরব উপদ্বীপে বীরত্ব ও সাহসিকতায় একজন প্রসিদ্ধ সর্দার। ফলে বেশ আদরে আহ্লাদেই বড় হতে থাকলেন হজরত জয়নাব।

আল মুস্তাদরাক, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা : ৩০

প্রথম বিয়ে

দেখতে দেখতে হুওয়াই ইবনু আখতাব এর মেয়ে জয়নাব বাড়ন্ত বয়সে পা ফেললেন। পিতা হিসেবে জয়নাবের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন হুওয়াই, তার বয়স তখন চৌদ্দ। তিনি ভাবতে লাগলেন এটিই বিয়ের উপযুক্ত বয়স। এজন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করতে থাকে পিতা হুওয়াই ইবনু আখতাব।

ইহুদিদের ভেতর হজরত জয়নাবের পরিবারে ছিল আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যেরই ছোঁয়া। সম্পদের প্রাচুর্যও ছিল প্রচুর। সেই শালীন ও কৌলিন্য পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে, হজরত জয়নাব তার মানসিক ক্ষমতাকে সুষ্ঠুভাবে বিকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি সহজেই সক্ষম হয়েছেন ভালোমন্দ ও হক-বাতিলের পার্থক্যের পাঠ গ্রহণে।

তার পরিবার উচ্চ বংশীয় ও নববি পরিবার হওয়ার কারণে নবিদের মৌলিক শিক্ষা-তাওহিদ-রিসালাত সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত হতে পেরেছেন। কুদরতে ইলাহি তাকে উদারভাবে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, সভ্যতা ও ভদ্রতার গুণাবলি দিয়ে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন জন্মের পর থেকেই। যে কারণে শৈশব থেকেই তিনি তার অভ্যাস এবং আচার-আচরণের বিশুদ্ধতার দরুন নিজ পরিবারের সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন- আমার বাবা এবং চাচা তাদের সমস্ত সন্তানের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং আমি যখন তাদের কাছে আসতাম, তখন তারা সবকিছু ছেড়ে আমার দিকে মনোযোগ দিতেন।

সবই ঠিক ছিল। কিন্তু তার পরিবার ছিল ইহুদি। তিনি নিজেও তাই ছিলেন। এজন্যই দেখা গেল, বনু নাজিরের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও গোত্রপতি হুওয়াই ইবনু আখতাব নিজ মেয়ের পাত্র হিসেবে পছন্দ করল বনু কুরাইজার কুখ্যাত কবি সাল্লাম ইবনু মিশকাম আল কুরাইজিকে। বিয়েও হলো ইহুদিদের রেওয়াজ-রীতি অনুযায়ী। কিন্তু খুদরতে ইলাহির ইচ্ছায় এ বিয়ে টিকল না। বিরাট ব্যবধান তৈরি হলো তাদের মনমানসিকতায়। বনিবনা হলো না উভয়ের কারও মাঝেই। ফলে তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বিয়ের কদিন পরই তালাকপ্রাপ্তা হলেন হজরত জয়নাব।

[আত তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৫, আল ইসাবাহ, খণ্ড। পৃষ্ঠা: ৮ জুজ, পৃষ্ঠা: ১২৬, আজওয়াজে মুতাহহারাত, পৃষ্ঠা: ২৫২]

দ্বিতীয় বিয়ে

এরোই মাঝে, মুসলিমরা ইহুদিদের মদিনা থেকে বহিস্কার করেন, সেখানে হজরত জায়নাব এর পরিবারও ছিলো। সবাই তখন খাইবারে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই অঞ্চলের নামকরণ করা হলো 'কাতিবাহ' নামে। সেই কাতিবাহ অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্গম ও মজবুত কামুস দুর্গের অধিপতি ছিল কিনানা ইবন আবিল হুকাইক। সে-ও ছিল একজন কবি ও কুখ্যাত নেতা। তার
সঙ্গেই হজরত জয়নাবকে দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে দিলো হুওয়াই ইবনু আখতাব। এরপর তিনি সেই দুর্গেই দিনাতিপাত করতে থাকেন। কিন্তু অশান্তি এখানেও এসে বাঁধ সেধে বসে। কোনোমতেই হজরত জয়নাব তার সঙ্গ মানতে পারলেন না। সবসময় বিরাজ করতে থাকে একধরনের অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠা। এভাবেই কাটছিল তার দিন, সপ্তাহ, মাস...

[সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩১, তারিখুত তাবারি, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৯০-৩১৪]

সর্দার কন্যার মুক্তি

সপ্তম হিজরির ঘটনা। খাইবারের যুদ্ধে ইহুদিরা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ যুদ্ধে তাদের গোত্রের বিখ্যাত লোকেরা নিহত হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাফিয়ার বাবা, ভাই ও স্বামী ছিল। খাইবারের যুদ্ধে ইহুদিরা পরাজিত হলে মুসলিমদের হাতে প্রচুর ধনসম্পদ গনিমত হিসেবে হস্তগত হয়। বিশাল ধনী হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াও যুদ্ধবন্দী হিসেবে মুসলিমদের কবলে। মুজাহিদদের হাতে প্রচুর ধনসম্পদ গনিমত হিসেবে হস্তগত হলো। বণ্টিত হলো গনিমতের সম্পদ। এরপর সকল যুদ্ধবন্দিকে হাজির করা হলো।

সাহাবি হজরত দিহয়া ইবনু খলিফা কলবি রাসুল সাঃ -এর কাছে এসে আবদার জানালেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার একজন দাসী প্রয়োজন। আমাকে গনিমতের সম্পদ থেকে একজন দাসীর মালিক বানিয়ে দিন। রাসুল সাঃ বললেন-

. اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً

“যুদ্ধবন্দি নারীদের থেকে একজনকে বেছে নিতে পারো।“

অনুমতি পেয়ে হজরত দিহয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু দাসী হিসেবে নির্বাচন করলেন বনু কুরাইজা ও বনু নজির গোত্রের সম্ভ্রান্ত নারী জয়নাব বিনতে হুওয়াইকে। দিহয়া কালবি যখন জয়নাব বিনতে হুওয়াইকে দাসী হিসেবে পছন্দ করলেন, তখন ব্যাপারটা কজন সাহাবির নজরে এলো। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে আবদার জানালেন-

. يا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ والنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ

“হে আল্লাহর রাসুল, দিহয়া কালবি নিজের জন্য এমন একজনকে দাসী হিসেবে নির্বাচন করেছেন, যিনি বনু কুরাইজা ও নাজিরের সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত একজন নারী এবং হজরত হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর। সঙ্গত কারণেই এমন সম্মানিত ও উচ্চবংশীয় নারীটি আপনারই উপযুক্ত; দিহয়া কালবি তার উপযুক্ত নয়।“

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিনতেনই না তাকে। হজরত জয়নাব বে তাও জানতেন না। তিনি যে বনু নাজিরের গোত্রপতির আদরের দুলালি এবং একজন সম্মানীত শেহজাদি-এ ব্যাপারে নবিজির কোনো ধারণাই ছিল না। এজন্য সাহাবিদের কথায় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করলেন। বন্দিনীর পরিচয় জানতে পেরে ফিরে তাকালেন তার দিকে। তিনি দেখলেন-ছোটখাটো, হালকা গড়নের ফরসা অবয়ব বিশিষ্ট সদ্য কৈশোর এক তরুণী মনমরা হয়ে দাড়িয়ে আছে। বয়স আর কত হবে? সতেরো-আঠারো হবে হয়তো। তরুণীর ওপর বয়ে যাওয়া মসিবতের কারণে ফরসা চেহারাটা কেমন শুকিয়ে গেছে। তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে, গোত্রপতির মেয়ে তিনি। এমন দিন দেখতে হবে হয়তো কল্পনায়ও ছিল না তার। ভয়াবহ বাস্তবতার আঘাতে মুষড়ে পড়েছেন যেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনের ব্যথা বুঝতে পারলেন। পরিষ্কার দেখতে পেলেন তার চেহারায় সবুজ মতো দাগ হয়ে আছে। কেউ কি আঘাত করেছে তাকে? কোনো মুসলিম না তো! যুদ্ধবন্দিদের গায়ে হাত লাগানো তো নিষেধ। বিশেষত নারীদের। তাহলে কে আঘাত করবে তাকে? কাছে চলে গেলেন নবিজি। নমনীয় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন-

يا صفية ما هذه الخضرة؟

হে সাফিয়া, তোমার চেহারায় এ কীসের দাগ? কেউ কি তোমায় আঘাত করেছে? হজরত জয়নাব অবাক হয়ে গেলেন এমন প্রশ্ন শুনে। যুদ্ধবন্দি নারীর সঙ্গে বুঝি কোনো সমরনায়ক এতটা নরম সুরে কথা বলে? তিনি কল্পনাও করেননি, তাকে এতটা নমনীয়তার সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হবে। তিনি জবাব দিলেন-

كان رأسى فى حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة، فرأيتُ كأن قمرًا وقع في حجري فأخبرته بذلك، فلطمنى وقال : تمنين ملك يثرب .

একবার আমি ইবনুল হুকাইকের ছেলের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, একটি চাঁদ আমার কোলে এসে পড়েছে। আমি স্বামী কিনানাকে এই স্বপ্ন বললে সে আমার গালে জোরে থাপ্পড় মারে এবং বলে, 'তুই আরবের সরদার মুহাম্মদকে স্বপ্ন দেখছিস?' কিনানার কথা চিন্তা করলেন তিনি। কীভাবে সে নিজ স্ত্রীর গায়ে আঘাত করতে পারে? অবশ্য কিনানা তার প্রাপ্য সাজা পেয়ে গিয়েছে। সে নিহত হয়েছে এই যুদ্ধে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত জয়নাবের বিষয়টি পূর্ণরূপে অনুধাবন করলেন। প্রথমত তিনি সর্দার কন্যা। দ্বিতীয়ত মজলুম। তৃতীয়ত তিনি আরেক স্ত্রীর মতো তাঁকেই স্বপ্নে দেখেছেন। এসব বিষয় বোধগম্য হওয়ার পর তিনি হজরত দিহয়া কালবিকে ডেকে বললেন-

خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا .

“তুমি অন্য কোনো মেয়েকে নারীকে হিসেবে পছন্দ করে নাও।“

অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিহয়া কালবিকে কিনানার বোন, মতান্তরে হজরত জয়নাবের চাচাতো বোন মতান্তরে নয়জন দাসীর বিনিময়ে হজরত জয়নাবকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩১ ৩১০, সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৩৫৭১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফাজিলাতি ইতাকি আমাতিহি সুম্মা ইয়াতা জাওয়াজুহা। সহিহ বুখারি, হাদিস: ৪২০০, ২২৩৫, ২৮৯৩, মুসনাদু আহমদ, হাদিস: ১৩০২৩, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৯০]

জাইনাব থেকে উম্মুল মুমিনিন

হজরত জয়নাব গনিমতের সম্পদ হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশে পড়ায় তার নাম হয়ে গেল সাফিয়া। কারণ, আরবে বাদশার অংশে পড়া গনিমতের মালকে 'সাফিয়া' বলা হয়। এরপর থেকে এ নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় মুছে গেল 'জয়নাব' নামটি। হয়ে গেলেন সৌভাগ্যবতী উম্মুল মুমিনিন, রাসুল সাঃ তাকে বিয়ে করার জন্য মনস্থির করলেন। এরপর খাইবার থেকে মদিনায় পৌঁছার আগেই বিয়ের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হলেন দুটি অভিজাত প্রাণ। এই পবিত্র বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই হজরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হয়ে গেলেন সকল মুমিনের আম্মাজান।

এই উম্মতের নারীদের ভেতর সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন তিনি। ভুলে গেলেন পর্বের জীবনের কথা। হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে দিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ভালোবাসা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে তাকালেন নববধূ সাফিয়ার দিকে। কোমলমতি এক তরুণীকে দেখতে পেলেন তিনি। লাজুক চেহারায় তাকিয়ে আছেন তার দিকে। নবিজি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন

- هل لك في .

আমার ব্যাপারে কি তোমার কোনো আগ্রহ আছে?

আম্মাজান লজ্জাবনত মস্তকে বললেন –

قد كنت أتمنى ذلك في الشرك، فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام ؟

আমি তো ইহুদি থাকাকালীনই আপনার ব্যাপারে আগ্রহবোধ করতাম। তাহলে এখন আল্লাহ আমাকে মুসলিম বানানোর পর কেন আপনার প্রতি আগ্রহী হব না?

এ কথা শুনে মূলত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনে নিলেন তার মানসার বিপরীত কোনো কিছু হচ্ছে কিনা। এর মাধ্যমে প্রকাশ পেল নবিজির উত্তম আখলাকের আরও একটি ঝলক। এরপর কথা হলো পৃথিবী

শ্রেষ্ঠ মানব-মানবীর মাঝে। একপর্যায়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোহর দিতে চাইলেন। কিন্তু আম্মাজান সাফিয়া বললেন আমার মুক্তিই আমার মোহর ইয়া রাসুলাল্লাহ।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ২,পৃষ্ঠা: ২৩৫, আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫০৬, কায়রো, মাকাবায়ে তাওফিকিয়্যা। আল ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবা, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪১২]

ওলিমা

সকালবেলা, রাসুল সাঃ বসে আছেন নিজ তাঁবুতে। আম্মাজান সাফিয়াও আছেন। এমনই সময় সাহাবায়ে কিরাম এলেন নবিজির কাছে। কথোপকথন হলো সাহাবায়ে কিরাম ও নবিজির মাঝে। একপর্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সরঞ্জাম বললেন-এখন তোমরা তোমাদের মায়ের কাছ থেকে উঠে যেতে পারো। সাহাবায়ে কিরাম আর এক মূহর্ত দেরি করলেন না সেখানে। তৎক্ষণাৎ তাঁবু ত্যাগ করলেন।

সকাল গড়িয়ে দুপুর আর দুপুর গড়িয়ে হলো বিকেল। সাহাবায়ে কিরাম আবার গেলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে। নবিজি তখন চামড়ার ছোট দস্তরখানে খেজুর ও ঘি মিশ্রিত খাবার 'হাইসা' তৈরি করছিলেন।

এরপর তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন তোমরা আশপাশের লোকদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর দাও! সাহাবায়ে কিরাম দাওয়াত করলেন সবাইকে। নবিজির দাওয়াতের কথা শুনে ছটে এলেন আশপাশের সবাই। অনেক সাহাবি উপস্থিত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-তোমরা তোমাদের মায়ের ওলিমা খাও! সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মেজবানের হাতে বানানো খাবার। খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন সকলেই।

এই ছিল আম্মাজান সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ওলিমা। কত সাদামাটা ছিল সেই ওলিমা। যে ওলিমা নতুন বধূয়া তৈরি করেননি, তৈরি করেছেন খোদ রাসুল।

বাদি নাকি স্ত্রী

বাদি নাকি স্ত্রী মদিনার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন মজাহিদের দল। দলপতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেউ উটের পিঠে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ খচ্চরের পিঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন রাসুলের শহর মদিনার দিকে। একপর্যায়ে কাফেলা গিয়ে পৌঁছল 'সাদ্দা রাওহা' নামক স্থানে। যাত্রাবিরতি হলো। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। সে সময় পেছনের কজন সাহাবি, যারা নবিজির ওলিমায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তারা একে অপরকে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন-

لا ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হজরত সাফিয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন নাকি বাঁদি হিসেবেই নিজের কাছে রেখেছেন?
কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারছিলেন না। অবশেষে তারা মনস্থির করে বললেন-

إن حجبها فهي إمرأته .

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি অন্যান্য স্ত্রীর মতো হজরত সাফিয়াকেও পর্দা দিয়ে ঢেকে নেন, তাহলে আমরা ধরে নেব নবিজি তাকে স্ত্রী হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং তিনি মুমিনদের মা হয়ে গেছেন।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরো বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন- নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার গমন করেন। যখন মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষে দুর্গের বিজয় দান করলেন, তখন তাঁর সামনে সাফিয়া বিনতে হুওয়াই ইবনু আখতাবের সৌন্দর্যের আলোচনা করা হয়। তার স্বামী নিহত হয় এবং তিনি তখন ছিলেন নব-বিবাহিতা। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের জন্য গ্রহণ করে নেন। তিনি তাঁকে নিয়ে রওনা হন। যখন আমরা সাদ্দা রাওহা নামক স্থানে উপনীত হলাম, তখন হজরত সাফিয়া পবিত্র হলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর চামড়ার ছোট দস্তরখানে খাদ্য (খেজুর ও ঘি মিশ্রিত) তৈরি করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আশপাশের লোকদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর দিয়ে দাও।

এই ছিল হজরত সাফিয়ার বিবাহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ওলিমা। এরপর আমরা মদিনার উদ্দেশে রওনা হই। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি হজরত সাফিয়াকে নিজের আবা দিয়ে ঘেরাও করে দিচ্ছেন। তারপর তিনি তাঁর উটের পাশে বসে হাঁটু মুবারক সোজা করে রাখলেন, পরে হজরত সাফিয়া নবিজির হাঁটুর ওপর পা দিয়ে ভর করে আরোহণ করলেন।

সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৮৯৩, ২২৩৫, মুসলিম, হাদিস: ১৩৬৫

প্রাধান্য

আম্মাজান সাফিয়ার সামনে বাহন প্রস্তুত। কিন্তু বাহন উঁচু ছিল বলে তাতে ওঠা আম্মাজানের জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়ল। পা ওঠালেই দেখা যাবে সতর। বিষয়টি বুঝতে পারলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এগিয়ে গেলেন তিনি। আম্মাজানের পাশ দিয়ে সরে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বাহনের সামনে। এখন কী করবেন আম্মাজান সাফিয়া? আমরা অবাক হই। কিন্তু আম্মাজান এর আগেও সফরের শুরুতে নবীজিকে এমন করতে দেখেছেন, এতক্ষণে তিনি চিনে ফেলেছেন আল্লাহর রাসুলকে। আম্মাজান তাঁর পা এগিয়ে দিলেন নবিজির

ভাঁজ-করা হাঁটুর দিকে। পায়ের ভর রাখলেন পেতে-দেওয়া হাঁটুতে। তারপর খুব সহজেই উঠে গেলেন বাহনে। এই গুণগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলাদা করে ফেলতো আর সবার থেকে।

ইসলামি শরিয়তপ্রণেতা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজের ঘরের আওতা থেকেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শিক্ষণীয় কোনো ব্যাপারকেই তিনি কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর কোনো চক্রে আটকে থাকতে দিতেন না। ছোট ছোট শুভবোধের আড়ালে ছিলো আসন্ন মানবিক সভ্যতার বিরল দৃষ্টান্ত।

[বুখারি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা: ১৩৪, মুসলিম, হাদিস: ১৩৬৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ২. পৃষ্ঠা: ২৩৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৯৬]

নববধূ দেখতে সবার মিলনমেলা

নববধূ দেখতে সবার মিলনমেলা । ইহুদি-কন্যা নবিজির বউ হয়ে এসেছেন। রুপবতী, গুণবতী। পুরো মদিনা জুড়ে উত্তাল। খাইবারের বিজয়ের আনন্দের চেয়ে বেশি আলোচনা হতে থাকে রাসুলের নববধূকে নিয়ে। নারীদের ভেতর সাড়া পড়ে যায়। উম্মুল মুমিনিন সাফিয়ার সন্দরী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসের গতিতে। সবাই নতুন বধূকে একনজর দেখার জন্য ছুটে যাচ্ছে হারিসা ইবন নোমানের গৃহে। অন্য উম্মুল মমিনিনরাও তার অসাধারণ লাবণ্যের কথা শুনে দেখতে গেলেন। সেই দলে ছিলেন উম্মুল মুমিনিন জয়নাব বিনতে জাহাশ, হাফসা বিনতে উমর এবং জুওয়াইরিয়া বিনতল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না। আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও শুনলেন হজরত সাফিয়ার রূপ-লাবণ্যের কথা। নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারলেন না তিনিও। একটি চাদরে নিজেকে জড়িয়ে চললেন আম্মাজান সাফিয়ার অস্থায়ী বাড়ির দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন সবকিছু। কারণ, আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি উন্নত স্বভাব ছিল এমন-কোনো স্ত্রী নবীজি সাঃ এর ঘরে এলে তার সবকিছ পর্যবেক্ষণ করতেন।

হাদিয়া

সবাই দেখলেন আম্মাজান সাফিয়াকে। নবি-পরিবারের অনেকেই দেখতে গেলেন তাকে। তাদের ভেতর ছিলেন সাইয়িদা ফাতিমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দেখতে গেলে যখন তিনি জানতে পারলেন, ফাতিমা রা: আনহা রাসূল সাঃ এর অধিক প্রিয়তমা স্ত্রী তখন তিনি তাকে তার নিজের কানের দুল খুলে পরিয়ে দিলেন; এমনকি তার সঙ্গে যারা দেখতে গেলেন, তাদেরও নানারকম হাদিয়া-তোহফা দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন।

[তাবাকাত ইবনু সাদ, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১২৭, শারহুল মাওয়াহিব, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৯৬]

নবীজির ভালোবাসা ও ন্যায়পরায়ণতা

নবীজির ভালোবাসা ও ন্যায় পরায়ণতা ঘর নির্মাণ হলো আম্মাজান সাফিয়ার জন্য। মসজিদে নববির পাশেই সেই ঘর। আম্মাজান স্থানান্তরিত হলেন সেখানে। এরপর থেকে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিলেন। আম্মাজান সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। এ তো প্রমাণিত সত্য। কিন্তু তিনি আর দশটা সুন্দরী নারীর মতো ছিলেন না; যারা অহংকারী এবং কথায় কথায় প্রকাশ পায় অহংকার। তিনি সুন্দরী হলেও তার মনে, চলাফেরায় বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। খুবই শান্ত ও চাপা স্বভাবের ছিলেন। নিজের মনোবেদনা, দুঃখ কাউকে সহজে বুঝতে দিতেন না। উঁচু আওয়াজে কথা বলা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। ইহুদি গোত্রের মেয়ে ছিলেন বলে তাকে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখতো। তিনি বুঝতে পেরেও নবিজিকে কখনো এ ব্যাপারে মুখ খুলে কিছু বলেননি। তবে নবিজি তার এ রকম চাপা মনোভাব বুঝতে পারতেন। তাই সবসময় তার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন।

একদিন আম্মাজান নিজ ঘরে বসে কাঁদছেন। ছোট বাচ্চার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আম্মাজান। মাত্র সতেরো বছর বয়সে সব হারিয়েছেন। এখানে এসে তাকে কথা শুনতে হচ্ছে। তাকে কটাক্ষ করছে কেউ কেউ। এমনই সময় তাশরিফ নিলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, চোখের পানি মুছে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন কান্নার কারণ। আম্মাজান বললেন- আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা একটু আগে আমাদের মজলিসে বলছিলেন, তারা কুরাইশ এবং সম্মানের দিক থেকে অন্য স্ত্রীদের থেকে রাসুলের অধিক নিকটবর্তী। আমি ইহুদি গোত্রের হওয়ায় চুপ করে ছিলাম। কারণ, ইহুদিদের মদিনায় অনেক ঘৃণাছখ চোখে দেখা হয়, তার কথা শুনে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৃদয়ের অতলস্পর্শী ভয়ানক সুন্দর এক জবাব দিলেন। নবিজি বললেন –

إِنَّكِ لَا بْنَةُ نَبِي، وَإِنْ عَمَكِ لَنَبِيٌّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِي ؛ فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟

তুমিও তো সম্মানিতা তুমি কেন তাদেরকে বলে দিলে না-আমার বংশীয় পিতা হারুন আলাইহিস সালাম একজন নবি, আমার চাচা মুসা আলাইহিস সালাম একজন নবি: এমনকি স্বামী শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন নবি। তাহলে কীসে তারা তোমার ওপর গর্ব করে?
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শোনার পর আম্মাজান সাফিয়া রাঃ -এর মনের ভেতর নিজেকে নিয়ে যে সংকোচ ছিল, তা দূর হয়ে গেল। এখানেই শেষ নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন আম্মাজান হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে। তাকে বললেন-

. اتقي الله يا حفصة

হাফসা, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো!

অর্থাৎ এমন কথা বলো না, যদ্দরুন কোনো মুমিন কষ্ট পায়। আসলে আম্মাজান হাফসা বা আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আম্মাজান সাফিয়াকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলেননি। স্বাভাবিকভাবেই বলেছিলেন। তবে কখনো কখনো স্বাভাবিক কথাও অন্যের সামনে বলতে নেই। এ ব্যাপারেই সতর্ক করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এভাবেই তিনি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন সহধর্মিণী সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি।

[তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৪, মুসনাদু আহমদ, হাদিস: ১২৪১৫, সুনানু কুবরা, বাইহাকি, হাদিস: ৮৯১৯]

উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা রাঃ এর তাওবা

তাওবা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন, যেন তার কোনো গুনাহই নেই। অন্যত্র ইরশাদ করেন-আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, যার গুনাহ হয়ে যায়, কিন্তু সে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাওবা করে নেয়।

[ইবনু মাজাহ, হাদিস: ৪২৫০, তাবারানি, হাদিস: ১০২৮১]

একদিন আম্মাজান আয়েশা রা:, আম্মাজান সাফিয়া রা: এর ছোটখাটো গড়নের দিকে ইঙ্গিত করে নবিজিকে বললেন-

حسبك من صفية كذا وكذا.

"আপনি তাকে ভরণপোষণের জন্য যা-ই দেবেন, তা-ই যথেষ্ট হয়ে যাবে তার জন্য।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজানের এ কথায় বেশ ব্যথিত হলেন। কারণ, কথাটা ছিল সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য অপমানসূচক। তাই তৎক্ষণাৎ নবিজি আম্মা আয়েশাকে তিরস্কার করে বললেন-

لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر المزجته .

"তোমার এ কথাকে যদি সাগরে নিক্ষেপ করা হতো, তবে সাগরের পানি দূষিত হয়ে যেত, তোমার কথাটা এমনই মন্দ।"

আম্মাজান আয়েশার হৃদয়টা হায় হায় করে উঠল; এ কী বলে ফেললাম আমি! নিজের ভুল বুঝতে পারলেন আম্মাজান। আসলে তিনি কিছুটা দুষ্টমি করেই বলেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এমন হবে, তিনি বুঝতে পারেননি। এজন্য পরক্ষণেই নিজের ভুল শুধরে বললেন হ্যাঁ, আমি তো এমনিই এক গর্হিত কথা বলে ফেলেছি! এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সংশোধন করার জন্য বললেন, আমাকে যদি পুরো পৃথিবীও দিয়ে দেওয়া হয়, তবু আমি এমন কোনো কথা বলব না। এটা শুনে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাওবা করলেন এবং এমন কিছু না করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

[আবু দাউদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৯৩, হাদিস: ৪৮৭৫, তিরমিজি, হাদিস : ২৫০২। মাওসুআতু মাহাসিনিল ইসলাম, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৫৬]

দ্বিন শিক্ষা

সপ্তম হিজরির রমজান মাস। তখন শেষ দশক চলছে। একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববিতে বসে আছেন। তাঁর চারপাশ ঘিরে বসে আছেন উম্মুল মুমিনিন। নবিজি গল্প করছেন তাদের সঙ্গে। দ্বীন শেখাচ্ছেন। একসঙ্গে বসে এভাবে গল্প করছেন, তাই তারা সকলেই আনন্দিত, উৎফুল্ল। রাত গভীর হলো। যাওয়ার সময় হয়ে এলো সবার। এজন্য তারা অনুমতিক্রমে যার যার ঘরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আম্মা সাফিয়াকে বললেন-

لا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ .

"তুমি যেয়ো না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মা সাফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। পথিমধ্যে দেখা হয়ে গেল দুজন আনসারি সাহাবির সঙ্গে। নবিজি তখন প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন আম্মাজান সাফিয়ার ঘরের দোরগোড়ায়। সাহাবিষয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেয়ে সালাম দিলেন। এরপর দ্রুতপদে আগে বেড়ে গেলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন-তাদের মনে কোনো সংশয় জন্মাল কিনা! এজন্য তাদের দুজনকে ডাকলেন। তারা কাছে এলে বললেন-

إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَى .

এ তো সাফিয়া বিনতে হুওয়াই। সাহাবিদ্বয় বলে উঠলেন-

সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহর রাসুল, আমরা ভিন্ন কোনো কিছু কল্পনাই করতে পারি না। বিষয়টি সাহাবিদ্বয়ের জন্য কঠিন মনে হলো। নবীজি কি কিছু ভাবলেন আমাদের ।সম্পর্কে? তাদের আত্মিক যন্ত্রণা বুঝতে পারলেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এজন্য বললেন-

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا.

শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাচল করে। আমি আশঙ্কা করছিলাম, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনোরূপ কুধারণার সৃষ্টি করে কিনা?

বুখারি, হাদিস: ২০৩৮, ৩১০১

রান্নায় হয় না যার তুলনা

রান্নায় নেই জুড়ি আম্মাজান সাফিয়া রা: আনহার যেমন ছিল রূপৈশ্বর্য, তেমনই ছিল তার গুণ। রূপে গুণে অনন্য এক নারী ছিলেন তিনি। প্রেম-ভালোবাসা, আতিথেয়তা, স্বামী- ভক্তি, সংসারী, ধৈর্যশীল, পরোপকারী, সেই সাথে ছিলেন পাক্কা রাঁধুনি। রান্নায় ছিল তার পূর্ণ মনোযোগ। রান্না করতে ভালোবাসতেন তিনি। এজন্য তিনি বহু উপাদেয় খাবার রান্না করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও অন্য পত্নীগণকে আহার করাতেন। বিশেষত নবিজি যখন আম্মা আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন, তখন আম্মা সাফিয়া ভালো খাবার-দাবার রেঁধে নবিজির জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

[মাওসুআতু মাহাসিনিল ইসলাম, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৫১-১৫৪]

পবিত্র সেই ভালোবাসা

পবিত্র সেই ভালোবাসা আম্মাজান সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা এতদিনে ভালোবাসার পাহাড় গড়ে তুলেছেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। তিনি কেবল অপেক্ষা করছেন, কবে আসবেন নবীজি। কবে তাঁর দর্শন-সুর্মায় সজ্জিত করবেন নিজের আখিজুগল। অপেক্ষার পালা শেষে নবিজি এলেন মদিনায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন মদিনায় অবস্থান করছেন। সাক্ষাৎ করলেন সকল স্ত্রীর সঙ্গে। এরপর চললেন বিবি সাফিয়ার ঘরে। আম্মাজান নবীজিকে নিজের ঘরে তাশরিফ নিতে দেখে বেজায় খুশি হলেন। খুশিতে নবিজির সামনে কী এগিয়ে দেবেন বুঝতে পারলেন না। তাছাড়া ঘরে তেমন কিছু ছিলও না সেদিন। কেবল রান্না করা ছাগলের কাঁধের একটুকরো গোশত ছিল। যার কিছু অংশ আম্মাজান খেয়েছিলেন। আম্মাজান রাদিয়াল্লাহু আনহা তা-ই এগিয়ে দিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে। এখানেই প্রকাশ পেল প্রিয়তমা স্ত্রী সাফিয়ার প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক অমোঘ ভালোবাসা। নবীজি হজরত সাফিয়ার খেয়ে রাখা সেই গোশত হাতে তুলে নিলেন এবং খুব যত্নের সঙ্গে আহার করলেন। সেই থেকে সুন্নাত হয়ে গেল স্ত্রীর মুখের খাবার আহার করা। একদা সে কথা তিনি নিজেই বলেন-

دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَبْتُ إِلَيْهِ كَتِفًا بَارِدًا، فَكُنْتُ أَسْحَاهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে তাশরিফ নিলেন। আমি তাঁর সামনে কাঁধের গোশত এগিয়ে দিলাম। অবশ্য আমি সেই গোশতের কিছু অংশ খেয়ে রেখে দিয়েছিলাম। নবীজি তা আহার করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেন।“

[আল মুজামুল কাবির, তাবারানি, হাদিস: ২০৬৩৯, আল মাতালিবুল আলিয়া, মুসনাদে আবি ইয়ালা, কিতাবুত তাহারাত, হাদিস: ১৪১, মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসিলি, হাদিসি: ৬৯৫৪]

শুরু ও শেষ হজ্জ্ব

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলা নিয়ে রওনা দিলেন মক্কার পথে। সপ্তাহ-কালব্যাপী পথচলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কার নিকটবর্তী জি-তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন যাত্রাবিরতি করে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিনটি ছিল দশম হিজরির ৪ জুলহিজ্জাহ রোজ রবিবার। জীবনের প্রথম ও শেষ হজ আদায় করলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সাহাবায়ে কিরামের সামনে বললেন বিদায়ি কথা। আরাফার ময়দানে আল্লাহ তাআলা এই ওহি প্রেরণ করলেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دينا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।"

সুরা মায়েদা, আয়াত: ৩

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবিকে সামনে রেখে নিজের চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন-

هذا أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد علي

"হে জনতা, এ বছরের পর তোমাদের সঙ্গে এখানে আমার আর কখনো দেখা হয় কিনা জানি না। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে আমার বক্তব্য শুনে স্মরণ রাখবে এবং এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে তা জানে না... এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য নেওয়ার লক্ষ্যে জিজ্ঞেস করলেন-

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟

তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তোমরা কী বলবে?

তারা সকলেই সমস্বরে সাক্ষ্য দিলো-

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ.

আমরা সাক্ষ্য দেবো, আপনার ওপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খের সঙ্গে আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মতের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ও নসিহত করেছেন।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরার পর তা লোকদের দিকে ফিরিয়ে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন-

اللهُمَّ اشْهَدُ اللهُمَّ اشْهَدُ، اللهُمَّ اشْهَدُ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ

“হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো, তুমি সাক্ষী থেকো, তুমি সাক্ষী থেকো।“

নবীজির বিদায়বেলা

এগারো হিজরি। সফর মাসের শেষ সপ্তাহ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ প্রান্তরে গেলেন। জীবিতরা যেভাবে মৃতদের শেষ বিদায় জানায়, ঠিক সেভাবে শহিদদের জন্য দুআ করলেন। এয় কদিন পর। গভীর রাত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরোলেন বাকি গোরস্তানের দিকে। মৃতদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন গোরস্তানে পৌঁছে। ফেরার প্রাক্কালে বললেন, হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। অচিরেই আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। এগারো হিজরি। উনত্রিশে সফর। রোজ সোমবার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার গেলেন বাকি কবরস্তানে। একটি জানাজায় শরিক হলেন। তখনও পর্যন্ত নবিজি প্রায় সুস্থ। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা-ফেরার পথে তাঁর মাথাব্যথা শুরু হলো। তাপমাত্রা পৌঁছে গেল চরমে; এমনকি মাথার পট্টির ওপর দিয়েও তা অনুভূত হলো। পর্যায়ক্রমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুখ বৃদ্ধি পেল। তিনি বিবিদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আগামী দিন আমি কোথায়? আগামী দিন কার ঘরে থাকব? আম্মাজান সাফিয়া-সহ অন্যান্য নবিপত্নীগণ নবিজির উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন।

এরপর তাঁরা সকলে মিলে নবিজিকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঘর নির্বাচনের অনুমতি দিলেন। নবিজি স্থানান্তরিত হলেন আম্মাজান আয়েশার ঘরে। এগারো হিজরি। রবিউল আওয়াল মাস। সাত তারিখ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরের তাপমাত্রা আরও চরমে পৌঁছে গেল। আম্মাজানগণ তাঁকে পানির পাত্রের কাছে বসালেন এবং শরীরে পানি ঢালতে থাকেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করা সত্ত্বেও তিনি লোকদের নিয়ে প্রত্যেক নামাজ আদায় করতে লাগলেন; এমনকি মৃত্যুর চারাদিন পূর্বের সেই বৃহস্পতিবারেও নামাজের ইমামতি করলেন। কিন্তু ইশার সময় রোগ আরও এটি পাওয়ায় তিনি আর মসজিদে যেতে পারলেন না। সে সময় আম্মাজান সাফিয়াসহ সকল আম্মাজান নবীজির পাশেই ছিলেন।

শনিবার কিংবা রোববার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে করলে দুই ব্যক্তির সাহায্যে জোহরের নামাজ আদায় করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তখন হজরত আবু বকর নামাজের ইমামতির জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু নবিজিকে আসতে দেখে পিছনে সরে যেতে চাইলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইশারায় নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন, তোমার নামাজ পুরা করো। এরপর তিনি আবার কামরায় ঢুকে পড়লেন এবং পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যথা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। বিষের প্রভাষ আরও প্রগাঢ় হলো। শেষ মুহূর্তে মানুষকে তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা নামাজের প্রতি খেয়াল রাখবে, তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে এবং তোমারে। অধীনস্থদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

এরপর নবীজি তাঁর হাত বা অঙ্গুলি ওপরে উঠিয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকালেন। সকলেই একবার ওপরে তাকিয়ে আবার নবিজির দিকে ফিরলের। নবীজির ওষ্ঠদ্বয় তখন নড়ে উঠল। মৃদু স্বরে নবীজি বললেন-হে আল্লাহ, আপনি যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন, তাদের-তথা নবী, সিদ্দিক, শহিদ এবং সৎব্যক্তিদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করে নিন। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং সুমহান বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়ে দিন। নবীজি শেষোক্ত বাক্যটি তিনবার বললেন। বলা শেষ হতে না হতেই নবীজির পবিত্র হস্তদ্বয় ঝুঁকে পড়ল এবং তিনি পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

[সুলাইমান ইবনু সালমান মানসুরপুরি, রহমাতুল্লিল আলামিন (উর্দু), দিল্লি: ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০, শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি, আর রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা: ৫৪]

আলিমা

আলিমা আম্মাজান সাফিয়া এখন একলা। কেউ নেই তার। একমাত্র নবীজিই ছিলেন তার আপনজন। সেই তিনিও চলে গেলেন আল্লাহর সান্নিধ্যে। এখন একাকী একাই তার দিন কাটে। সন্তানাদি নেই, আপনজন নেই, নবিজিও নেই। মাঝে মাঝে তাই একা বসে ভাবেন-আর কিছুদিন থাকতাম তাঁর পাশে। তাঁর পবিত্র ভালোবাসায় আর কিছুদিন যদি কাটাতাম! আম্মাজান সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাঃ নবীজির সঙ্গে মাত্র চার বছর কাটিয়েছেন। এই চার বছরেই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞ আলিমা। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তই ছিল তার কাছে অতি মূল্যবান। আম্মাজান রাদিয়াল্লাহু আনহা মাঝেমধ্যেই নবীজি সাঃ এর সাথে কাটানো স্মৃতি রোমন্থন করতেন এবং তার কাছে লোকেরা দ্বীন শিখতে এলে সেই স্মৃতির পাতা থেকে হাতড়িয়ে নবিজির কথামালার হুবহু বর্ণনা দিতেন।

একবার মুসলিম ইবনু সাফওয়ান এলেন আম্মাজান রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ইলম শিখতে। আম্মাজান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদিস শিখিয়ে দিলেন। আম্মাজান সাফিয়া বললেন –

একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –

> لا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ

লোকেরা এই আল্লাহর ঘর নিয়েও লড়াই থেকে বিরত হবে না। শেষ পর্যন্ত এক বাহিনী যখন লড়াইয়ে আসবে আর তারা যখন খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে নিয়ে জমিন ধ্বসে যাবে। যারা মাঝামাঝি অবস্থান করবে, তারাও এ থেকে রেহাই পাবে না। আমি জানতে চাইলাম- يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ . ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাদের মধ্যে যারা বাধ্য হয়ে শামিল হবে, তাদের কী হবে? জবাবে নবিজি বললেন- يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ . তাদের অন্তরের অবস্থা অনুসারে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্থিত করবেন।

[তিরমিজি, হাদিস: ২১৮৪, বুখারি, হাদিস: ২১১৮, মুসলিম, হাদিস: ২৮৮৪]

মুফতিয়া

আম্মাজান সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থেকে হুজুরের মানসিকতা এমনভাবে নিজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত করেছিলেন যে, তিনি কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যেত তা একেবারে হুবহু রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানসা অনুযায়ী হয়েছে। এমনই একটি ঘটনা... সুহাইরা বিনতে জাইফার একবার হজ করার পর মদিনায় পৌঁছলেন এবং আম্মাজান সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে অবস্থান করলেন। তার সঙ্গে আরও কিছু নারী ছিল। তারা যখন আম্মাজানের কাছে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে কুফা অধিবাসী কিছু নারীও উপস্থিত ছিল। এরপর কুফার অধিবাসীরা নারী, স্বামী, ঋতুস্রাব সম্পর্কিত বেশকিছু মাসআলা জিয়েস করলেন।

এরপর একপর্যায়ে তারা মাটির পাত্রে তৈরি নাবিজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আম্মাজান তখন বললেন –

كارتُمْ عَلَيْنَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ وَمَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطْبُخَ تَمْرَهَا ثُمَّ نَدْلُكَهُ ثُمَّ تُصَفِّيَهُ فَتَجْعَلَهُ فِي سِقَائِهَا
زوجها وَتُوكِى عَلَيْهِ فَإِذَا طَابَ شَرِبَتْ وَسَقَتْ

"হে ইরাকের অধিবাসীগণ, তোমরা মাটির পাত্র বা মটকায় তৈরি নাবিজ প্রসঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রশ্ন করে থাকো (অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা হারাম করেছেন); তবে তোমাদের কারও কোনো পাপ হবে না, যদি সে খেজুর রান্না করে সেগুলোকে একত্রে পরিষ্কার করে এবং একটি পাত্রে রেখে মুখ বেঁধে রাখে। এরপর যদি তা ভালো থাকে, তাহলে তা নিজেও পান করতে পারবে এবং তার স্বামীকেও পান করাতে পারবে।"

[মুসনাদু আহমদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা: ৩৩৭, হাদিস: ২৬৭৪২, মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা, হাদিস: ২৩৩১৪, মুসনাদু আবি ইয়ালা, হাদিস: ৬৯৫৬, আল মুজামুল কাবির, তাবরানি, হাদিস: ২০০৬১]

আম্মাজান সাফিয়া রা:, রাসুল সাঃ এর অনুকরণেই এই ফাতওয়া দিয়েছেন। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন –

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ

মাটির পাত্রে ও লাউয়ের খোলসে জমানো নবীজ (ফলের রস, যা মদ বানানোর জন্য কোনো পাত্রে রেখে পচানো হয়) পান করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহি বুখারি: ৫৩, ৭২৬৬, মুসলিম: ১৭

অপর এক হাদিসে এসেছে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ والْمُزَفَّتِ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাউয়ের খোলস ও মুজাফফাত তথা আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

[বুখারি, পর্ব: ৭৪, অধ্যায়: ৮ হাদিস: ৫৫৯৪, মুসলিম, পর্ব: ৩৬, অধ্যায়: ৬, হাদিস: ১৯৯৪]

এভাবেই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে আম্মাজান সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহা একাধিক মাসআলার সমাধান দিয়েছেন। এজন্য তিনি তৎকালীন জামানায় উল্লেখযোগ্য মুফতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ফকিহা

আম্মাজান সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আবিদা, আলিমা ও মুফতিয়া যেমন ছিলেন, তেমনই তিনি ফকিহাও ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় মাসআলার সমাধান দিতেন এবং নবীজি সাঃ এর পবিত্র কথামালার আলোকে মাসআলার সমাধান বলে দিতেন। আম্মাজান সাফিয়া রা: এর এক মুক্তদাস ছিল। তার নাম ছিল কিনানা। একদা সে আম্মাজানের কাছে হিজামা-সম্পর্কিত একটি মাসআলার সমাধান চাইল। আম্মাজান রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন –

أفطر الحاجم والمحجوم

''যে শিঙ্গা লাগায় এবং যারা শিঙ্গা লাগায়; উভয়ই রোজা ভেঙে ফেলবে; তারা রোজা রাখবে না।''

[আল মাতালিবুল আলিয়া, হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি, হাদিস: ১১১৮]

আম্মাজান সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা মাসআলার যে সমাধান বলে দিলেন, তা মূলত প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই বক্তব্য। কারণ, শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم

একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকি নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট গমন করে তাকে শিঙ্গা লাগাতে দেখলেন। এ সময় তিনি রমজানের আঠারো তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয় গণনা করে বললেন-যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগায় এবং যাকে শিঙ্গা লাগানো হয়; তারা উভয়ে রোজা ভঙ্গ করবে।

[আবু দাউদ, হাদিস: ২৩৬৯, হাদিসের মান: সহিহ]

হৃদয়বান

আম্মাজান সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার এক দাসী ছিল। একবার সে খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে অভিযোগ দায়ের করে বলে إن صفية تحب السبت وتصل اليهود সাফিয়ার মধ্যে এখনো ইহুদি-ভাব বিদ্যমান। কারণ, তিনি এখনো শনিবারকে মানেন এবং ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন ফারুকে আকবার রাদি। দাসীর কথার সত্যত্র যাচাইয়ের জন্য ডেকে পাঠালেন উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়াকে। আম্মাজান উপস্থিত হলে তিনি অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে আম্মাজান বললেন-

أمّا السبت فإني لم أحبّه منذ أبدلني الله به يوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما وأنا أصلها

যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের পরিবর্তে জুমাকে দান করেছেন, তখন থেকে শনিবারকে মানার কোনো প্রয়োজন নেই। আর ইহুদিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো-সেখানে আমার আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে আমার দৃষ্টি রাখতে হয়। এই উত্তরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন আমিরুল মুমিনিন। আম্মাজান ফিরে চললেন নিজ গন্তব্যে। ঘরে ফিরে দাসীকে ডাকলেন। সে উপস্থিত হলে জানতে চাইলেন – ما حملك على ما صنعت এ অভিযোগ করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছে? কোনো রাখঢাক না রেখে দাসী জবাব দিলো الشيطان শয়তান।

জবাব শুনে আম্মাজান সাফিয়া চুপ হয়ে গেলেন। সত্য জবাব তার মনঃপূত হলো। যে কারণে তিনি দাসীকে বললেন- اذهبي فأنت حرة . যাও, আজ থেকে তুমি মুক্ত স্বাধীন।

আল ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব, পষ্ঠা: ৯১৭

এমনই ছিল আম্মাজান সাফিয়ার অনুপম চরিত্র। এমনই ছিল তার মায়া-মমতা আর দয়ার্দ্রতা। যে অভিযোগ করে তাকে কষ্ট দিলো, তার প্রতি দয়া করে তাকেই মুক্ত করে দেন। তিনি যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নবিজি বলেছেন- وأحسن إلى مَنْ أساء إليكَ যে তোমায় কষ্ট দেয়, তার প্রতি সদাচারণ করো।

[সহি আত তারগিব, হাদিস: ২৪৬৭]

দানবীর

দানবীর উদারতা ছিল আম্মাজান সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বভাব। দানে কখনো কার্পণ্য করেননি তিনি। তাই তো খাইবারের সম্পত্তির বেশিরভাগ অংশই দান করে দিয়েছিলেন। এমনকি মদিনায় প্রবেশ করা মাত্রই গলার মালা ও হাতের বালা খুলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত স্ত্রী ও কন্যাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বেহিসাব দান করতেন আম্মাজান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে খিলাফত থেকে যে ভাতা পেতেন, তার বেশিরভাগই দান করে দিতেন। তিনি তার পুরো জীবন এভাবেই

দানে কাটিয়েছেন। শুধু কি তাই, আম্মাজান যে ঘরটিতে বসবাস করতেন, সেটিও তিনি নিজের জীবদ্দশায় দান করে দিয়ে যান। এখানেই শেষ নয়, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তিনি অসিয়ত করেন যে, আমার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে আমার ভাগ্নে। ইবনু সাদ আল ওয়াকিদির সূত্রে লিখেছেন, তিনি একলাখ দিরহামের মালিক ছিলেন। ইবনু হিশাম ত্রিশ হাজারের কথা বলেছেন। আম্মাজান রাদিয়াল্লাহু আনহা দানের প্রতি এত আগ্রহী ছিলেন কেন? কারণ, তার প্রিয়তম স্বামী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সিফাত ছিল। তাছাড়া একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করে বলেছিলেন- الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ . নিচের হাতের চাইতে ওপরের হাত উত্তম। ওপরের হাত হলো দাতার হাত এবং নিচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত।

[বুখারি, হাদিস: ৫৩৫৫, মুসলিম, হাদিস: ১০৪২, জুরকানি, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৯৬, সাহাবিয়্যাত, পৃষ্ঠা: ১০৫, আনসাবুল আশরাফ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪৪]

চিরবিদায়

৫০ হিজরি সন। রমজান মাস। আমিরে মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ানের খিলাফতকাল। আম্মাজান সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স তখন মধ্য ষাটে। সেই সলা কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে পা রাখা বয়সে সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে মদিনায় এসেছিলেন। রাসুলের সঙ্গে তার দাম্পত্য কেটেছে মাত্র চার বছর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশ বছর কেবল চার বছরের পবিত্র দাম্পত্য জীবনের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই কাটিয়েছেন।

মদিনায় আসার পর কতগুলো বছর কেটে গেছে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেন আরও বেশি মনে পড়ে তার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্তরের আর্জি যেন দিনে দিনে বাড়ছে। আসলে হয়তো তখনও তিনি বুঝতে পারেননি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার শীঘ্রই দেখা হচ্ছে। ৫০ হিজরির রমজান মাসেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় ধন্য সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হন।

[আনসাবুল আশরাফ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪৪, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩৮]

জানাজা

হজরত সাইদ ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মাজানের জানাজার নামাজ পড়ালেন। মতান্তরে আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়িয়েছেন; তখন তিনি হজ আদায় করে মদিনায় অবস্থান করছিলেন। এরপর উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া বিনতে হুওয়াইকে সসম্মানে সমাহিত করা হয় জান্নাতুল বাকিতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মা সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাকে নিজের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ও কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা দান করুন, আমাদেরকে নেককার বান্দাদের সঙ্গে যুক্ত করুন এবং আম্মাজানের বর্ণিল জীবন থেকে সকলকে শিক্ষা নেয়ার এবং উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রব্বুল আলামিন।

[আনসাবুল আশরাফ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪৪, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩৮]

মাইমুনা বিনতে হারিস হিলালিয়্যা রাঃ

প্রিয় নবী রাসূল সাঃ মানবজীবনে রেখে গিয়েছেন এ ধরায় সর্বোত্তম আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যার পত্নীগণ আমাদের সম্মানিত মাতা। যারা পূতপবিত্র। যাদের প্রত্যেকেই জান্নাতি। সেই জান্নাতি নারীদের একজন ছিলেন উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা।

উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বহু গুণের অধিকারী একজন মহীয়সী নারী। সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন সমস্যা তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে সমাধান করে দিতেন। তার নীতিনৈতিকতা, আল্লাহভীতি, দানশীলতা, ইবাদত-বন্দেগি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আনুগত্য ছিল তুঙ্গস্পর্শী। মূলত ওহির নির্মল আলোই তার জীবনকে উদ্ভাসিত করে। রিসালাতে মুহাম্মদির সংস্পর্শই তার ঈমানকে সজীব করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনন্য দীক্ষাই দীন সম্বন্ধে তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

নাম ও বংশ পরিচয়

উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর প্রিয় রাসুল সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে নতুন এক নাম ও পরিচয় লাভ করেন। যে পরিচয় ও মর্যাদার কারণে তিনি 'উম্মুল মুমিনিন' হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। যার কারণে তিনি এত উচ্চমার্গীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন যে, দিনরাত তিনি মহা সম্মানিত রাসুলের খিদমতের মাধ্যমে দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন করতে থাকেন।

মাইমুনা রাঃ এর নাম পূর্বে ছিল বাররাহ। রাসূল সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পরিবর্তন করে 'মাইমুনা' রেখে দেন। তার পিতার নাম হারিস। মাতার নাম হিন্দ বিনতে আউফ। তিনি ছিলেন বনু কায়েস ইবনু আইলান গোত্রীয়।

পারিবারিক আভিজাত্য ও মহত্ত্ব

উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশগত সম্পর্ক এমন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে ছিল, যে পরিবার আভিজাত্যে ও মহত্ত্বে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত ছিল। আল্লাহ তাআলা সেই উচ্চ মর্যাদাশীল বংশকে এমন সম্মান দান করেছিলেন, যা প্রতিটি যুগের কাছে ঈর্ষণীয়।

হজরত মাইমুনার মা হিন্দা বিনতে আউফ সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, তিনি শাশুড়ি হিসেবে ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিতা নারী। কারণ, তার দুই মেয়ে হজরত জয়নাব বিনতে খুজাইমা ও হজরত মাইমুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহর রাসুল সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

হজরত জয়নাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করে নেন। পরিবারের অন্যান্য মেয়েদেরও সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এমনকি হজরত মাইমুনার আম্মাজান প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সহ তাঁর চাচা হজরত আব্বাস, হজরত হামজা, বন্ধু হজরত আবু বকর, চাচাতো ভাই হজরত আলি, হজরত জাফর ইবনু আবু তালিব এবং প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত শাদ্দাদ ইবনু হাদির মতো ইসলামের মহান ব্যক্তিদের শাশুড়ি ছিলেন।

[উসদুল গাবাহ, হারফুল লাম, জীবনী: ৪২৫৬, ৭/২৪৬]

যে কারণে তিনি অনন্য

উম্মুল মুমিনিন রাদি. বহু দুর্লভ গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তার তাকওয়া ও আল্লাহভীতির প্রতি মুগ্ধ হয়ে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী।'

তার দানশীলতার বিষয়ে বর্ণিত আছে, তিনি ঋণ করে হলেও মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতেন। নিজের বাঁদিকেও আল্লাহর পথে দান করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

ইবাদত-বন্দেগিতে তার জুড়ি মেলা ভার। তিনি নামাজ আদায়ের সময় নিজেকে আপাদমস্তক আবৃত করে নিয়ে নামাজ আদায় করতেন।

তিনি ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। একবার পরিবারের এক লোক মদ্যপ হয়ে তার বাড়িতে এলে তাকে ধমকিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

তার বুদ্ধিমত্তার কথা ছিল মানুষের মুখে মুখে। ইবনু আব্বাস একদিন তার স্ত্রীর হাত দিয়ে মাথায় চিরুনি না করিয়ে মাইমুনার বাড়িতে এলেন কেবল এই কারণে, তার স্ত্রী হায়েজা। তখন হজরত মাইমুনা ইবনু আব্বাসকে বুঝিয়ে বলেন- 'ভাই আমার, হাতে তো আর নাপাকি থাকে না, হাত দিয়ে চিরুনি করিয়ে নিতে সমস্যা কোথায়!'

তার ইলমি খিদমত ছিল মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ। ইবনুল জাওজি বলেন, মাইমুনা থেকে ৭৬টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যা বিভিন্ন সহিহ হাদিসগ্রন্থে সমাদৃত।

তার ছাত্রদের সকলেই ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবি, তাবেয়ি এবং তার আত্মীয়স্বজন। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ইবনু আব্বাস, ইবনু শাদ্দাদ, ইবনু আসাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

নবীগৃহে আগমনপূর্ব জীবন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হজরত মাইমুনার বিয়ে হওয়ার পূর্বে আরও দুটি বিয়ে হয়। প্রথম বিয়ে হয় মাসউদ ইবনে আমর আস সাকাফির সঙ্গে। কিন্তু কোনো কারণে তাদের বৈবাহিক জীবন বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। এজন্য তালাক বা তৎকালীন জামানার জাহেলি নীতি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই হজরত মায়মুনা বিনতুল হারিস আবু রুহুম ইবনে আবদিল ওজ্জা অথবা সাখবারা ইবনে আবি রুহুম অথবা হোওয়াইতিব ইবনে আবদিল ওজ্জা অথবা ফারুহ ইবনে আবদিল ওজ্জার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু হজরত মাইমুনার দ্বিতীয় স্বামী হিজরি সপ্তম সনে মারা যায়। জীবনের এই সময়ে এসে একা হয়ে পড়েন হজরত মাইমুনা বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা।

হজরত মাইমনা এখন একা। সংসারহীন জীবন তার। সঙ্গিহীন জীবন তার ভালো ঠেকে না। তিনি বুঝতে পারলেন তার একজন সঙ্গী দরকার। আর নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে ভালো সঙ্গী আর কে হতে পারেন? তাই হজরত মায়মুনা বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করলেন।

কিন্তু প্রস্তাব কীভাবে পাঠাবেন, তা ভেবে পেলেন না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো বড়ো বোন উম্মে ফজলের কথা। যিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী। তিনি ভাবলেন, বোনের কাছে গিয়ে নবিজির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলে, তারা বিষয়টি নবিজির সামনে উত্থাপন করবেন।

সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৩৯ তাবকাতে ইবনে সাআদ: ৭/১৩২

বোনের মাধ্যমে প্রস্তাব

মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিন সুযোগ বুঝে বড়ো বোন উম্মুল ফজলের কাছে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা খুলে বললেন। তিনি জানতেন এতে কাজ হবে। এবং কাজও হলো।

উম্মুল ফজল রাদিয়াল্লাহু আনহা বোনের বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। এতে কোনো কালক্ষেপণ করলেন না। অতিদ্রুত তিনি স্বামী আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তার বোনের বিয়ের ব্যাপারে কথা বললেন এবং বোনের চাওয়া, ইচ্ছা, পছন্দ ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি তুলে ধরলেন।

ভাবনায় পড়ে গেলেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। কীভাবে প্রস্তাব পাঠাবেন, ভেবে পেলেন না। একবার ভাবলেন, কারো মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাবেন, কিন্তু পরক্ষণই সেই ভাবনা নাকচ করে দিলেন। এরপর তিনি নিজেই হাবশা

থেকে ফিরে সোজা চলে গেলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। দরবারের নবুওয়াতে পৌঁছে হজরত আব্বাস খুব সাবধানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হজরত মাইমুনার মনের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি জানালেন এবং তাকে বিয়ে করার জন্য নবিজির কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন।

عَنْ شُرحبيل بن سَعْدٍ، قَالَ: لقى العَبّاسُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالجُحْفَةِ حِينَ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ القضيّة، فَقَالَ لَهُ الْعَباس: بان الله، تَأَتمَتْ مَيْمُونَةُ بنت الحارث بن حَزْنِ بْن أبي رُهم بن عَبْدِ الْعُزى لَكَ فِي أَنْ تَزَوَجَهَا فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحرِم.

শুরাহবিল ইবনে সাআদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন-আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব 'জুহফা' নামক স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিলিত হলেন। নবিজি তখন উমরাতুল কাজা আদায়ে বের হয়েছেন বা ওমরা করছেন। তখন আব্বাস নবিজিকে বললেন, 'মাইমুনা বিনতল হারিস বিন হাজান বিন আবি রুহম বিন আবদিল উজ্জা আপনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আপনার কি তাকে বিয়ে করা সম্ভব?' এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহরিম অবস্থায় তাকে বিয়ে করে নেন।

[সিরাতে ইবনে হিশাম: ৪/২৯৬, আল-ইসাবা। ৮/১৯২, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৪/৪০৭]

নবীজির সম্মতি

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মতি দিয়েছেন হজরত মাইমুনাকে বিয়ে করার ব্যাপারে। সেই সংবাদ নবিজি পৌঁছালেন বেশ ঘটা করে। দুজনকে পাঠালেন মাইমুনার আত্মীয়ের কাছে। আরেকজনকে পাঠালেন সরাসরি মাইমুনার কাছে। হজরত আউস ও আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে পাঠালেন হজরত মাইমুনার বড় বোনের স্বামী আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

ل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة عام القضية بعث خولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه بميمونة. أوس بن

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওমরা আদায়ের বছর মক্কা থেকে বের হতে চাইলেন, তখন আউস ইবনে খাওলি ও আবু রাফেকে আব্বাস রাদিয়াল্লায় আনহুর কাছে পাঠালেন। তারপর তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হজরত মাইমুনার বিয়ে দেন।'

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৪০, আল ইসাবা: ৪/৬৩]

হজরত জাফর ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই। তার স্ত্রী ছিলেন আসমা বিনতে উমাইস। যিনি হজরত মাইমুনার বোন ছিলেন। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফর ইবনে আবু তালেবকে মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে পাঠান। বিয়ের ব্যাপারে নবিজির সম্মতির সংবাদ মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে প্রদানের জন্য। জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে নবিজির তরফ থেকে তাকে পয়গাম পৌঁছান। এ ব্যাপারে 'আল ইসতিআব' গ্রন্থকার ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করে লিখেছেন-

بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية تخطبها عَلَيْهِ جعفر،

'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফর বিন আবু তালেবকে হজরত মাইমুনা বিনতুল হারিস বিন হাজান হিলালিয়ার কাছে পাঠান। তখন হজরত জাফর হজরত মাইমুনাকে নবিজির পয়গাম দেন।'

[সিরাতে ইবনে হিশাম: ৬/২৯৬। আল ইসতিআব: ২/১২১]

আনন্দে আত্মহারা

হজরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা অপেক্ষা করছিলেন, কখন নবিজির সম্মতির বিষয়টি জানতে পারবেন। নাকি তিনি সম্মতি দেবেন না? এ ব্যাপারেও বেশ চিন্তিত ছিলেন হজরত মাইমুনা। দোটানার মাঝে তার দিনাতিপাত হতে থাকে। এমনই সময় তার কাছে পৌঁছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মতির পয়গাম।

হজরত মাইমুনা বিনতুল হারিস যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মতির পয়গাম সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি উটের পিঠে আরোহী ছিলেন। এমন খুশি ও আনন্দের সংবাদ শুনে আত্মহারা হয়ে গেলেন প্রায়। সঙ্গে সঙ্গে উটের পিঠ থেকে নিচে নেমে পড়লেন এবং শোকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে আনন্দের আতিশয্যে ঘোষণা করলেন-

البعير وما عليه الله ولرسوله

"উট ও উটের ওপর যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর জন্য এবং তাঁর রাসুলের জন্য।"

হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের আয়োজনের বিষয়টি অর্পণ করলেন বড় বোন-জামাতা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। তিনিই সবকিছুর আঞ্জাম করলেন।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৪০৭, আল ইসতিআব ফি মাবিকাতিল আসহাব। ৪/১৯১৭]

মোবারক বিবাহ

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতি লাভের পর মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিবাহ প্রদান করেন। তিনিই মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনিই বিয়ের খুতবা পড়েন। এ ব্যাপারে ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে আছে-

وقامت بتوكيل العباس بن عبد المطلب في أمر زواجها، فزوجها للنبي- صلى الله عليه وسلم

“মাইমুনার বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব। তিনিই তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিয়ে দেন।“

[আস সিরাতুন নাবাবিইয়া, হজরত মাইমুনার জীবনী দ্রষ্টব্য]

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী

সাল্লামের জন্য প্রস্তুত করলেন, তখন তিনি ততটা সচ্ছল ছিলেন না। অথচ মতিMি সম্মতির সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে তৈজসপত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের জন্য বরাদ্ধ করে দেন। এ বিয়ীকে আল্লাহ তাআলা অনেক পছন্দ করেন। তিনি সন্তষ্ট হন। সেই সন্থটি প্রকাশের পলে তিনি হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাখ আনহার ব্যাপারে বলেন-

و امرأة مؤمنة أن وقيت نفسها التين إن أراد اللي أن يستنكحها الخالصة لك من دون المؤمنين

“কোনো মুমিন নারী ধনি নিজেকে নবির নিরুট বিবাহের জন্য পেশ করে, আর মরি যদি তাকে বিবাহ করতে চায়, তাকেও (তিনি বিয়ে করতে পারবেন)। এটি কেবদ তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।“

[সুরা আহজাব, আয়াত: ৫০।)

এই আয়াতের তাফসিরে আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাগল্লাহ বলেন, 'এই যায়রে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তৃতীয় বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, নবিজির জন্য মোহর ছাড়া বিয়ে করার অনুমোদন।

অর্থাৎ সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য কোনো নারীকে বিনা মোহরানায় বিবাহ করা জায়েয নয়; কিন্তু মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন। কোনো নারী যদি নিজের থেকেই বিনা মোহরানায় বিবাহের জন্য মহানবি সাল্লাল্লাগ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে নিজেকে নিবেদন করেন, তবে তিনি চাইলে তাকে

সেভাবে বিবাহ করতে পারতেন। প্রকাশ থাকে যে, যদিও কুরআন মাজিদ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বিশেষ অনুমতি দান করেছে, কিন্তু সমগ্র জীবনে একবারও তিনি এ অনুমতিকে কাজে লাগিয়ে কোনো সুবিধা ভোগ করেন নি।

[দিরাতে ইবনে হিশাম ২/৬]

মোহরানা

উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা রাদিয়াল্লায় আনহার বিয়েতে মোহর নির্ধারিত হয় তারপ দিরহাম। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা দিতে হয়নি। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে পুরোটাই পরিশোষ করেন তাঁর প্রাতা আকলাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাগ আনন্ত। তিনিই পুরো তারপ দিরহাম মোহর হজরত মায়মুনা প্রাণিয়াল্লাগ আনহাকে প্রদান করেন। এপারে তাবারা'আওসাত' নামক প্রগ্রন্থে হজরত আনাস ইবনে মালেক এবিল্লাস্থ আনশ্বর বর্ণনা নকল করে বলেন-

زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، وأصدقها العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع منه درهم

আলহাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব হজরত মাইমুনাকে নবিজির কাছে বিয়ে দেন এবং তিনিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হজরত মাইমুনাকে চারশ দিরহাম মোহর স্বরূপ প্রদান করেন।'

[আল মাওসুআতুস দিবাহ ওয়াত তারিখিল ইসলামি, মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী দ্রষ্টব্য। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৪০৭। সিরাতে ইবনে হিশাম: ৪/২৯৬। আল ইসাতিআব কি মারিফাতিল আসহাব: ২/১২১।]

নব বধূকে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সঙ্গে নিলেন না। রেখে গেলেন। নিয়ে যেতে পারতেন। তাতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু নিলেন না। কারণ, রাসুলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপরীত পক্ষের অনুভূতির ক্ষিপ্রতা ও তীব্রতাকে স্নিগ্ধতা, নম্রতার ও দয়ার্দ্রতার সঙ্গে পরিবর্তন করতে চাইলেন এবং তাদেরকে উত্তেজনা ও বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য এই বুদ্ধিদ্বীপ্ত পদক্ষেপ নিলেন। অর্থাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবদুলহানকে নিজের সঙ্গে নেওয়ার পরিবর্তে তাকে রেখে গেলেন মক্কায় নিজ চাচা হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং হজরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় অবস্থান করতে বললেন, যাতে পরবর্তীকালে তারা নবদুলহান হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সঙ্গে নিয়ে কাফেলায় যোগ দিতে পারেন।

[আল মাগাজি, ওয়াকিদি, গাজওয়াতুল কাজিয়া: ২/৭৪০]

সারিফ এলাকায় অবস্থান

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে চলেছেন বিরাট এক কাফেলা। ইতিপূর্বে নবিজি নিজেই যাদের নিয়ে এসেছেন মক্কায়। তারা এখন ফিরছেন। কাবাঘর তাওয়াফ করে, বাইতুল্লাহর দর্শন শেষে নিজেদের সুসজ্জিত করে চলেছেন মদিনার পথে।

চলতে চলতে কাফেলা গিয়ে পৌঁছল 'সারিফ' নামক স্থানে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়। যাত্রাবিরতি দিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লেন সারিফের উপকণ্ঠে। সাহাবিরাও আর এগোলেন না। অবস্থান করলেন সেখানেই।

পূর্বেই বলেছি-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় রেখে এসেছিলেন। হজরত মাইমুনাকে সারিফ নামক স্থানে নিয়ে আসার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এজন্য নবিজি অপেক্ষা করলেন। হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা আসার আগ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই অবস্থান করলেন। সাহাবায়ে কিরাম কোনো বিরক্তবোধ করলেন না। নবিজির অনুকরণে তারাও অপেক্ষা করতে থাকেন। এক সময় উপস্থিত হলেন আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু। সঙ্গে এসেছেন নববি দুলহান হজরত মাইমুনা বিনতুল হারিস হিলালি রাদিয়াল্লাহু আনহা। তবে তারা যে খুব আরামে আসতে পেরেছেন, তা নয়; বরং পথিমধ্যে কতিপয় দুরাচারী মুশরিক এবং ওদের সন্তানরা উম্মুল মুমিনিন হজরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে উত্যক্ত করে, কষ্ট দেয়, কটুকথা বলে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে চায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারিফে অবস্থান করলেন। কিন্তু এসব অপমান হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিমিষেই ভুলে গেলেন, যখন তার চোখ পড়ল প্রিয়তম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখাবয়বের প্রতি।

উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা সারিফে পৌঁছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেন পবিত্র হেরেমে প্রবেশ করলেন। অর্জন করলেন তাঁর একান্ত সান্নিধ্য। ভূষিত হলেন উম্মুল মুমিনিনের শ্রেষ্ঠ উপাধিতে।

নবীজির ঘরে প্রথম প্রবেশ

উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উমরাতুল কাজা আদায় শেষে মুমিনদের একটি কাফেলার সঙ্গে মদিনায় গিয়ে পৌঁছেন।

হজরত মাইমুনা যখন নবিজির ঘরে প্রথম প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন সেখানে ইতিমধ্যে নয়জন সৌভাগ্যবতী নারী ছিলেন। যারা প্রতিনিয়ত নবুওয়াতের আলো থেকে উপকৃত হচ্ছিলেন।

আরবের সর্বশেষ নারী হিসেবে এই পবিত্র-গৃহে প্রবেশকারীর গৌরব ও বিশেষত্ব অর্জিত হলো হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের আর কোনো নারীকে বিয়ে করেননি।

অন্যান্য স্ত্রীদের মতো উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার বসবাসের জন্যও একটি পৃথক ঘর পেলের, যা মসজিদে নববির পর্ব দিকে অবস্থিন ছিল। খায়বারের উৎপাদিত ফসল থেকে ৮০ ওয়াসাক খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক জব বার্ষিক খোরপোশ নির্ধারিত হলো। যেসব পণ্য ব্যয়ে তিনি ছিলেন অবাধ ও স্বাধীন।

[আত তাবাকাতুল কুবরা, ৮/১১১ আযাওয়াজে মুতাহহারাত, পৃষ্ঠা: ২৯৭]

পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালোবাসা

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালোবাসা একটি সুখী সংসারের মূল অনুষঙ্গ। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক ভালোবাসা থাকে, দুনিয়ার জীবন তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে। ভালোবাসার ঘাটতি যে সংসারে যতটা, হতাশা ও অশান্তি সেখানে ততটা বেশি। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেরটা কীভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসবে। নির্দিষ্ট সময় বা দিন নয়; বরং স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভালোবাসবে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে। তবেই ভালোবাসার জীবন গড়ে উঠবে পরস্পরের মাঝে। এজন্যই তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি বিষয়েই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে দেখিয়েছেন; এমনকি গোসলের ক্ষেত্রেও।

আম্মাজান মাইমুনা বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد

'আমি ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; আমরা দুজনই একই পাত্রে গোসল করতাম।'

[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৭৭।]

এ ব্যাপারে উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহাও সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন-

أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلّم اغتسل هو وميمونة من إناء واحدٍ في قَصْعَةٍ فيها أَثَرُ العجين

'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মাইমনা একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন, যাতে আটার দাগ লেগেছিল।'

ইরওয়াউল গালিল: ১/৬৪

অন্যান্য গুণাবলী

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুতপবিত্র স্ত্রীদের বিভিন্ন গুণাবলি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। আল্লাহর রাসুলের নৈকট্য, খোদাভীরুতা, পরহেজগারি, কঠিন সাধনা, ইবাদত ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে যদি উম্মাহাতুল মুমিনিনকে দেখা যায়, তাহলে দুনিয়ার সকল নারীর থেকে আলাদা ও সর্বোচ্চ হবে তাদের আসন। যিনি উম্মাহাতুল মুমিনিনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ, এজন্য এখানে তার নির্দিষ্ট কিছু গুণের কথা তুলে ধরছি –

সুন্নতে মিসওয়াক

মিসওয়াক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক প্রিয় একটি সুন্নত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অনেক বেশি পরিমাণ মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। উম্মতকেও এর প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন; এমনকি এও বলেছেন-

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مع كُلِّ صَلَاةٍ

'আমি যদি মুমিনদের কষ্টের ভয় না করতাম, তবে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।' **[বুখারি, হাদিস: ৮৮৭। মুসলিম, হাদিস: ২৫২।]**

এর মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিসওয়াক করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক কাজকে পাগলের মতো অনুসরণ করতেন। এটা কীভাবে সম্ভব ছিল যে, তারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পরিমাণ গুরুত্বারোপ করা বিধানকে অবজ্ঞা করবে এবং আমল থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করবেন? এই নক্ষত্রতুল্য সাহাবিগণ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন এবং ইতিহাসের পাতায় এক উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। এজন্য তারাই আমার আদর্শ। তারা আমাদের অনুকরণীয়।

এরই ধারাবাহিকতায় উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা মিসওয়াকের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আসহা মিসওয়াককে পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন এবং যদি নামাজ অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ততা না থাকতেন, তাহলে মিসওয়াক করতে থাকতেন।

এ ব্যাপারে হজরত মাইমুনার ভাগনে ইয়াজিদ ইরান

আসাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

كل مسواك ميمونة بنت الحارث منقعا فى ماء فإن شغلها عمل او صلاة وإلا المنته فاستاكت به

'মাইমুনা বিনতুল হারিসের মিসওয়াক পানি দিয়ে ভিজানো থাকতো। নামাজ ও অন উ কাজে ব্যস্ত থাকা ছাড়া সবসময় তা দিয়ে মিসওয়াক করতেন।'

[তাবাকাক, কুবরা: ৭/১৩৭। আল ইসতিআব: ৪/৪০৫। সুনানে আবি দাউদ, বাব : ২৩, হাদিস : ৪৬, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, কিতাবুত তাহারাত। ১/১৯৭, হাদিস: ২০]

আল্লাহর স্মরণে বিভোর

উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা সবসময় ইবাদত-বন্দেগি ও জিকির-আজকারে মশগুল থাকতেন। ঘরে-বাইরে, সফরে-হজরে; সর্বদাই তিনি আল্লাহর স্মরণে বিভোর থাকতেন।

এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাগরিদ ইবনে কুরাইব রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

بعثني ابن عباس أقود بعير ميمونة، فلم أزل أسمعها تهل، حتى رمت الجمرة.

A

“আমাকে একবার ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খালা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বাইতুল্লাহর সফরে পাঠালেন। আমি মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার উটের রশি ধরে চলতে লাগলাম। আমি পুরোটি সময়জুড়ে আমি শুনলাম-তিনি জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার আগ পর্যন্ত কেবল 'আল্লাহর' জিকিরে নিমগ্ন থেকেছেন।“

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২২৪]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট

উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, খোদাভীরু, ইবাদতগুজার, এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোরোপকারী একজন মহিয়সী নারী। এজন্য উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে বলেন-

أما إنها كانت من أتقانا لله، وأوصلنا للرَّحِيم

মাইমুনা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খোদাভীরু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী এক নারী ছিলেন।'

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৪৪। আল ইসাবা: ৪/৪১২]

খিদামতে রসূল

উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে সদা সজাগ থাকতেন। নবিজির কখন কী প্রয়োজন, তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। যাতে কোনোভাবে কালহরণ না হয়ে যায় এবং নবিজির কষ্টের কারণ না হয়। এ ব্যাপারে হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার পবিত্র জবান থেকে শোনা যাক। তিনি বলেন-

وَضَعْتُ للنبي صَلَّى الله عليه وسلَّمَ غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بثَوْبٍ وصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، نَفْسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ، نَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ على رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَكَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وهو يَنْفُضُ يَدَيْهِ

“আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। তিনি দুই হাতের ওপর পানি ঢেলে উভয় হাত বুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। এরপর হাতে মাটি লাগিয়ে ঘষে নিলেন এবং ধুয়ে ফেললেন। এরপর কুলি করলেন। নাকে পানি দিলেন। চেহারা ও দুই হাত (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেন এবং সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দুই পা ধুয়ে নিলেন। এরপর আমি তাঁকে কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তিনি দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।“

[বুখারি, হাদিস: ২৬৬, ২৭৬]

দীক্ষাদান

আম্মাজান উম্মে সালামা ও আম্মাজান মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একেবারে কাছটিতে বসে আছেন। গল্প করছেন একে অপরের সঙ্গে। এমতাবস্থায় দৃষ্টিহীন সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আগমন করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা ও মায়মুনাকে বললেন, 'তোমরা পর্দার আড়ালে চলে যাও।'

আম্মাজান উম্মে সালামা আরজ করলেন-

يا رسول الله، أليس هو أعمى ا لا يُبْصِرُنَا، ولا يَعْرِفُنَا

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, তিনি কি দৃষ্টিহীন নন? তিনি তো আমাদের দেখছেন না এবং চিনতেও পারছেন না!' জবাবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

أَفَعَمْيَا وَانِ أَنتما أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانه ؟

"তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তো তাকে দেখছো।"

[তিরমিজি: ৪/১৯২, আস সুনানুল কুবরা, হাদিস: ৯২৪১, রিয়াদুস সালেহিন ২/২৩০]

ইসলামি শরিয়ায় নির্ধারিত মাহরাম নারী-পুরুষ ব্যতীত অন্য সব নারী-পুরুনের বেলায় উভয়কেই পর্দা পালন করতে হবে। কোনো পুরুষ যেমন কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি দেবে না, ঠিক তেমনি কোনো নারীও গায়রে মাহরাম ব্যক্তির দিকে পর্দার অন্তরাল থেকে চুপিসারে তাকাবে না। নারী পুরুষ উভয়কেই চোখের হেফাজত করতে হবে।

বিশেষ উপদেশ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীদের প্রতিটি বিষয় লক্ষ রাখতেন। মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো কোনো ভুলচুক হয়ে গেলে সঙ্গে সাঙ্গর তা শুধরে দিতেন এবং ভালোর মধ্যেও সর্বোত্তম কাজটি করার উপদেশ দিতেন। এমনই একটি ঘটনা। যে ঘটনায় প্রতিভাত হয় উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার অপার দানশীলতার কথা। হাদিসে এসেছে, বর্ণনাকারী বলেন-

أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَم تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ، فَلَمَّا كَانَ يومها الَّذي يدورُ عَلَيْهَا فيهِ قَالَتْ: أَشْعَرْتَ يَا رَسُول الله أَنِّي أَعْتَقْتُ وليدتي؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعمْ، قَالَ: أَما إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيتها أخوالك كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ. وفي رواية : أجزار الله، أما إنَّكِ لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرِكِ

'হজরত মাইমুনার একজন বাঁদি ছিল। তাকে তিনি মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি নিলেন না। এরপর মাইমুনার ঘরে অবস্থানের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট এলে উম্মুল মমিনিন তাকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি জানেন, আমি আমার কাঁদিটিকে আজাদ করে দিয়েছি?' নবিজি বললেন, 'তুমি কি তাই করেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' নবিজি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমায় এর সওয়াব দান করুন। কিন্তু তুমি যদি তোমার বাঁদিটিকে তোমার মামাদের দান করতে, তাহলে তুমি আরও অধিক সওয়াবের ভাগীদার হতে।'

[সহি বুখারি: ২৫৯২, সহিহ ইবনে খুজাইমা: ৩৪৩৪]

বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ

দশম হিজরিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের প্রথম ও শোষ হজ পালন করেন। ইতিহাসবিদদের মতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তাওহিদি জনতা এই হজে অংশ করেন। এই হজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সকল তাওহিদি জনতার রুহানি মায়েরাও তাদের ওপর মমত্বের ছায়া দান করেন। আল্লাহর দীনের এই গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায়ে তারাও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী হন। রাসুল সাঃ সফরের কোনে এক সময় সকল আম্মাজানের দিকে লক্ষ্য করে বলেন-

هِيَ هَذِهِ الحَجَّةُ، ثُمَّ الجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الحُصْرِ فِي البُيُوت

'এ হলো বিদায় হজ। এরপর ঘরে চাটাইয়ের ওপর বসে থাকা।'

এই সফরে উম্মাহাতুল মুমিনিন হজের যাবতীয় বিধান, নিয়মকানুন, শর্ত-শরায়েত ও রীতিনীতি সম্পর্কে সরাসরি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে জানতে পারেন। সেই বিধান ও নিয়মকানুন নিজেদের হৃদয় ও মস্তিষ্কে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেন। যে কারণে মুসলিম উম্মাহ হজের যাবতীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনার জন্য পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তাদের থেকে দীক্ষাগ্রহণ করতে থাকে এবং তা আজ অবধি করছে।

[তাহাবি, শারহু মুশকিলুল আছার: ১৪/২৫৬, হাদিস: ৫৬০৩, তাবারানি, কাবির: ২৪/৩৩, হাদিস: ৮৯, বাইহাকি, কুবরা: ৫/৩৭২, হাদিস: ১০১৪৩]

নবীজির আল বিদা

হিজরির এগারো সন। সফর মাসের ১৯ তারিখ। মঙ্গলবার। রাসুলুল্লাহ সততায় আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ অসুস্থ। তবুও তিনি রাতের বেলা আয়াতুল বকিয়ে গেলেন। দআ করলেন কবরবাসীর জন্য। এরপর হজরত মাইমুনার ধরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বুধবার। সকাল হলো। বেড়ে গেলো অসুস্থতা। প্রচণ্ড জ্বর এল গায়ে। নবিজি অন্য সকল পত্নীকে মাইমুনার ঘরে ডেকে পাঠালেন। সকলের কাছে আবদার করলেন, 'তোমরা চাইলে আমার অসুস্থতার দিনগুলো আয়েশার ঘরে কাটাতে গাই।' সকলেই সানন্দে বললেন, 'আপনি যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন, সেখানেই থাকুন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়িদা মাইমুনার ঘর থেকে চিরদিনের জন্য স্থানান্তরিত হলেন আম্মা আয়েশার ঘরে। ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৫২৫]

ইলমি খিদমত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। কারো মতে চল্লিশ বছর, কারো মতে পঞ্চান্ন বছর।

এই বছরগুলোতে আম্মাজান মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হাম্মাদ মুস্তাফা সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বিবরণ মসলিম উম্মাহর কাছে পর্ণলখিতের সঙ্গে পৌঁছে সেবার মহান কাজটি চালিয়ে যান।

রাসুল সাঃ অনেক হাদিসই উম্মুল মুমিনিনের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে সম্প্রম্প্রসারিত হয়েছে। যেখানে উন্মুল মুমিনিন মাইমনা রাদিয়াল্লাগ অনহার অবদান অনস্বীকার্য। রাসুল সাঃ
থেকে তিনি লা হাদিস শিক্ষা লাভ করেন এবং তা বর্ণনাও করেন।

অবশ্য তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 'মাতালিউল অনেয়ার' প্রস্থে ৭৭টি এবং 'আল কামাল ফি মারিজাতির বিজাল' প্রশ্নে ৪৬টি হাদিসের কথা এসেছে।

[আসমাউস সাহাবা আর রুওয়াত, টীকা: ৪৪, পৃষ্ঠা ৬৮।]

ইবনুল জাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ৭৬টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।'

[সাইয়েদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ জরদানি, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি বেশিদিল আনান, ১/২৩৬, কায়রো দারুস সালাম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১০/১৯৯০]

হাফেজ জাহাবি বলেন, 'তার থেকে মোট **১৩**টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি ও মুসলিম যৌথভাবে ৭টি, ইমাম বুখারি এককভাবে **১**টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ৫টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৪৫]

উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদিসগুলোতে দীনের মৌলিক শিক্ষা এবং শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে বৈচিত্র ও সর্বজনীনতা রয়েছে এবং তার থেকে বর্ণিত প্রায় প্রতিটি হাদিসই জীবনঘনিষ্ঠ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট।

ঘরোয়া মাসআলার সমাধান

আম্মাজান মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসুল সম্পর্কে যা কিছুই জানতেন তা-ই জানিয়ে দিলেন মানুষকে। এমনকি ঘরের খুঁটিনাটি বিষয়সহ ঘরোয়া ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কেও সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িনকে জানিয়ে দিতেন। কারণ, তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী জানতেন, তিনি বলেছেন-

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتبَ لَتُبَيِّنُنَّه لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَه

"স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুসি নিয়েছিলেন-অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।"

[সুরা আলে ইমরান: ৩:১৮৭]

তাছাড়া রাসুলুল্লাহ ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেই দিয়েছেন-

بلغوا علي ولو آية

"আমার পক্ষ থেকে (জনগণকে আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়।"

[বুখারি, হাদিস: ৩৪৬১]

এজন্য উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘরোয়া বিষয়গুলোও মানুষদের জানালেন, যাতে করে তার মাধ্যমে মানুষ সঠিক বিষয় জানতে পারে এবং তার ওপর আমল করতে পারে।

এ ব্যাপারে বর্ণনা দিচ্ছেন সাইয়িদা মাইমুনার ভাগনে আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন –

سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النبي صَلَّى الله عليه وسلَّمَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا، لا تُصَلِّي وهي مُفْتَرِشَةً بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ، وهو يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ

"আমি আমার খালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে শুনেছি-তিনি হায়েজ অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন না। তবে তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজের সিজদার জায়গায় সোজাসুজি শুয়ে থাকতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাটাইয়ে সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় তাঁর কাপড়ের অংশ মাইমুনার শরীর স্পর্শ করতো।"

[বুখারি: ৩৩৩, মুসলিম: ৫১৩]

দ্বিন পালনে কঠোরতা

উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ছিল অগাধ স্নেহ ও ভালোবাসা। কিন্তু তাদের কোনো কাজ শরিয়াতের বিধিবিধানের পরিপন্থি হলে তার তীব্র নিন্দা করতেন এবং তার প্রতি বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। এক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কের ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ, আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ-নিষেধের প্রতি তিনি খুবই মনোযোগী ছিলেন। আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো কাজ হতে দেখলে, তিনি তা বরদাশত করতেন না। এ ব্যাপারে আম্মাজানের ভাগনে জিয়াদ ইবনুল আসাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها. فوجدت منه ريح شراب، فقالت : لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك - أو قالت يطهروك لا تدخل علي بيتي أبدا

“একদা তার এক নিকটাত্মীয় তার গৃহে এল। তখন লোকটির মুখ থেকে শরাবের দুর্গন্ধ আসছিল। তিনি বললেন, তুমি যদি এই মুহূর্তে মুসলিমদের কাছে না যাও, যাতে তারা তোমাকে পিটিয়ে সোজা করে, তাহলে খবরদার, আমার বাড়ির দরজাও মাড়াবে না তুমি।“

[আত তাবাকাতুল কুবরা ৭/১৩৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৪৩, সনদ সহিহ]

সুবহানাল্লাহ, শরিয়তের ব্যাপারে কোনো রকম ছাড় নয়। সকল সম্পর্ককে একদিকে রেখে, শরিয়তের মানসার ওপর নিজে আমল করা এবং অন্যকে আমল করার নির্দেশ দেওয়া; এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্য ইসলামের সোনালি যুগে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বিরাজমান ছিল।

চিরবিদায়

উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইলম, আমল ও মুজাহাদা, ইবাদাত, তাকওয়া ও পরহেজগারির আদলে ছিলেন একজন মহীয়সী প্রজ্ঞাবান নারী। খিলাফাতে রাশেদা অতিবাহিত করে জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে পৌঁছলেন আমিরে মুআবিয়ার জামানায়। পরিশেষে তারও চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। নশ্বর এই পৃথিবীকে বিদায় জানানোর সময় হয়ে এল।

সে সময় তিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থান করছিলেন। বর্ণিত আছে-যখন তার মুমুর্ষ অবস্থা তীব্রতর হলো, তখন

তিনি বললেন-

أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، إن رسول الله أخبرني أن لا أموت بمكة

"আমাকে মক্কা মুকাররমা থেকে বাইরে নিয়ে যাও। কারণ, আমার রাসুলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমার ইন্তিকাল মক্কায় হবে না।"

এজন্য তাঁকে মক্কা মুয়াজ্জমায়র বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। কাফেলা যখন 'সারিক নামক এলাকায় মেই গাছের নিচে পৌঁছল, যেখানে এক তাঁবুর নিচে হুজুর সালল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ হয়েছিল, ঠিক সেখানেই উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা রফিকে আলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন।

[দালায়িলুন নাবুওয়াহ, বাইহাকি: ৬/৪৩৭মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ]

মৃত্যুসন নিয়ে মতানৈক্য

আম্মাজান মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুসন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়।'আল ইসাবা' গ্রন্থের লেখক হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন –

"মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৫১ হিজরি মোতাবেক ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে 'সারিফ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।"

[আল ইসাবা: ৮/১৯৩, তাহজিবুত তাহজিব: ১২/৪৮১]

মুহাম্মাদ ইবনু উমর আল ওয়াকেদি বলেন –

"তিনি ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার খিলাফতকালে ৬১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।"

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৪৫]

হাফেজ ইবনো কাসির বলেন –

"তিনি ৬৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।"

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/২৩৪]

তাবাকাতে কুবরার গ্রন্থকার ইবনে সাআদ বলেন –

“উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।“

[আত তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১৪০]

ইয়াজিদ ইবনুল আসামের বর্ণনা থেকে জানা যায় –

“উম্মুল মুমিনিন সাইয়িদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার পরেও জীবিত ছিলেন। আর আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বসম্মতিক্রমে ৬০ হিজরির পূর্বে ইন্তিকাল করেন।“

জানাজা ও দাফন

তিনি 'সারিফে' মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে, তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সারিফে দাফন হন।

[আত তাবাকাতুল কুবরা ৮/১১১]

যখন তার লাশ কাঁধে উঠানো হয়, তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন –

“তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। সুতরাং সাবধান, বেশি নাড়াচাড়া করো না। আদবের সঙ্গে আস্তে নিয়ে চলো।“

[সহি বুখারি: ২/৭৫৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জানাজা পড়ান। 'সারিফ' নামক স্থানে যেখানে তার বাসর উদযাপিত হয়েছিল, সেখানে তাকে দাফন করা হয়। ইবনে আববাস, ইয়াজিদ ইবনুল আসাম, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ এবং ওবাইদুল্লাহ আল খাওলানি; অর্থাৎ তার জগদ্বিখ্যাত সকল ভাগনে তাকে কবরে নামান।

[আল ইসতিআব: 8/১৯১৮]

হজরত ইয়াজিদ ইবনুল আসাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যখন আমরা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃতদেহ কবরে রাখলাম, তখন তার মাথাটা একদিকে ঝুঁকে গেলো। আমি তখন গায়ের চাদর খুলে তাঁর মাথার নিচে রাখলাম। কিন্তু ইবনে আব্বাস তা উঠিয়ে ফেললেন। পরিবর্তে তার মাথার নিচে কিছু নুড়ি পাথর দিয়ে দিলেন।'।

[আত তাবাকতুল কুবরা: ৮/১১১]

পরিশেষ

নবিজির সংসার পারিবারিক সৌহার্দ ও সদাচারণ হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

''দুনিয়ার পুরোটাই ভোগের সামগ্রী; তবে দুনিয়ার সর্বোত্তম ভোগের সামগ্রী হলো সতী-পুণ্যবতী স্ত্রী।''

[মুসনাদু আহমদ, হাদিস: ৬৫৬৭; সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস: ৪০৩১; মুসনাদু বাজজার, হাদিস: ২৪৪১; শরহুস-সুন্নাহ, হাদিস: ২২৪১]

হজরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন =

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

''দুনিয়ার ৩টি জিনিস আমার কাছে অধিক প্রিয়: ১. স্ত্রী, ২. সুগন্ধি। ৩. আর চক্ষু শীতলকারী হলো নামাজ।''

নাসায়ি শরিফ, হাদিস: ৩৯৩৯

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিজীবনে অবসর সময়ে পরিবারবর্গকে পারিবারিক কাজে সহায়তা করতেন। ব্যক্তিগত কাজে তিনি অন্যের সহযোগিতা খুব কমই নিতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন।

এ ব্যাপারে হজরত আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আমি একবার হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবিজি ঘরের মধ্যে কী কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বললেন-

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজে পরিবার-পরিজনের সহযোগিতায় থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো, নামাজে চলে যেতেন।

[সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৭৬]

তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, পরিবারের প্রতিটি কাজই আমাদের নিজেদের কাজ, যা আমরা ভাগাভাগি করে করলে একদিকে যেমন পরিবারের সবার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা, ভালোবাসা বজায় থাকবে, অন্যদিকে ইসলামের একটি বিশাল বৈশিষ্ট্য উজ্জীবিত হবে। কোনো অবস্থায়ই স্ত্রীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা উচিত নয়। তাদের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, এর দ্বারা একদিকে যেমন নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে, অন্যদিকে তা পরিবার, সন্তানাদি এবং অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মুমিনের উচিত পারিবারিক জীবনেও প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো নারীর গায়ে হাত তোলেননি। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তাঁর কোনো খাদিমকে অথবা তার কোনো স্ত্রীকে মারধর করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি।

ইবনু মাজাহ, হাদিস: ১৯৮৪

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٍ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে কোনো দিন কাউকে আঘাত করেননি, কোনো নারীকেও না, খাদিমকেও না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া। আর যে তার সঙ্গে অসদাচরণ করেছে, তার থেকেও প্রতিশোধ নেননি। তবে আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন বিষয়ে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

[সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৩২৮]

সংসার জীবনে সুখ-শান্তি ধরে রাখার জন্য তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের পরিপূরক। তাদের বোঝাপড়া, সঠিক সিদ্ধান্ত ও সচেতন-মনস্কতা প্রজন্মের জন্য বয়ে আনে অফুরন্ত কল্যাণ। তবে শান্তিময় ও সুখী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

''কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন মহিলার ওপর রুষ্ট হবে না। কেননা, যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়, তাহলে তার এমন গুণও আছে, যার ওপর সে সন্তুষ্ট হতে পারবে।''

[সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৬৯]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো-

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

কোন রমণী সর্বোত্তম?

উত্তরে তিনি বলেন,

''স্বামী যে স্ত্রীর প্রতি তাকালে তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়। স্বামী কোনো নির্দেশ করলে তা (যথাযথভাবে) পালন করে এবং নিজের প্রয়োজনে ও ধনসম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে না।''

[নাসায়ি, হাদিস: ৩২৩১; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস: ৭৪২১ পুরুষরা হলো সংসারের অধিনায়ক]

সুতরাং তাকে হতে হবে দায়িত্বশীল। তাদের দায়িত্ব বোঝাতে গিয়ে নবীজি সাঃ দিয়েছেন সুন্দর নির্দেশনা।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত,

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

''তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে ভালো মানুষ। আর আমি নিজ স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভালো মানুষ।''

[ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৯৭৭]

সুখ শান্তি ও সুশীল জীবনের বাস্তব নমুনা ছিলো প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসার ও পরিবার। আর তাতে রয়েছে উম্মতের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষা।

হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়ে নবীজির ভালোবাসা দৃঢ় করুন, তাঁর সুন্নাহকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দিন এবং কিয়ামতের দিনে আমাদের তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য দান করুন।

তথ্যসূত্র

- আর রাহিকুল মাখতুম
- যেমন ছিলেন তিনি
- নবিজির সংসার
- সিরাহ
- iom মাদ্রাসা
- মাসিক আততাহরিক-
- https://www.quransharif.org
- উম্মুল মু'মিমিন সিরিজ